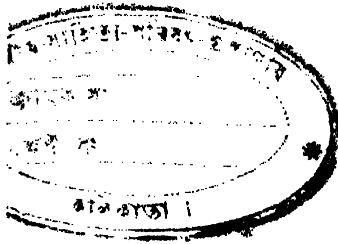
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

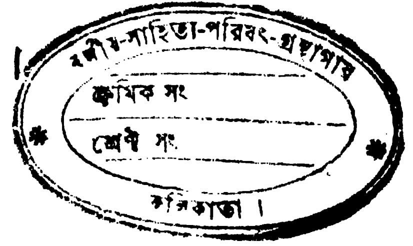


শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার,
এম্-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্-সি-এস্
পি আর স্কলার, সম্পাদিত।

পঞ্চদশ বর্ষ

১৩৩২

প্রতিভা—১৫শ বর্ষ ১৩৩২ সন।



বর্ষ-সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

——o——

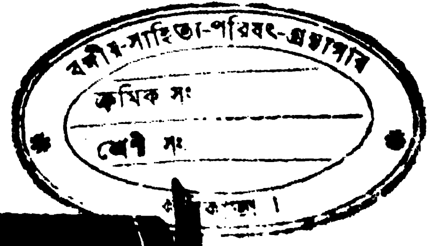


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

Printed At the Narayan Machine Press, Dacca,

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন !

তুমিই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু তিথিতে বঙ্কিমের কথা আবার নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে শুনাইবার জন্য নারায়ণের বঙ্কিম সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলে। তখন কে জানিত যে এত অল্পদিনের মধ্যেই তোমার কথা দেশবাসীকে শুনাইবার জন্য, তোমার জীবনের আলোচনার জন্য সারা বাঙ্গলায় সংবাদপত্রে এবং মাসিকে চিত্তরঞ্জন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইবে। প্রিয়জনের অভাবে লোকে তাহারই কথা আলোচনা করিয়া শান্তি পায়— তাহার স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড় ভালবাসে। বিশেষ করিয়া তুমি দীর্ঘকাল আমাদের সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলে। তুমি তাহাকে এতদিন কত আদরে যত্নে রক্ষা করিয়াছ, কত বিপদের সময় তোমার অভয় দৃঢ়বাহু তাহাকে বিপদ্‌মুক্ত করিয়াছে। তাই আজ ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ভক্তিকৃতজ্ঞতাপ্লুত হৃদয়ে তাহার ক্ষীণ শক্তি লইয়া তোমার স্মৃতি তর্পণ করিতেছে—তাহার বিশ্বাস আছে তুমি যে লোকেই থাক তোমার আশীর্ব্বাদ তাহাকে সকল বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবে।



প্রতিভা

১৫শ বর্ষ　　চিত্তরঞ্জন স্মৃতি　　১ম সংখ্যা

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩২

স্মৃতি-তর্পণ।*

সোণার স্বপন-মুগ্ধ অন্তরের উজ্জ্বল বিভায়
রঞ্জিয়া দেশের চিত্ত, সর্ব্বরিক্ত হে চিত্তরঞ্জন,
কাঞ্চন জঙ্ঘার কোলে আচম্বিতে লইলে বিদায়
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-তেজ অসময়ে করি' সম্বরণ !

"মালঞ্চের মিষ্টগন্ধ সঞ্চারিলে বাঙ্গালীর প্রাণে,
"সাগর সঙ্গীতে," কবি, শোনাইলে অসীমের বাণী,
বিরাট হৃদয় তব, ভক্তি-সিক্ত কীর্ত্তনের গানে,
আনিল উদার ক্রোড়ে জন-মন-"নারায়ণে" টানি'।

ভোগের সমিধে জ্বালি' ত্যাগের পূত হোমশিখা
নিঃশেষে আহুতি দিলে আপনারে, হে বীর সন্ন্যাসী,—
বিস্মিত স্বদেশবাসী সেই যজ্ঞ ভস্মে রাজ-টীকা
পরা'ল ললাটে তব আনন্দের অশ্রু-নীরে ভাসি'।

নহে বঙ্গদেশ শুধু, নিস্ব আজি নিখিল ভারত—
মুহ্যমান্ মহাশোকে ; ভগ্নশীর্ষ বিহনে তোমার
বজ্রাহত তরুসম। অর্দ্ধপথে স্তব্ধ কর্ম্ম-রথ !
'কোথা দেশবন্ধু' বলি' কোটি কণ্ঠে উঠে হাহাকার !

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

*দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোক গমনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক আহুত শোক-সভায় পঠিত।

ভক্তি অর্ঘ্য,—"চিত্তরঞ্জন"।

১

আজি কোন্ সমুদ্রেরে, "পরিপূর্ণ শব্দহীন" অন্তরের তানে
ধরিয়াছ হৃদিমাঝে, ওগো মহাপ্রাণ ! বল আজ কোন্ গানে
অন্তহীন, দিশাহীন কাল-সমুদ্রেরে তুমি, কি ছন্দে গাঁথিয়া
ছন্দের অতীত ছন্দে "অন্তর বিজনে" তব ফেলেছ বাঁধিয়া !

২

চির-নবীনতাময়, চির-স্নিগ্ধ প্রভাতের, শৈশবের মত
যদি হৃদয় তোমার, হে প্রিয় দয়িত, কি কঠিন ধ্যানে রত
তবে হে চিত্তরঞ্জন ! বুঝি কার চিত্ত হর সুমধুর তানে,
ভুলেগেছ কর্ম্মক্ষেত্রে ! বসে আছ, স্তব্ধ কার অন্তিম আহ্বানে !

৩

চতুর্দ্দিকে মহারোল ! তোমারি কল্পনা-রঙ্গে সুরঞ্জিত-ভাতি
কত দিব্য গগণের, কত-গ্রহ তারা, কোন্ মন্ত্র-মোহে মাতি
পুণ্য-নেত্রে হেরিতেছে, আজি নব-মন্ত্র-সিদ্ধ পূত পুরোহিতে,
কর্ম্মবীর কবি-তোমা ! স্তব্ধ বিশ্ব-কলরব কাহার সঙ্গীতে ?

৪

নহ তুমি সীমাবদ্ধ ! তাই বুঝি কবি, 'নীরব-ক্রন্দন" নিয়ে
অসীম পরাণ তুমি, স-সীমের সর্ব্ব-বাধা চূর্ণ ক'রে দিয়ে
সর্ব্বত্যাগী দানবীর, চ'লে গেছ জয়গর্ব্ব-উদ্ভাসিত-আঁখি
তোমারি আজন্ম-সখা, "অপারের, অকূলের" কাণ্ডারীর লাগি !

৫

কি-বেদনা স-সীমের ! পরিপূর্ণ দিগন্তর ক্রন্দনের রবে !
শান্ত, স্থির, মৃদুহাস্যে, তুমি আজ ওপারের কূল হ'তে সবে
দেখিছ চাহিয়া বুঝি ; বিস্মিত জগত তাই ভক্তি-অর্ঘ্য আনি,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে ! আত্মপর মন্ত্রমুগ্ধ শুনি তব বাণী !

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

চিত্তরঞ্জন।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সদর্পে বলিয়াছেন 'যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।' তিনি শুধু কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, আমাদের পূর্ব্বলুপ্ত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত করিয়া মুমূর্ষু বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ বাঙ্গালী তাহার অতীতকে বুঝিয়া ভবিষ্যতের গৌরবময় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রচেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে বাঙ্গালিত্বের দর্প ছিল, চিত্তরঞ্জন যেন সেই দর্পেরই পূর্ণ বিকাশ। একদিকে যেমন অতীতে অগাধ শ্রদ্ধা, অন্য দিকে তেমনি ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস—এই দুই-এ মিলিয়া—তাঁহার জীবনের বর্ত্তমানকে নির্ভীক, তেজোদৃপ্ত, উত্তমশীল, কর্ম্মপরায়ণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার নিজের স্ব-ভাবকে চিনিয়াছিলেন এবং স্বভাব অনুযায়ী-ই চলিয়াছিলেন। তাঁহার বড় আদরের নারায়ণ পত্রিকায় 'বাঙ্গালার কথা, শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রাণের কথা শুনাইয়াছেন—"বাঙ্গালীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে—স্বাধিকার লাভে প্রমত্ত করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার স্ব-প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিতে হইবে। কোন জাতিই অন্যজাতির প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দির বাঙ্গালি চরিত্রই ইহার প্রমাণ।"

চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা, আবেষ্টন, কিছুই তাঁহাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার সহানুভূতিপরায়ণ কবিপ্রাণ সকল ঐশ্বর্য্য এবং বেষ্টনীকে তুচ্ছ করিয়া—অবহেলায় ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মের আহ্বানে ছুটিয়াছিল। বাঙ্গালার অভিশাপ—ভাব ও কর্ম্মে সামঞ্জস্যের অভাব। তাই বাঙ্গালায় মৌলিক সৃষ্টি নাই—সুধুই অনুকরণ আছে। ভাব ও কর্ম্ম অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই সম্বন্ধের প্রকাশ তাঁহার ভিতর আসিতে-আসিতেই কাল তাঁহাকে অকালে হরণ করিল, তাহার সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণ ই রহিয়া গেল। তবে তাঁর দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আমাদের দুঃখের কোন কারণ নাই। তাঁহার যে অতীতে শ্রদ্ধা বর্ত্তমানের চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিল, তাঁহার ভবিষ্যতের আশা এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিবে।

অতীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে অদম্য তেজ, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, প্রবল কর্ম্ম নিষ্ঠা, গভীর আত্মবিশ্বাস—যে বিশ্বাসের বলে সহস্র সহস্র দেশবাসীকে তিনি আপনার মতানুবর্ত্তী করিতে পারিয়াছিলেন; উদার হৃদয়—যে হৃদয় হারাইয়া আজ লক্ষ লক্ষ প্রাণ হাহাকার করিতেছে; সিংহবল—যে বলে দৃপ্ত হইয়া তিনি প্রবল ব্যুরোক্রাসীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের প্রদত্ত অস্ত্রে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; স্বাধীন চিত্ততা—প্রদান করিয়াছিল; আর তাঁহাকে দিয়াছিল শাক্য সিংহের ত্যাগ শক্তি—যাহার বলে তিনি একদিনে লক্ষ-লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবসা অম্লান বদনে ত্যাগ করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত দেশযজ্ঞে আহুতি দিতে পারিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ভাবুক কবি। তিনি বাঙ্গালীর নিজস্ব কাব্যের প্রকৃত প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই আজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও বৈষ্ণব কবির ব্রজের বাঁশীর সুরে তিনি আত্মহারা হইয়াছেন। এই সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রাণের ভাষাকে আজকালকার ইংরেজী শিক্ষিত কাব্য রসিক বাঙ্গালী আদর করেনা বলিয়া তাঁহার, 'কবিতার কথা'য় আমাদের এই সাহিত্য পরিষদের এক বার্ষিক অধিবেশনে কতই না খেদোক্তি করিয়াছিলেন। তিনি 'ভাবের' যে চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার আত্মীয় সমাজে সুপরিচিত, আর তিনি যে 'কর্ম্মের' চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন তাহা সমস্ত সভ্যজগতের সুপরিচিত। তাই আজ কলিকাতায় তাঁহার শবানুগমনে শ্রাদ্ধবাসরে শোক সভায় জনারণ্য; আর বাঙ্গলা—শুধু বাঙ্গলা কেন—সমস্ত ভারতব্যাপী তাঁহার স্মৃতি তর্পণ, এবং ইয়োরোপ আমেরিকা আফ্রিকা চীন জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত দিক হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে অসংখ্য ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে আমরা বৃথা শোক করিব না। যে বাঙ্গালার ধুলি চিত্তরঞ্জনকে সৃজন করিয়াছিল—পোষণ করিয়াছিল, আবার তাঁহাকে নিজের মধ্যেই মিশাইয়া লইল, যে ধুলিতে সমস্ত পিতামহদের অস্থি মজ্জা মিশিয়া আছে, সেই ধুলি হইতেই ভবিষ্য সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার যে ভাব কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই তাহাকে মূর্ত্ততর করিবে।

হে বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন, তোমার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয় হইয়াছে। ঋষির দর্শনে তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করিয়াছে, তোমার শ্বাস তোমার বাঙ্গলার বায়ুতে মিশিয়াছে। তাই বৈদিক ঋষির কথায় বলিতেছি,—

হে মৃত, তুমি এই জননী স্বরূপা পৃথিবীর নিকট গমন কর, ইনি হু বিস্তীর্ণা এবং সকল জীবের সুখদায়িনী।

হে পৃথিবী, মাতা যেমন শিশুপুত্রকে আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে তদ্রূপ তুমিও এই মৃতকে আচ্ছাদন কর।

হে মাতা পৃথিবী, তুমি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিতা হও, তোমার সহস্র ধুলি আপন পরিবারের মত ইহাকে সেবা করুক এবং মধুক্ষারিণী গৃহের মত এই মৃতের পক্ষে সুখ সেব্য হউক।

আর হে স্বরাট্, যিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, যিনি স্বর্গলোকে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত আনন্দিত হইতেছেন তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর!

তবেই চিত্তরঞ্জনের জীবন যজ্ঞ সার্থক হইবে এবং বাঙ্গালীরও চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও স্মৃতি তর্পণ সফল হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

—*—

কবি-স্মৃতি,—"চিত্তরঞ্জন"।

"There's a divinity that shapes our ends.
Rough-hew them as you will."—

Shakespeare [Hamlet V-2]

১

চিত্তরঞ্জন যে কি শ্রেণীর কবি, আজ মানুষ তাহার প্রমাণ দিতেছে।

সাধক কবি, ভক্ত কবি, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ কবি মানবের জন্য তাঁহার হৃদয়ের প্রেম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, আজ বিশ্ব-মানব তাঁহার কবি-প্রতিভার উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইতেছে। আজ হৃদয় পরিপূর্ণ, শোকে আচ্ছন্ন, ভাব-বিহ্বলতায় আবেগময়ী। আজ তাঁহার কবি-প্রতিভার কি আলোচনা করিব?

তথাপি কাহারো-কাহারো নিকট তিনি যে কেবলি কবি, তাঁহার কবিত্বের সূত্রেই যে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান। তাঁহার সহিত যাঁহারা ব্যক্তিগত সম্পর্কে অপরিচিত, যাঁহারা তাঁহার রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও সম্পূর্ণ অ-সংশ্লিষ্ট, তাঁহার কবিত্বে তাঁহারাও মুগ্ধ। তাঁহার কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনার আজ সময় নয়,—আমি তাহার চেষ্টা করিব না। কাব্য-জগতের বিভিন্ন দিক তাঁহার কাব্যাংশের সামান্য আলোচনায় তাঁহার কবি-প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয়-লাভের কেবল মাত্র চেষ্টা করিবার ইচ্ছা। তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্য-কণিকাও যে তাহারি "সাগর সঙ্গীতের" সুমধুর ধ্বনির "শব্দময়ী" এবং "শব্দাতীত" তানে গীতি-মুখরিত!

অংশ হইতে সমস্তের অনুভূতি। চিত্তরঞ্জনের কাব্যের কিয়দংশের আলোচনায় তাঁহার কাব্যের 'শ্রেণীত্ব' বুঝিতে পারা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে তাঁহার অকাল-তিরোধানে বঙ্গ-সাহিত্যের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে। এমন সহজ, সরল

ভাষায় অভিব্যক্ত ভাবময়ী সঙ্গীত-ধ্বনি আমাদের কাব্য-সাহিত্যে বিরল। ইহা আমার নিকট কেবলমাত্র চণ্ডীদাসের সহিতই তুলনীয়। চিত্তরঞ্জনের ভাষা নিতান্তই প্রাণের ভাষা!

আজ চিত্তরঞ্জনের বিষয় চিন্তা করিতে তাঁহারি প্রশ্ন মনে উঠিতেছে,—

"হে পূজারি, আজি তুমি কোন্ পূজা কর?
পরাণ-প্রদীপ মোর ঊর্দ্ধে তুলি ধর!"

আজ মনে হইতেছে তাঁহারি উক্তি,—

জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে,কি ব্যথা উঠিছে বাজি?"*

ব্যথা যে বিশ্ব বাসীরই। যে যন্ত্রের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এমন সুর বাজিয়া উঠিল,—বিশ্বমণ্ডলীকে, আকাশ-বায়ুবর্গকে, সাগর-তরঙ্গকে যাহা প্রাণ-স্পর্শে জাগ্রত করিল, সেই যন্ত্র-যে আজ স্তব্ধ হইয়াছে! সে যে এক অপূর্ব্ব যন্ত্র!

সে-যেন শত-শত তন্ত্রী-ভরা এক অলোকসামান্য বাদ্য-যন্ত্র, না-জানি কত গৌরবেই তাহা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল!

" ... মনখানি মন
শত-শত তন্ত্রী-ভরা গীত যন্ত্র সম
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
গরবে-গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া!"

এ-যন্ত্রে যে জগতকে জাগ্রত করিয়াছিল তাহা কি আজও জাগ্রত না সুষুপ্ত? সে-যে এক "মহা মিলনের" জগত,—তাও কি কখন সুষুপ্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতে পারে?

"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে।"

ভাব-জগতে জাগ্রত কবি সেই জগতের আলোক-রশ্মিতে মুগ্ধ হইয়া গাইলেন,—

"আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!"

২

আজ এই অন্তর্দ্রষ্টা ভগবদ্ভক্ত কবির মর্ম্ম-কাহিনীর কথা চিন্তা করিতে বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে,—

"আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়ন পরে বাহিরেতে চাহ,—
অসীম আকাশ হ'তে বহিয়া আসুক স্রোতে বৃহৎ প্রবাহ।"
[রবীন্দ্র]

মনে হয়,—

"জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি!"
[রবীন্দ্র]

বিশ্ব-প্রেমে বিমুগ্ধ কবি চিত্তরঞ্জন গাইলেন,—

"মুক্ত বায়ু প্রভাতের আনন্দ কীর্ত্তন ভরে
নাচিছে পাগল হ'য়ে আনন্দের চারিধারে।"

আর, "পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার
যুক্ত করে বসে আছি, কর মোরে একাকার।"

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় তখন মনে হয়,—

"চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব-প্রাতে সে হয়ত আপনাতে পেয়েছে
উত্তর।" [রবীন্দ্র]

আমরাই যেন ভ্রান্ত! তাই,—

"অনন্তের ধনটীরে আপনার বুক চিরে চাহি লুকাইতে।"
[রবীন্দ্র]

কবি বলিতেছেন,—

"নগ্ন-মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের সম্মুখে প্রণম!"
[রবীন্দ্র]

আরো,—

"লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ-বিশ্বের মেলা,—
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলে খেলা।"
[রবীন্দ্র]

* চিত্তরঞ্জনের সমস্ত কবিতাংশ গুলিই "সাগর সঙ্গীত" হইতে গৃহীত।

৩

সান্ত্বনা ছাড়া আর কি আছে!

ইংরেজ কবি কীটশ্ (Keats)-এর মৃত্যুতে কবি শেলি (Shelley) তাঁহার উদ্দেশ্যে এডোনেইস্ (Adonais) বলিয়া সম্ভাষণে শোক প্রকাশ করিতেছেন,—

"I weep for Adonais,—he is dead!"

এডোনেইস্ আর নাই, আমি তাহারি জন্য শোক করিতেছি!"

তারপর ক্রমশঃ জীবিত কবি মৃত কবিকে জীবিতই দেখিতেছেন,—শোকের দারুণ আঘাত তাঁহার হৃদয়-স্পর্শী ভাষায়—আত্মপ্রকাশ করিতেছে,—

"Peace, peace! He is not dead, he death not sleep!
He hath awaken'd from the dream of life."
* * * * *
He has out-soared the shadow of our night.
* * * * *
He lives, he wakes,—'tis Death is dead; not he!
Mourn not for Adonais.———"

[Shelley, "Adonais"]

"ধীরে, ধীরে!—চুপ! সে-তো মৃত নয়, সে-যে নিদ্রিতও নয়! জীবন-স্বপ্নের অবসানে সে-যে আজ জাগ্রত! ......আমাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই যে রাত্রির আচ্ছাদন, সে-যে তাহাই ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে!......সে-যে জীবিত, জাগ্রত। মৃত্যুই-তো বাস্তবিক আজ মৃত,— সে-তো মৃত নয়!"

কতদিন চলিয়া গিয়াছে। শেলি কবির উক্তি আমাদের এই কবির উদ্দেশ্যে আজও প্রযোজ্য।

আর আমরা আমাদের পুণ্যগ্রন্থ গীতার বাক্য, শ্রীভগবানের বাক্য স্মরণ করিব,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি।" [গীতা ২।১৩]

৪

এক স্বর্গীয় সার্ব্বজনীন প্রেমই যে চিত্তরঞ্জনের কবি-চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে! এমন কবি-প্রতিভারও কি মৃত্যু হয়?

সমুদ্রের বিরাট-ভঙ্গিম বিচিত্র অভিনয়ে, বিশ্ব-বিমোহিনী শ্যামল প্রান্তরে, বিশ্ব-বাসী মানব মণ্ডলীতে, সর্ব্বত্রই যে তিনি একই অনন্ত ভগবানের "কারণ-লীলা" আত্ম-সত্তায় অনুভব করিতেছেন, "ইন্দ্রিয় সাহায্যে তিনি অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাহিতেছেন।"

"হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ি,—
দাঁড়াও ক্ষণেক,—তোমা ছন্দে গেঁথে লই।"

এই বিশ্বব্যাপী প্রেম-সাধনায় সাধক কবি সাগরকেই "অশ্রু পারাবার" বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, আর সর্ব্বত্যাগী ঋষির ন্যায় কত জন্ম-জন্মান্তরের প্রাণপূর্ণ কাহিনী ভগবৎ সমীপে জ্ঞাপন করিতেছেন,—

"হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার!
আমি যে তোমারি লাগি,
এসেছি সকল ত্যাগি,—
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার,
কত যুগ-যুগান্তর,—
কত জন্ম জন্মান্তর!"

এ-যেন বেদান্তসারের "অপরোক্ষানুভূতি" (direct realisation),—

"শ্রীহরিং পরমানন্দ মুপদেষ্টার মীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

[শ্রীশঙ্কর ভাষ্যম্]

এই পরমানন্দের অনুভূতির নিকট কোনো জাতি-ধর্ম্মগত পার্থক্য নাই, এ-যে বিশ্বের সমস্ত কবিত্বের সহিত একই মণ্ডলে স্থির-সন্নিবিষ্ট কাব্য।

পারসীয় সুফী কবি জালালুদ্দীন রুমি (Jalaluddin Rumi) বলিতেছেন,—

"The morn of blessedness hath dawned.

Morn ?

No, 'tis the Light of God!"

* * * *

Without the dealing of love there is no entrance to the Beloved.

* * * *

I gazed into my own heart ;
There I saw Him, He was nowhere else.

* * * *

None but God has contemplated the beauty of God."

["Divani Shamsi Tabriz", Wisdom of the East.]

"এ-যে আনন্দের প্রভাত-জাগরণ ! প্রভাত ? না, এ-যে ভগবানেরই আলোকচ্ছটা ! প্রেম ছাড়া তো প্রেমাস্পদের কাছে যাওয়া যায় না। আমি আত্ম-অন্তঃকরণে অনুসন্ধান করিলাম,—সেখানেই তো তাঁহাকে পাইলাম। তিনি যে আর কোথাও নাই। ভগবান্ ছাড়া কি ভগবৎ সৌন্দর্য্যের ধারণা করিতে পারে ?"

বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থেও তাই।

"Let the Sea roar, and the fullness thereof; let the fields rejoice, and all that is therein." [The Bible, 1 Chron 17; 32].

"Beloved, let us love one another; for love is of God, and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

He that loveth not, knoweth not God; for God is Love." [The Bible 1 John 4; 7—8].

"ভগবানের প্রেম যদি প্রকাশিত হইল, তখন সমুদ্র যত পারে গর্জ্জন করুক, পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ; সমস্তই তাঁহারই প্রেম-কীর্ত্তি, অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে। এস, প্রিয় এস ; পরস্পরকে আমরা ভালই বাসিব, কারণ প্রেমই যে ভগবান্। যে ব্যক্তি ভালবাসিতে জানে তাহার তাঁহাতেই উৎপত্তি, তাঁহাকে তার জানা আছে। যে ভালবাসিতে জানে না, সে ভগবানকে জানে না, কারণ ভগবানই-যে প্রেম !"

৫

ইংরেজ কবি টেনিসন গাহিলেন,—

"The Poet in a golden clime was born,
With golden stars above ;
Dower'd with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love."

[Tennyson, "The Poet."]

"সুবর্ণ রঞ্জিত গগনের নীচে কবির জন্ম, তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ তারকারাজি। ঘৃণার প্রতি তাঁহার ঘৃণা, দ্বেষের প্রতি তাঁহার দ্বেষ, আর প্রেমের প্রতি তাঁহার প্রেম !"

চিত্তরঞ্জনের আকাশ কিন্তু কেবল প্রেমেতেই রঞ্জিত, তাঁহার গগন কেবল ভগবদ্ভক্তির প্রাণস্পর্শী ধ্বনিতেই পূর্ণ, তাঁহার হৃদয়ের 'করতাল-মৃদঙ্গ' প্রেমের উচ্ছ্বাসেই শব্দ-মুখরিত।—

"সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে ! ... ...
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর রোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন বোলে।
... ... করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন।"

যেন ভগবৎ-বিরহেও চিত্তরঞ্জনের প্রেমানন্দ !—

"দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ, ঢেকেছ মরি ! কি মধু বিরহ দিয়া !"

এ যে বৈষ্ণবের ভগবদ্ভক্তি ! তাই বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শের সহিতই যে চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য্য।।

"নিতই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়,—
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি থায়।" (চণ্ডীদাস)

আর,— "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়। (বিদ্যাপতি)

পারসীয়া সুফী রমণী-কবি রাবিয়া (Rabia) গাহিয়াছেন,—"ভগবানের প্রতি আমার এত প্রীতি যে দুষ্টকেও ঘৃণা করিতে আমার সময় নাই !"

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম, সেই বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে এডিনবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক মনীষী পণ্ডিত বেরাইডেল কীথ্ (Berriedale Keith) মানবীয় প্রেমও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভূতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

The Gitagovinda of Jayadeva······is a perfect work of art, and it ows this result to the remarkable beauty of the Sanskrit language... The theme is simple and p pular, —the estrangement of Krishna from his well-beloved Radha··The beauty of nature is blended with human love."

[Keith, "Classical Sanskrit Literature" Heritage Series, pp 120-121]

"জয়দেবের গীত গোবিন্দ কাব্যকলার চূড়ান্ত সৃষ্টি...... ইহা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রণয়-বিরহের কাহিনী।...প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা মানব-অন্তঃকরণের প্রেম-আখ্যানের সহিত অপূর্ব্বভাবে সংমিশ্রিত।"

ইহা তাহা অপেক্ষাও অধিক। বৈষ্ণব কাব্যের ক্রমবিকাশের সহিত মানবীয় প্রেম যে ভাবে ভগবৎ-প্রেমে, বিশ্বপ্রেমে বিলীন হইয়াছে সেই 'ভাব' সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। আরবীয় ও পারসীয় সুফি কবিগণ সেই একই 'ভাবের' বিহ্বলতায় তন্ময়।

এই বিশ্ব-প্রেমেই চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার কেন্দ্রস্থল।

১০

চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভা বৈষ্ণবের সুরে সঞ্জীবিত। তাঁহার হৃদয়ে যেন সেই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গীত-ধ্বনি সর্ব্বদাই বাজিতেছে। তাঁহার অন্তঃকরণে বৈষ্ণব কবিগণের এক নবীন সঙ্ঘ।

"বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেব-কবীশ্বরঃ
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ।"

সেই কবি-সঙ্ঘ তাঁহারি হৃদয়ে বুঝি পুনঃ পুনঃ গাহিতেছেন যেন সেই গোবিন্দদাস রঘুনাথের মতনই সুরে,—

"কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে
লাখগীতে জগ-চিত চোরায়ল
গোবিন্দ-গোরি-সরস গানে।" (গোবিন্দ দাস)

যেন তিনি শুনিতেছেন,—

"জয় জয় শ্রীজয়— দেব দয়াময়
পদ্মাবতি রতিকান্ত,
রাধামাধব প্রেম ভকতি-রস
উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত।" (রঘুনাথ)

প্রেম যেমন শ্রীচৈতন্য দেবের অস্তিত্বেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যকে সার্থক করিয়াছিল তেমনি বুঝি তাঁহারও অন্তঃকরণে, তেমনি ভাবেই, তাহা ঝঙ্কার দিতে ছিল,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুঁহজন পীরিতি
প্রেম মূরতিময় কাঁতি,
যে করিল দুঁহজন লীলাগুণ-বর্ণন
নিতি নিতি নব-নব ভাতি।" (বৈদ্যনাথ)

১১

এ প্রেমের কি ধ্বংস আছে?

এ-যে অবিনশ্বর, অনন্ত। এ প্রেম যেন এক "মহামিলনের" "মিলন-মন্দির" সৃষ্টি করিতেছে, এখানে যেন আনন্দেও আনন্দ, বেদনায়ও আনন্দ।

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব কাব্যে এই "মহামিলনের" সন্ধান পাইয়াছেন। তাই যেখানে চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি চাহে," আর যেখানে বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল,' সেখানে ভাব-মুগ্ধ কবি চিত্তরঞ্জন কেবলি এক মহামিলন মন্দিরের "জীবন ধ্বনি" শুনিতে পাইতেছেন।

তাঁহার মানস-তীর্থে প্রতিষ্ঠিত এই "মহামিলন মন্দিরে" কবি যেন বিশ্ব জীবনের এক "মহামিলন" প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার নিজের ভাষায় এই মহামন্দিরে ···

"সংসার ও ধর্ম্ম, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।" আমরা দেখিতেছি, "আত্ম ও পর" ভেদ-নির্ব্বিশেষে সেই মিলন মন্দিরে সম্মিলিত হইয়া এক অভিনব মানব-তীর্থের প্রতিষ্ঠান করিয়াছে!

তাই কবি গাহিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গীতে, "গীত" ও "অগীতের" শব্দাতীত ধ্বনিতে, বুঝি তীর্থ দেবতারও হৃদয়-মন্দির ভরিয়া যাইতেছে,—

"আমার পরাণ লয়ে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি-তো আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা!
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার গগণে।
হৃদয়-মন্দির তব ভরি দিব গানে!"

* * * *

"কতশত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে
কতশত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা!
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী।
সকল সঙ্গীত মাঝে,-অগীত কি জানি!"

ইহাই চিত্তরঞ্জনের কবিতার রাজ্য। তাঁহার কবি প্রতিভায় এই মিলন ও বিরহের প্রচ্ছন্ন জ্যাতিত্ব বৈষ্ণবের সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। কবি বলিতেছেন; "আমরা যে ইন্দ্রিয়কে দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই, তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহামিলনের অনুসন্ধান করি!" আবার সেই "মহামিলনে"ও "মহাবিরহের" ছায়া সম্পাত! "ইহাই বাঙ্গালীর কবিতার প্রাণ।"* এ-প্রাণের কি বিনাশ আছে?

১২

মানবের প্রতি তাঁহার কি প্রেম! সেই প্রেম বিকাশেই যে তাঁহার মানস-কল্পিত "মহামিলন"-আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ইংরেজ কবি ব্রাউনিং (Browning) বলিতেছেন,—

"Round the cape of a sudden came the sea,
And the sun looked over the mountain's rim,—
And straight was a path of gold for him.
And the need of a world of men for me."

[Browning, "Parting at Morning"]

"এক পর্ব্বতের প্রান্তদেশে সমুদ্র; দূরে প্রভাত-সূর্য্য উদিত হইতেছেন,—মানব-জগতের দিকে আকাশ-প্রান্ত হইতে সূর্য্যরশ্মি আসিতেছে,—সমুদ্রের উপর দিয়া যেন সেই রশ্মিরাজি এক সুবর্ণরঞ্জিত পথ সৃষ্টি করিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই মানব-পূর্ণ পৃথিবীকে দিয়া আমারো-যে আবশুক!"

আমেরিকার কবি স্বনাম ধন্য ওয়াল্ট হুইটম্যান্ (Walt Whitman) বলিতেছেন,—

"The words of the true poems give you more than poems....They prepare for death, yet they are not the finish, but rather outset."

* * * *

"Whoever you are, now I place my hand upon you, that you be my poem.

I whisper with my lips close to your ear,—
I love none better than you." [Whitman, "Leaves of Grass."]

"বাস্তবিক যাহা কাব্য তাহা কবিতা-অপেক্ষাও অধিক। তাহা মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে,-তাহার সমাপ্তি নাই, তাহাতে কেবলি বিকাশ।

মানব, তুমি যেই হওনা-কেন, তুমিই আমার কবিতা। আমি তোমার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাপেক্ষা কাহাকেও অধিকতর ভাল বাসি-না।"

ভগবৎ-প্রীতি আর মানব-প্রীতি পরস্পর-পরস্পরে মিলিত, ওতপ্রোত!

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমেই চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার প্রাণ। এ-প্রাণের বিনাশ নাই,—এ-যে ভগবৎ-অস্তিত্বের সহিত, মানব-অস্তিত্বের সহিতই চিরংরে সম্বন্ধ, অনন্তকাল-বিস্তৃত।

* "নারায়ণ," ১৩২১, ফাল্গুন। "কবিতার কথা।"

১৩

আজ কবি নিন্দা-স্তুতির অতীত অনন্তধামে। সেই-যে "এপারের-ওপারের" বায়ু-হিল্লোলে তাঁহার কবি-হৃদয় আন্দোলিত হইত, সে-কথা ভাবিতে আজ বঙ্গসাহিত্যের সেবক মাত্রেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছে,—হৃদয় আর্দ্র হইতেছে। আজ কবির বাক্যের প্রাণস্পর্শী রহস্য যেন কোন্-এক নূতন সঙ্গীত-ধ্বনিতে মানবের কর্ণ কুহর দিয়া মানব মণ্ডলীর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেছে,—

"ওপারে কি আলো জলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়!
ওপারে কি গীত ধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়!
* * * * *
আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ,—
আমারে ভাসায়ে দাও তোমার ওপারে।
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙাল পরাণ হবে রাজার মতন?"

কে-না বলিবে, কবির প্রাণ-পূর্ণ প্রার্থনা আজ সার্থক হইয়াছে!

১৪

তার পর,—কি আশ্বাস বাণী! সেই "কবিতা মন্দিরের" কথা,—সেই "কবিতার প্রাণের" কথা!

কবির নিজ বাক্যের কি-এক গূঢ়তম সার্থকতা একদিকে যেমন বাঙালীর প্রাণকে কাঁদাইয়া দিতেছে, তেমনি আবার দৃঢ়তাপূর্ণ আশ্বাস বাক্যে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্য-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য স্থিরপন্থার নির্দ্দেশ করিতেছে,—

"আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতা মন্দিরে আমি যাহাকে বাংলা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায়-সেই মহা মিলন মন্দিরের ধ্বনি আমার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে-প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

"তাবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।"

কবির এই আশ্বাস-বার্ত্তা সার্থক হোক্,—"কবি-স্মৃতিতে" এই দীন সাহিত্য সেবকের ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

কবি বলিয়াছেন মৃত্যু সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠার কষ্টি পাথর। তোমার ধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে কি না তাহার প্রমাণ তুমি ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত কি না। তোমার প্রেমে নিষ্ঠা আছে কিনা তাহার একমাত্র পরীক্ষা তুমি দয়িতের সুখের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত কিনা। তোমার স্বদেশ প্রেমের পরম ও চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে পার কিনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাহা কেবল ভাবুক ও কবির উক্তি মাত্র নহে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর সে প্রাণ বলিদান সাময়িক উত্তেজনা ও ক্ষণিক মোহের প্রভাবে, অথবা আকস্মিক ভাবের আতি-শয্যে হয় নাই। তিনি দিন দিন তিল তিল করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সমরক্ষেত্রে প্রাণদান করা অপেক্ষা ইহা আরও ভয়ঙ্কর।

কিন্তু মৃত্যু যেমন প্রেম ও ভক্তির অভ্রান্ত কষ্টিপাথর ঐকান্তিকভাবে প্রেম ও ভক্তির পাত্রের জন্যই জীবন ধারণ

করাও তদ্রূপ। দেশের জন্য প্রাণ বলিদান অপেক্ষা কেবল দেশের জন্যই জীবন ধারণ করা, জীবনের সকল শক্তি ও সাধনা দেশের কার্য্যেই উৎসর্গ করা কম মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর কেবল দেশের জন্যই জীবন ধারণ করিয়াছিলেন ইহা সুপরিচিত সত্য, একটুও অতিরঞ্জিত নহে।

সার্থকনামা 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন জীবন ও মৃত্যু এই দুই কঠোর পরীক্ষা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে তিনি যথার্থই দেশবন্ধু ছিলেন—

চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু এই উপাধি কে কবে দিয়াছিল জানি না কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক সময় পণ্ডিতের তর্কে যে সত্য নির্ণীত হয় না সাধারণের মনে সূক্ষ্ম অনুভূতির বলে সহজেই তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। 'চিত্তরঞ্জন প্রকৃত দেশবন্ধু ছিলেন কিনা' রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ পুরুষগণের মধ্যে যখন তাহা লইয়া বিচার বিতর্কের অবধি ছিল না তখনই জনসাধারণ বিনা বিচারে বিনা আড়ম্বরে মনের সহজ জ্ঞানের প্রভাবে তাহা দৃঢ়ভাবে মানিয়া লইয়াছিল এবং মাত্র 'দেশবন্ধু' এই একটি শব্দে সেই সুবিস্তৃত সুতীক্ষ্ণ তর্কের জাল অনায়াসেই ছেদন করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যেরূপ শোক ও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং সসাগরা ধরণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার যেরূপ প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাইতেছি তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। এখানেও জনগণের মনে সত্যের সহজ অনুভূতির স্পষ্ট পরিচয় পাই।

চিত্তরঞ্জনের কথা মনে পড়িলে কত ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য বায়স্কোপের চিত্রাবলীর মত আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়। প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, লক্ষপতি ধনী, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, দানবীর, কর্ম্মবীর, ত্যাগী, ভক্ত, দেশপ্রেমিক, স্বরাজ মন্ত্রের উপাসক, নেতা, বক্তা, কূট রাজনৈতিক প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই সমুদয়ের বিশ্লেষণ আপাতত অনাবশ্যক। কারণ চিত্তরঞ্জন যে তাঁহার স্বদেশের ও বিদেশের চিত্তে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা ঐ সমুদয়ের বিশ্লেষণের ফলে নহে। উহাদের পশ্চাতে যে অপার ও উদার মহাপ্রাণতা ছিল তাহাই চিত্তরঞ্জনের বিশিষ্টতা। এই মহাপ্রাণতাই তাঁহাকে তাঁহার সমকালবর্ত্তীগণ হইতে পৃথক করিয়া উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই মহাপ্রাণতাই নানাদিকে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবনের নানাক্ষেত্রে তাঁহাকে গৌরবের উচ্চ শিখরে লইয়া গিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের এই মহাপ্রাণতার পরিচয় পাই তাঁহার অপরিসীম দানশীলতায়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের কথা শুনিয়াছি কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার আর তুলনা আছে বলিয়া মনে হয়না। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু কখনও কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই এমনকি মৃত্যুকালে ঋণগ্রস্ত ছিলেন—ইহাই তাঁহার দানশীলতার চরম পরিচয়। তাঁহার দানশীলতার বিষয় অবগত নাই বাঙ্গালাদেশে এমন লোক বিরল। আমি নিজে তাহার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত জানি তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। তিনি নির্ব্বিচারে দান করিতেন অনেক সময় রিক্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দান করিতেন। অর্থসম্বন্ধে এরূপ নিস্পৃহতা আর কাহারও দেখি নাই।

তারপর চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রাণতার চরম পরিচয় পাই তাঁহার অতুল ত্যাগের মধ্য দিয়া। চিত্তরঞ্জন ওকালতী ত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দরিদ্র জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহা সকলেই জানি কিন্তু তাঁহার এই ত্যাগ যে কত বড় ত্যাগ অনেক সময় আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করি না। তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু অ্যাটর্নী লিখিয়াছেন যে যে বৎসর তিনি ওকালতী ত্যাগ করেন সেই বৎসর তাঁহার ওকালতীর আয় ছিল আট লক্ষ টাকা আর যে সমস্ত মোকদ্দমা তাঁহার হাতে ছিল তাহা

হইতে অনুমান করা যাইতে পারিত যে পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহার আয় প্রায় বার লক্ষটাকা হইত। একমাত্র দেশমাতৃকার আহ্বানে তিনি এই অতুল বৈভব তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আর কেবল কি তাই? অপরিসীম বিলাসের মধ্যে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে অকস্মাৎ একদিন তিনি সমস্তই ত্যাগ করিয়া খদ্দর মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বতন ভোগবিলাসের বিষয় কিছু মাত্র অবগত ছিলেন তাঁহারাই এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলিয়াছেন যে চিত্তরঞ্জন রাজরাজড়ার ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তারপর একদিন স্বেচ্ছায় একেবারে দীন দরিদ্রের জীবন অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছিল তাহা বুঝিয়াও তিনি দৃঢ় সংকল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁহার ফ্রান্সে যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অর্থাভাবে যাইতে পারেন নাই তিনি বলিয়াছিলেন যে নিজের জন্য তিনি দেশের নিকট অর্থ-ভিক্ষা করিবেন না। যাঁহার বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ টাকা তিনি কয়েক সহস্র টাকার জন্য হৃত-স্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন।

চিত্তরঞ্জনের এই অসীম ত্যাগ ভাষায় বুঝান যায় না। ইহা কেবল হৃদয়ে অনুভব করাই সম্ভবপর। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের যে ত্যাগের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের কথা ভাবিতে গেলে আমাদের মনে সেই স্মৃতির পুনরুদ্দীপনা হয়। ধন্য সেই দেশ যে দেশে এমন ত্যাগী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়।

চিত্তরঞ্জন যে মতবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন কালে হয়ত তাহার মূল্য অনেক কমিবে কারণ জনমত পরিবর্ত্তনশীল। চিত্তরঞ্জন যে অতুল অধ্যবসায় সহকারে ও চরিত্রের দৃঢ়তা প্রভাবে 'স্বরাজ' দল গঠন করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে হয়ত তাহা অপেক্ষা আরও শক্তিশালী দলের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ত্যাগের মধ্য দিয়া যে অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কীর্ত্তি চিরদিন উজ্জ্বল থাকিয়া দেশকে মহান আদর্শে অনুপাণিত করিবে। তাঁহার এ উদার মনুষ্যত্বের যশ কখনও ম্লান হইবার নহে।

আমাদের দেশে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি মনুষ্যত্ব সাধনার এই তিনটি পথ বহু প্রাচীন কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন সাধনার এই তিন পথেই বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে জ্ঞানী ও ভক্ত অনেকে আছেন কিন্তু কর্ম্মীর বড় বেশী জন্মে নাই। গত পাঁচ বৎসরে চিত্তরঞ্জন যে কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। তাঁহার জীবনে ও কাব্যে এই বৈষ্ণব সাধক জ্ঞান ও ভক্তির ও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আর আইন বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করাও অনাবশ্যক। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের অপূর্ব্ব সম্মিলনে তাঁহার চরিত্র যেরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়াছিল সেরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল।

আজ প্রায় একমাস হইল চিত্তরঞ্জন কর্ম্মান্তে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পৃথীবীতে মনুষ্যত্বের আদর থাকিবে ততদিন চিত্তরঞ্জনের অমলকীর্ত্তি ও অতুল আদর্শ বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

চিত্তরঞ্জন-স্মরণে।

নিয়তির কি বিচিত্র লীলা! কোথায় চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মবহুল জীবনের গৌরবময় গতি নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিব, আর কোথায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে বসিয়াছি!

ঢাকায় আমরা কতকটা নিরাপদে বাস করি, বাঙ্গালার জাতীয় বা সাহিত্যিক জীবন স্রোতের কলকল ধ্বনি

আমাদের কানে আসে বটে কিন্তু সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিবার মত নৈকট্য আমাদের নাই। ইহা সম্ভবতঃ দুর্ভাগ্যের বিষয়; জাতীয় জীবন স্রোতের নিয়ন্তা যাঁহারা, তাঁহাদের নিকটে যে ভাগ্যবানগণ বাস করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক! এই দূরত্বকে কখনও দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হয় নাই, এই দূরত্বেও যেন যথেষ্ট আনন্দের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। যাঁহারা দুই বেলা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদিকে খাইতে, বসিতে, উঠিতে, শুইতে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন, তাঁহারাই যে তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, এ সব কথা স্বীকার করিতে পারিব না। মনে আছে, পাবনা সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি দূর হইতে দেখিয়া ভারী ভাল লাগিতেছিল; হঠাৎ যখন সভাপতি দাঁড়াইয়া বলিলেন—'এইবার রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিবেন—এবং এই সৌম্য মূর্ত্তি পুরুষটি কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তখন এই অতি পরিচিত মহা-পুরুষকে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ চিনিতে পারিয়া যেন বহুদিন অ-দৃষ্ট প্রিয়তম বান্ধবকে সহসা সম্মুখে দেখিতে পাইবার আনন্দ লাভ করিলাম।

দূরস্থ বিশ্রুত কীর্ত্তি মহাপুরুষগণ আমাদের নিকট অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক কল্পনা। আমরা তাঁহাদের কথা ভাবিয়া, তাঁহাদের কীর্ত্তি অনুধাবন করিয়া, তাঁহাদের নব নব কর্ম্মের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে আনন্দ পাই তাহা তাঁহাদের নিত্য সঙ্গীগণ পা'ন কিনা সন্দেহ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন আমাদের কল্পলোকে বাস করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, অসামান্য আইন জ্ঞান, তাঁহার অবিশ্বাস্য দানশীলতা উপকথায় কত লোকের মুখে মুখে শুনিতাম। এই বৎসর তিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। এই দীন লেখক ঢাকা সাহিত্য পরিষদের একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মী, তাই মনে হইল, কখনও না কখনও আমার এই কল্পলোক বাসীর সহিত দেখা হইতে পারে। শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৩২১ সনের বার্ষিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন আসিয়া সভাপতির কার্য্য করিবেন, শুনিলাম। আনন্দিত চিত্তে দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে চিত্তরঞ্জন আসিলেন; বর্ত্তমানে সদরঘাটের উপর যে বাড়ীটিতে ইষ্ট বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন অবস্থিত, তথায় তাঁহার বাসা দেওয়া হইল। ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। সে আজ প্রায় ১২ বৎসর এক যুগের কথা, সব কথা মনে নাই। কেবল যে দুই একটি ব্যাপার মনের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহাই লিখিতেছি।

চিত্তরঞ্জন ঢাকায় আসিবামাত্র তাঁহার নিকট জল স্রোতের মত লোক আসিতে লাগিল। নানা লোকের নানা রকম প্রয়োজন। কেহ গান শুনাইতে আসিয়াছে, কেহ বাঁশী ভাল বাজান, তাই শুনাইয়া চিত্তরঞ্জনের চিত্ত রঞ্জন করিতে আসিয়াছেন, কেহ বা কন্যাদায় জানাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াও চিত্তরঞ্জনের নিস্তার নাই, দুদণ্ড বসিয়া সাহিত্যিক আলাপে একটু জুড়াইবেন তাহার যো নাই। এমন রসবোদ্ধার রসিক চিত্তের অরস সাগরে দিবানিশি সন্তরণ এবং 'চুব' খাওয়া দেখিয়া আমার মনটা ভারী বিমর্ষ হইয়া গেল। আর কেবল প্রশংসা, কেবল খোসামোদ! এই কীর্ত্তি বিড়ম্বিত সম্পদ-দণ্ডিত হতভাগ্যের রস পিপাসু চিত্তের দারুণ পিপাসায় হাহাকার কি কেহ শুনে না?

একদিন সুযোগ মিলিল। তখন "অন্তর্য্যামী"র রচনা চলিতেছে। সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন এক অনুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত কক্ষে বসিয়া মৃদু ভাবাবেগকম্পিত কণ্ঠে আমাদিগকে অন্তর্য্যামীর পাণ্ডুলিপি হইতে কবিতার পর কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ঘরে কে কে ছিল মনে পড়িতেছে না, ১০।১২ জন লোক হইবে। আমরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভক্ত পথিকের পথ সন্ধানের আকুলতা যেন ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে, চারিদিক হইতে প্রশংসা মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া একধারে

বসিয়াছিলাম। চিত্তরঞ্জন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে কিছু বলছেন না?' আমি কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম—আমি আর কি বলিব, তবে আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটি কথা বলিতে চাহি।

চিত্তরঞ্জন মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'বলুন না?'

আমি বলিলাম,—'আর যাহাই করুন "অন্তর্য্যামী" "সাগর সঙ্গীত" এর মত অমন চকমকে করিয়া ছাপিবেন না।'

সকলেই জানেন, "অন্তর্য্যামী" অত্যন্ত সাধারণ বেশে বাহির হইয়াছিল। আর কেহ চিত্তরঞ্জনকে এই পরামর্শ দিয়াছিল কিনা জানি না। আমি কিন্তু মনে এই তৃপ্তিটুকু বহন করিয়া আছি যে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কথাটাও চিত্তরঞ্জন অবহেলা করেন নাই।

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় যেন একটা জীবনের বন্যা আসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দেশময় কত সভা, কত সমিতি, কত পাঠাগার, কত ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। দেশকে সমস্ত দিক হইতে জানিবার, দেশের সকল প্রকার শক্তি ও কর্ম্ম-ক্ষমতাকে জাগরিত করিবার একটা প্রবল প্রয়াস দিকে দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। এই উদ্বোধনেরই ফল, নানা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরিষৎ ও অনুসন্ধান সমিতিগুলি। বর্ত্তমান যুগে এগুলি একে একে শুকাইয়া যাইতেছে ও বিলুপ্ত হইতেছে। দেশের ইতিহাস, দেশের প্রাচীন সাহিত্য, পল্লী সঙ্গীত, পল্লী প্রচলিত উচ্চকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার যে প্রবল আগ্রহ বন্যার মত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিছুকাল হইতেই যেন তাহাতে ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ কি অন্ন চিন্তা চমৎকার, না অন্য কিছু তাহা দার্শনিকগণ বিচার করিবেন। অমনি ভাব বন্যার মুখে প্রবল উৎসাহে জন কয়েক কর্ম্মী ঢাকায় ১৩১৮ সনে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন যখন ১৩২১ সনে উহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। শুনিয়াছি চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—'যদি বাঁচিয়া থাকি তবে নবদ্বীপের মাতৃমন্দির এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া যাইব'। নানারূপ প্রতিকূল ঘটনায় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। কিন্তু নিয়মিত মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য তিনি ১৩২৮ সন পর্য্যন্তও ঢাকা পরিষদকে করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের নিয়মিত মাসিক সাহায্য ব্যতীত যে পরিষদ বহুপূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত এই বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

১৩২০ সনে ঢাকা মিউজিয়ম সদ্যপ্রসূত শিশুমাত্র, যে নিকেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত তাহাতে একখানা ক্ষুদ্র কক্ষে কয়েকটা পাথরের মূর্ত্তি এবং কিছু প্রজাপতি ফড়িং ইত্যাদি উহার সম্বল ছিল। তথাপি ঢাকার প্রতিষ্ঠান বলিয়া চিত্তরঞ্জন উহাকে এতখানি দরদই দেখাইলেন যে আমি অনুরোধ করিবামাত্র তিনি উহা দেখিতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। যথা সময়ে স্বীয় জামাতা সুধীর বাবুকে লইয়া চিত্তরঞ্জন মিউজিয়ম কক্ষে উপনীত হইলেন এবং সমাদরের সহিত উহার ক্ষুদ্র সংগ্রহ দেখিলেন। যাইবার সময় বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন, ঢাকা পরিষদের একটা সঙ্গীত শাখা খুলিতে হইবে। ঢাকা একসময়ে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গণের আবাসস্থান ছিল, এখনও ঢাকার সঙ্গীত খ্যাতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাঁহার কল্পনা ছিল, ঢাকার ওস্তাদ গণকে ঢাকা পরিষদের নেতৃত্বে একত্র মিলাইতে হইবে। এই সঙ্গীত শাখায় পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পত্তি ভাটিয়াল গান, পল্লী সঙ্গীত ইত্যাদিরও চর্চ্চা হইবে, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। মুড়াপাড়ার গীতবাদ্য বিশারদ জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই উদ্যোগে রত করিতে আমাকে পরামর্শ দিয়া গেলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভাপর হয় নাই।

আরও কয়েকবার চিত্তরঞ্জনের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একবারের কথাই উল্লেখ যোগ্য। তখন ১৩২৪ সনের শেষভাগ, বোধ হয় চৈত্র মাস।

ঢাকায় সাহিত্য সম্মিলন হইবার উদ্যোগ চলিতেছে এবং একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঢাকায় তখন সাহিত্য সভা ছিল দুইটি, এক ঢাকা পরিষদ, আর এক ঢাকা সাহিত্য সমাজ। এই উভয় সভার কর্ম্মী গণই ঢাকায় সম্মিলনের উদ্যোগী। সাহিত্য সমাজের কর্ম্মীগণের ইচ্ছা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েন তাঁহাদের সভাপতি—ঢাকা পরিষদের ইচ্ছা চিত্তরঞ্জনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা। এই দুই সাহিত্য সভার রেষা রেষিতে ঢাকার এক-টানা অচঞ্চল জীবনে বেশ একটু চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। ভোটে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যের সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই প্রতিদ্বন্দিতায় সুফল হইল এই যে সভ্যদের প্রদত্ত চাঁদা হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল এবং ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণকে অর্থাভাবে কখনও বিব্রত হইতে হয় নাই। সমাগত সাহিত্যিক অতিথি বৃন্দকে এমনই ভুরি ভোজনে তৃপ্ত করা গিয়াছিল যে একজন রসিক সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন—"ঢাকায় আয়োজনের কোন ত্রুটিই হয় নাই। তবে খাবার ঘরটা একটু দূরে আর বাসা দিয়াছেন দোতলায়। যদি কয়েকখানা স্ট্রেচার ও একটি ইলেকট্রিক লিফট্ থাকিত তবে আর আমাদের কোন বক্তব্যই থাকিত না।"

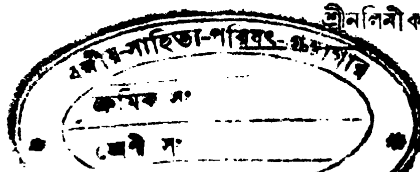
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জনকে প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে একবার চিত্তরঞ্জনের মতামত জানা আবশ্যক হইল। এই সময় কোন প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতা যাইতে হয়। আমার উপর পরিষদ হইতে ভার অর্পিত হইল—কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার মতামত জানিয়া আসিতে হইবে।

কলিকাতায় গিয়া বন্ধুবর ৺মন্মথ নাথ মজুমদার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একদিন চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিতে গেলাম। প্রাতঃকাল, বেলা নয়টা হইবে। কার্ড পাঠাইয়া বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, তাঁহার নীচের বসিবার ঘরে ডাক পড়িল। দেখিলাম আইনের গ্রন্থের প্রকাণ্ড বেষ্টনীর অভ্যন্তরে চিত্তরঞ্জন বসিয়া আছেন। অল্প কথায় তাঁহাকে ঢাকার বেবাক খবর কথা জানাইলাম। এমন সময় চিত্তরঞ্জনের আশ্রিত এক দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক বক্তা বোধহয় প্রাতর্ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচনে একদল বিরোধী হইতেছে শুনিয়া তিনি অগ্নি শিখার মত জ্বলিয়া উঠিলেন। বেশ একটু উষ্মার সহিতই বলিলেন—"আমি দেখ্‌তে চাই চিত্তরঞ্জনের নির্ব্বাচন কে আট্‌কে রাখতে পারে—we shall pack the reception committee, we shall buy down all opposition."

চিত্তরঞ্জন ঘৃণায় ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"আঃ তুমি কি বক্‌ছ, থামোনা। No more of that trickery. না নলিনী বাবু, ওসব হবে না। ঢাকার লোক যদি আমাকে না চায়, আমি কখনো হতে চাই না—এই আপনি উপেন-বাবুকে যেয়ে বল্‌বেন। যাক্ এসব কথা, এখন তো আর সময় নেই, আপনি রাত ৮টা ৮॥ টায় আস্‌বেন, একটু সাহিত্যালোচনা করা যাবে।" আজকাল কেহ কেহ নাকি Tammany Hall না কি সব method প্রয়োগ করার অপরাধে চিত্তরঞ্জনকে অভিযুক্ত করিতেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে কে কোন্ method অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমার কিছুই জানা নাই। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির প্রতি চিত্তরঞ্জনের গভীর ঘৃনার উক্তি এখনো আমার কানে বাজিতেছে। যাহা হউক চিত্তরঞ্জন সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

চিত্তরঞ্জনের নির্দ্দেশমত রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে গিয়া-ছিলাম। স্বল্পালোকিত কক্ষে বসিয়া প্রকাণ্ড দুই আলবোলার সুগন্ধী ধূমে গৃহে ধূম্রলোক সৃজন করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কবি ও কাব্যের আলোচনা চলিয়াছিল। বিশেষ বিবরণ কিছুই মনে নাই। শুধু এই মনে আছে যে তিনি বর্ত্তমান কবিতার বিরুদ্ধে কেবল বস্তুতন্ত্র হীনতার অভিযোগ আনিতেছিলেন এবং আমি প্রবল ভাবে কেবলি এই অভি-যোগ অস্বীকার করিয়াছিলাম। বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম তর্কবিশা-রদের সম্মুখে আমার সেই বালকোচিত বাচালতার কথা মনে পড়িলে এখনও মনে সলজ্জ সঙ্কোচ জাগিয়া উঠে!

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।



চিত্তরঞ্জন-তর্পণ।

১

বরিষা আরম্ভে আজ নব ঘন না হ'তে সঞ্চার,
কে হানিল বাজ করি তাদের স্বপন চুরমার।
রাজরাণী কাঙ্গালিনী কতকাল ধূলায় লুণ্ঠিত,
দিন দিন ক্ষীণ তনু, পদে পদে দলিত লাঞ্ছিত ;—
কোন্ কৃতী পুত্র তাঁর, মার অশ্রু করিতে মোচন
ত্যজিল বিত্তের মোহ, দীনতায় করিল বরণ ?
কাঙ্গালিনী মার নিধি, দেশবন্ধু যে চিত্তরঞ্জন,
হায় বিধি, কোথা সেই আদরের কৌস্তভ রতন ?

২

রঞ্জিবে সকল চিত্ত তাই নাম শ্রীচিত্তরঞ্জন
বিধির ইঙ্গিতে যেন রাখিলা শৈশবে পৌরজন ;—
শিক্ষার কি কথা তার পিতা যাঁর আপনি 'ভুবন,'
জ্ঞান মন্দিরের দ্বার খুলি গেল অমনি যেমন ;
দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, একান্ত ভকতি নারায়ণে
হৃদয়ে উঠিল ফুটি, তারা যথা সুনীল গগনে ;
বিশাল হইল চিত্ত, কিশোর করিয়া অতিক্রম
যৌবনে 'বাসন্তী' শোভা অঙ্গ যবে করিল শোভন।

৩

নবীন উদ্যমে যবে কর্ম্মক্ষেত্রে করিবে প্রবেশ,
ঋণভারে প্রপীড়িত বৃদ্ধ জনকের দীন বেশ
অদম্য হৃদয় তব করে নাই কভু ম্রিয়মাণ,—
হেলায় আয়ত্ত কৈলে অভীপ্সিত বিজয়-নিশান ;
মানবের মনোরাজ্য অচিরে করিলে অধিকার
শোধিয়া পিতার ঋণ, দাশরথি সম পুনর্ব্বার ;—
রাজরোষে রক্ষা করি দেশের সেবক-শ্রেষ্ঠ গণে,
অর্জ্জিলে অক্ষয় যশঃ গাইল ভুবনে জনগণে।

৪

কমলা ভারতী ভুলি সপত্নীর বৈরিভাব যত
তোমার আশ্রয়ে মর্ত্ত্যে বৈকুণ্ঠে করিল পরিণত ;—
কুবের আপনি আসি কোষাগার দিলা নিজ করে
তুষিলা অজস্র দানে স্বদেশের দরিদ্র নিকরে ;—
কমকণ্ঠে বিনাপাণি ধরি নিজে সুমধুর তান
গাইলা 'মালঞ্চে' নবকিশোর কিশোরী প্রেমগান ;—
বিশাল নীলাম্বু পানে শুভদৃষ্টি পরিল যখন
'সাগর সঙ্গীতে' মুগ্ধ মনে প্রকাশিল 'নারায়ণ'।

৫

একদিন মনে পড়ে, জীবগণে করিতে উদ্ধার
যৌবনে সাজিলা যোগী, রাজপুত্র ত্যজি রাজ্যভার,
ত্যজিলা যুবতী নারী, সুকুমার শিশুর মমতা,
যুগে যুগে ত্যাগী শুধু মানবের মুক্তির দেবতা ;—
তাই পুনঃ নদীয়ায়, প্রেমের অপূর্ব্ব অবতার
মাতৃ ভক্তি, পত্নীপ্রেমে জলাঞ্জলি দিলা আপনার ;
সাধিতে একই লক্ষ্য,—মানবের মুক্তির উপায়,
বিলাইলা হরিনাম আপামর সকলে ধরায়।

৬

'সাগর-সঙ্গীতে' কবি, পেয়েছিলে কি অপূর্ব্ব সুর,
পূর্ব্ব-স্মৃতি ত্যাগ-মন্ত্র কর্ণে বুঝি ধ্বনিল মধুর,
আবার দেশের মুক্তি,—দেশ শুধু তব পানে চেয়ে,
ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষা নিতে কে আর আসিবে পারে ধেয়ে ?

কার আছে এ সুকৃতী, কার আছে তপস্যা এমন,
দেশের হিতের তরে তৃণসম গণিবে জীবন ;—
নিজেরে আহুতি দিবে, মুনি-ইন্দ্র দধিচীর মত,
পরের সুখের তরে দুঃখ-ভার বহি অবিরত।

৭

অনন্তের সে আহ্বানে আপনি হইলে আত্মহারা
অনন্তে মিশায়ে দিলে আপনার অস্তিত্বের ধারা
ত্যজিলে বিলাস বেশ ;—তপস্যায় ঢালি প্রাণ মন
দেশের উদ্ধার তরে না করিলে কিবা বিসর্জ্জন
মৃতদেহে প্রাণ বুঝি তুমি পুনঃ করিলে সঞ্চার
নিরাশার ঘন মেঘে ক্ষণ প্রভা হাসিল আবার
চমকি শুনিল সবে তব নব গাণ্ডীবের ধ্বনি
উত্তর গোগৃহে যেন সব্যসাচী সাজিলা আপনি।

৮

ধন্য কুহকিনী আশা—মায়াবিনী পাতি ইন্দ্রজাল
কল্পনায় রচিয়াছে সুশোভন হর্ম্ম্য কি বিশাল ;—
জয়শ্রী বরিবে তোমা পার্থ সম কুরুক্ষেত্র রণে,
যুধিষ্ঠির পুনরায় উদিবেন ভারত-গগনে,
কৃষ্ণ সখা পুনরায় দেশে দেশে করি পদার্পণ,
সুখশান্তি পরিপূর্ণ করিবেন ভারত ভবন ;
বৃথা আশা, অকস্মাৎ আজ বীর তব তিরোধানে,
বিনামেঘে বজ্র হেন হানিয়াছে সকলের প্রাণে !

৯

দুরন্ত শমন আজ কোন্ পথে আসি অকস্মাৎ,
নিয়ে গেল কোন্ পথে হায় ! সেই অনাথের নাথ,
নীরব হইল আজ মধুর গম্ভীর সেই বাণী,
অন্তর সভয়ে করি যে দিত উৎসাহ সদা আনি;—
মধুর চরিত্র যাঁর রঞ্জিল হৃদয় সবাকার
অকাল অভাবে তাঁর অমানিশা, ঘোর হাহাকার ;
সে কর্ম্ম জীবন আজ চিরতরে হ'ল অবসান,
কাঁদ হে ভারতবাসী, কাঁদ আজ খুলি মনঃপ্রাণ।

১০

যাও তবে বীরবর, অমর আলয়ে আপনার,
দেশবন্ধু তুমি, দেশ যোগ্য আজ্ঞ (ও) হয়নি তোমার,
ভুঞ্জিয়াছ বহু ক্লেশ ;—হায়, তুমি যাদের মঙ্গলে,
অমঙ্গলে বরি নিলে, বিচ্ছিন্ন তাহারা দলে দলে
নাহি খেদ তাহে তব ;—তুমি নিজে একা মহারথ
স্ববলে করিয়া নিতে স্বদেশের মুকতির পথ ;—
অকালে কাঁদায়ে গেলে ;—তবু আছে বাণী শান্তনার,—
তোমরাই ঘুচাইবে যুগে যুগে দুর্গতি ধরার !

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চিত্তরঞ্জন-কথা। *

পৃথিবীতে দুটী বস্তু নিয়ত বিশ্বরাজের অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে—একটী পর্ব্বত এবং অপরটী সমুদ্র। অমরধামবাসী চিত্তরঞ্জন বিলাত যাতায়াত উপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা ও সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ও অন্যান্য কারণে জীবনে বহুবার শৈলারোহণ ও শৈল দর্শন করিয়াছিলেন। অচেতন অহর্নিশ বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র মহিমা গান করে এবং সেই পুণ্য ও মহান সংগীত কোন কোন

* সাহিত্য পরিষদের চিত্তরঞ্জন স্মৃতি সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি, এল, মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ।

ভাগ্যবানের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এবং তাহাতে ঐ সংগীতের প্রতিধ্বনিও' জাগরিত করে। পর্ব্বত চিত্তরঞ্জনের নিকট সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিল যে "তুমি পৃথিবী এবং মর্ত্ত্যবাসী ইহা সত্য বটে,—আমারও পৃথিবীতে জন্ম এবং আমারও পাদমূল পৃথিবীতে গভীর ও দৃঢ়ভাবে নিহিত ও নিবদ্ধ; কিন্তু আমি পৃথিবীর মেঘ ও ঝটিকার প্রদেশ অতিক্রম ও ভেদ করিয়া উর্দ্ধে আমার মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছি। তুমিও পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হও, কিন্তু পৃথিবীতে নিবদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিও না। মর্ত্ত্যলোকের শোক দুঃখ আপদ বিপদ ও দৈব দুর্ব্বিপাকরূপী অন্ধকারময় ঘন মেঘ ও ঝটিকা ভেদ ও অতিক্রম করিয়া সতত অনন্ত আকাশে উর্দ্ধদিকে তোমার মস্তক উত্তোলন করিয়া রাখিও কখনও তাহা অবনত করিও না।" সাগর-দর্শনে সাগর তাহার নিকট যে গভীর সমাচার ও সত্য প্রচার করিয়াছিল তাহা এই:—"হে প্রকৃতির ভক্ত ও পূজক, তুমি আমার গভীর ও মহান সংগীত নিবিড়ে শ্রবণ কর, সংসার সাগরের সুখ দুঃখের ভাগ্যের উত্থান পতনের তরঙ্গে আন্দোলিত ও বিচলিত হইও না। সংসার সাগরের সুখের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইও না। সংসার সাগরে গভীর রূপে অবগাহন কর, ডুবুরীর মত তাহার অতল তলে গমন কর। অমূল্য রতন লাভ করিবে।" চিত্তরঞ্জন এ উপদেশই ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন। ঐহিক সুখ সম্পদ প্রয়াসী কবির প্রাণে সাগর যে ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণে তাহার অপেক্ষা অন্যরূপ ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। তিনি সংসার সাগরের অতল তলে ডুবিয়া মানব-প্রেমরূপ অমূল্য রতন উদ্ধার করিলেন। মানব প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজ দুঃখ বিষাদিতে বিচার শূন্য হইলেন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে যে প্রেমাবতার চৈতন্য চন্দ্রের উদয় হয় সেই প্রেম ও চৈতন্যচন্দ্রের আকর্ষণে বঙ্গদেশে যে প্রেমের ও নব চেতনার বন্যা প্রবাহিত হয়; যে বন্যায় শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায় প্রায় হইয়াছিল। সেই বন্যা হইতে যে বঙ্গ-সাহিত্য গঙ্গার উৎপত্তি হয় এবং যে সাহিত্য গঙ্গা পুণ্য ভাগীরথীর তীর ও অমর কপোতাক্ষ ও বুড়ীগঙ্গা ও কর্ণফুলীর পুণ্য তীর দিয়া প্রবাহিতা হইয়া অবশেষে নিজকে সাগরে হারাইয়াছে এবং যে সাহিত্য গঙ্গায় স্নান করিয়া বাঙ্গালী পবিত্র হইয়াছে—নব জীবন লাভ করিয়াছে এবং প্রাণে নূতন আশাও ধারণ করিয়াছে;— চিত্তরঞ্জন সেই সাহিত্য গঙ্গার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহাতে পুণ্য স্নান করিয়া নব জীবন লাভ ও জীবনে নব ভাব ও নব চেতনা ও প্রাণে নূতন আশা ও নূতন শক্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সুগভীর বৈষ্ণব সাহিত্য সাগরে নিয়ত সুগভীর অবগাহন ও নিয়ত স্নান করিয়া তিনি মানব প্রেমে পরিপূর্ণ ও পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। সেই মানব প্রেম ক্রমে দেশ প্রেমে পরিণত হয়। দেশ প্রেমে বশীভূত হইয়া তিনি প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কারণ প্রকৃত প্রেমের স্বভাবই এই, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে 'প্রেমার স্বভাব এই বিধি নাহি মানে'। অবশেষে দেশ প্রেমাগ্নিতে দেশোদ্ধারের যজ্ঞে তিনি নিজকে আহুতি দিয়াছিলেন। আমি এ পর্য্যন্ত আপনাদের নিকট যাহা বলিলাম তাহাতে আমার পাষাণ হৃদয় কিছুমাত্র বিগলিত হয় নাই এবং আমার শুষ্ক চক্ষে একবিন্দু অশ্রুও আসে নাই। অতঃপর আমি চিত্তরঞ্জনের মাতৃ ভূমির সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার কথা বলিব। এই সময় সেই নবদ্বীপের নিমাইর কথা স্মরণ পড়িতেছে। নিমাই যখন জগতের লোকের পাপ দুঃখ মোচনের জন্য দীক্ষিত হন তখন তাঁহার গুরু ভারতী গোসাঞি আসিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, নিমাই দীক্ষিত হইবেত, সুন্দর চাঁচর কেশের মমতা ত্যাগ কর। নিমাই মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তারপরে বলিলেন নিমাই সুন্দর বেশভূষা পরিত্যাগ কর। নিমাই বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন এবং কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ করিলেন। তখন ভারতী-গোস্যাঞি বলিলেন, নিমাই আরও বাকি আছে এখনও হয় নাই। সংসারের সুখ ভোগ ও কাম লালসাকে চিরজীবনের জন্য বিদায় দেও। প্রেমা-

গ্নিতে কামাগ্নিকে ভস্ম কর আর ইহজীবনে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখদর্শনও করিতে পারিবে না। কেবল জননী শচীমাতার চরণ দর্শন করিতে পারিবে। এখন সংসার ত্যাগ কর এবং জগতের সেবায় বহির্গত হও। চিত্তরঞ্জন যখন জন্মভূমির সেবায় দীক্ষিত হইতে যান, তখন বঙ্গজননী তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, বাছা, এ বড় কঠিন ব্রত। এ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন তখন বলিলেন তথাস্তু। তখন বঙ্গজননী আপনি গুরু হইয়াই তাঁহাকে স্বদেশ সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং আদেশ করিলেম বাছা, সংসারের সুখের ক্রোড় ত্যাগ করিয়া আমার ক্রোড়ে এস। মনোজ্ঞ বেশভূষা ত্যাগ কর, কৌপীন ধারণ কর। জাতি কুল মান ত্যাগ কর। সাংসারিক মর্য্যাদা যশোলিপ্সা ত্যাগ কর। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর এবং সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী হও। আমাতে আত্ম সমর্পণ কর এবং আমার সেবায় নিযুক্ত হও। চিত্তরঞ্জন মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল দেশের সেবায় অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশ প্রেমাগ্নি কি প্রকারে জীবনে কষ্টভোগ ও মৃত্যুভয়কে নির্ব্বাসন করে তাঁহার জীবন তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের মত লোক মরে না—তাঁহারা অমর। তাহাদের পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের অমরাত্মা অনন্ত কাল অমর ধামে বাস করে এবং তথা হইতে, মাতৃসেবক মর্ত্তবাসীগণকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। আজ দেশে মাতৃসেবকের অপার প্রতিষ্ঠা। উপসংহারে এই কথা বলি "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ। যে মাতৃভূমির জন্য সর্ব্বত্যাগী ভিখারী হয় সে স্বদেশবাসীর হৃদয়ে অক্ষুন্ন রাজত্ব লাভ করে। আজ ভিখারী চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর হৃদয়ের রাজা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল।

কর্ম্মপথে,—"চিত্তরঞ্জন।"

১

কার আবাহনে তুমি, জেগেছিলে বল এক দিন ?
কে তোমারে দিয়েছিল অমৃত সন্ধান ?
তন্দ্রালস বিশ্ববাসী শুনেছিল মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে,
ত্যাগবীর,—তব ত্যাগ—মহামন্ত্র গান !
অন্নহীন, আশাহীন, প্রাণহীন এ ভারতবাসী,
ঘুমে অচেতন ছিল শিশুর সমান ;
মহাত্মা শুনাল তারে, অভিনব আদর্শের বাণী,
"সুখ-ত্যাগে, ভোগে তৃপ্ত হয়না পরাণ।"

২

ত্যাগ-মহামন্ত্র ল'য়ে কোন্ কর্ম্মী উঠেছিল জেগে,
ত্যাগকর্ম্মী মহাত্মার বাণী শিরে নিয়ে !
কর্ম্ম দিয়ে বাণী তাঁর, সত্য করে দেখাতে বিশ্বেরে,
কর্ম্ম-ব্রতে কেবা দিল আপনা বিকিয়ে ?
সর্ব্বত্যাগি, কর্ম্মব্রতি, কর্ম্মদিয়ে করেছিলে তুমি,
যেই মহা উদ্বোধন বাণী অহিংসার,
যে বাণী আদর্শ ক'রে, আজি নাকি মধ্যপথে তব
মৃত্যুযজ্ঞে উদ্‌যাপিত হো'ল যাগ তার।

৩

জেনেছিলে তুমি কি যে, আরো কত কতদূরে যেন,
কোথায় গন্তব্যস্থান এ চলার শেষে ?
অবিশ্রান্ত কর্ম্ম ক'রে ক্লান্ত বুঝি হ'য়েছিলে তাই,
বিশ্রাম লভিতে গেলে শ্রান্তিহর দেশে।
অনেক দিয়েছ তুমি আপনারে সর্ব্বরিক্ত করি,
তবু কাজ কোনদিন হয়নিতো সারা।
আজ দিলে আপনারে, ব্যাপ্ত করি সর্ব্বজন মাঝে,
তাই আজ ক্ষেত্র তব হোল সীমাহারা।

৪

এতোদিন ছিলে তুমি আপনাতে আপনার মাঝে,
তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র ছিল এই দেশ,
আজ প্রতি বিশ্ববাসী সত্য কারে পেয়েছে তোমাকে,
হে পথিক 'চলা' তব কোথা হো'ল শেষ ?
আপনারে পরিব্যাপ্ত করি গেছ প্রতি প্রাণ মাঝে,
তাই আজ আপনাতে নহ শুধু তুমি,
সকলের মাঝে আছ ত্যাগকর্ম্ম মহামন্ত্র লয়ে,
তাই আজ সারা বিশ্ব তব কর্ম্মভূমি!

শ্রীধরিত্রী দেবী।

সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন।

ভেনিস্ প্রজাতন্ত্রের পতনের পর পাশ্চাত্য মহাকবি Wordsworth গাহিয়াছিলেন :—

"Men are we and must grieve when
Even the shade
Of that which once was great
Has passed away"

বঙ্গ-গগনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর অস্তমিত হইয়াছে। সেই ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, কর্ম্মের অবতার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আজ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের জন্ম চোখের জল ফেলিতে আসিয়াছি, বক্তৃতা করিতে আসি নাই, সে ক্ষমতাও আমার নাই।

দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পর বহু সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে, বহু ভাবে তাঁহার পুণ্য জীবনী আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সাহিত্য জীবনের একটু আলোচনা করিব।

দেশবন্ধুকে আমরা সকলে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব এবং রাজনৈতিক নেতা বলিয়া জানি। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রাতভা সুধু আইন এবং রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনীতি এবং আইনের পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবিয়া সারাজীবন কাটাইয়াছেন বলিয়া চিত্তরঞ্জন বাণীদেবীর চরণ সেবা করিতে ভুলেন নাই। চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ প্রতিভা সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। 'সাগর সঙ্গীত' প্রকাশের পর চিত্তরঞ্জন সাহিত্য সমাজে 'সাগর সঙ্গীতের' কবি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য চর্চ্চা একরূপ তাঁহার পাঠদশা হইতেই আরম্ভ হয়। দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। 'বসুমতী' লিখিয়াছেন দার্জ্জিলিং মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও চিত্তরঞ্জন কবিতা লিখিয়াছেন এবং প্রিয় পরিজনকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

শিক্ষার জন্য বিলাত অবস্থানকালে চিত্তরঞ্জন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন এবং ঐ সময়ই সাহিত্য ও বাকপটুতার স্বীয় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। আরও শুনিয়াছি যে ঐ সময় তিনি Shakespeare এর কোন নাটকের ভূমিকায় বিলাতের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়া স্বীয় শিল্প শক্তি, অভিনয় কৌশল এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

"Child is the Father of the man" চিত্তরঞ্জন পাশ্চাত্য মনীষীর এই মহাবাক্যের জীবন্ত উদাহরণ। চিত্তরঞ্জন যখন বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন দাদা ভাই নৌরজী পার্লামেন্টের সদস্য হইবার জন্য বিলাতে আন্দোলন করিতেছিলেন। একজন ভারতবাসীর এই উচ্চাকাঙ্খায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের কল্যাণ কামনায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। তরুণ বক্তার বাক্‌পটুতায় তখন অনেকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন ম্যাকনীল ভারতীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই গ্লানিকর ভাষায় অবমানিত

করিয়া এক বক্তৃতা করেন। স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের বুকে প্রবাসে এই জাতি—নিন্দা শেলের মতন বিদ্ধ হইল। তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া এমন এক আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন যে তাহার ফলে মিঃ ম্যাকলীনকে ক্ষমা প্রর্থনা করিতে হইল ; এমন কি সদস্য পদ পর্য্যন্ত তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর আর একটী সভায় চিত্তরঞ্জন ভারত বাসীদের অবস্থা সম্পর্কিত বক্তৃতায় ইংরেজ শাসনের প্রতি এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তাঁহার নিজের ঐহিক উন্নতির উহা পরিপন্থী হইয়া পড়ে। মিষ্টার মিঃ গ্লাডষ্টোন ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রবাদ যে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় এমন দুর্দ্দমনীয় সিংহ শিশুকে খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে না, এই আশঙ্কায় সরকার বাহাদুর তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করেন নাই। চিত্তরঞ্জন প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বলিতেন যে সিভিল সার্ভিসে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—"I came out first in the unsuccessful list."

ইহার পর, তিনি ইনার টেম্পলে ব্যারীষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারীষ্টারী আরম্ভ করেন। উহার ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রথম ফল "মালঞ্চ" প্রকাশ করেন। 'মালঞ্চে'র কবিতা সমূহে বঙ্গ সাহিত্যে নূতন ধারার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। যদিও "মালঞ্চ" কবির যৌবন কালের রচনা, তথাপি ইহার কবিতা গুলিতে দুর্লভ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যে সৌরভ, যে সহানুভূতি ও যে কোমলতা আছে, তাহা অনেক কবির কবিতায় দেখা যায় না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারীষ্টার শ্রীযুক্ত বি, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুবিখ্যাত "পারভেন্ট" পত্রিকায় চিত্তরঞ্জনের "মালঞ্চ" সম্বন্ধে একটী সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—"১৮৯৭ খৃঃ অব্দে চিত্তরঞ্জন ব্যবসায় ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়াছেন এমনকি ফৌজদারী বিভাগে আইনজ্ঞ বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষটির সহিত আইনের সম্পর্ক অতি অল্পই ছিল। তিনি অধ্যাত্মাতত্ত্বেই বিভোর থাকিতেন। অশ্রু যেমন আপনা আপনি ঝরে, তেমনি কবিতার প্রবাহ তাঁহার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইত এবং ব্যবহারাজীবের কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও তিনি যে 'মালঞ্চ' লিখিয়া প্রকাশিত করিতে সময় পাইয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা প্রকৃত কবিতার ঐশ্বর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাকে ভিন্নরূপ সাফল্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার এই ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থে যে দুইটী সুর বাজিয়াছে, সেই সুর তাঁহার হৃদয়ের অবিনশ্বর ভাবরাজি হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। এবং সেই সুর দুইটী তাঁহার জীবনে চিরকাল সমভাবেই বাজিয়াছে। উহার একটী সুরে মানবের বিচার শক্তি ও বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের বিরোধ-মূলক দুর্জ্জেয় রহস্যের কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং দ্বিতীয়টীতে দুঃখ পীড়িত নরনারীগণের শোকে তীব্র সমবেদনার ভাবই ধ্বনিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টী প্রথমটীর আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে 'মালঞ্চ' রচনা করিবার সময় কবির বয়স ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন ও তিনি সেই বয়সের গণ্ডী ছাড়াই উঠেন নাই, যে বয়সে আমরা প্রাচীনদের ভক্তি বিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টির কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে আদৌ কুণ্ঠিত হইনা এবং যে বয়সে আমরা স্বাধীন বিচার শক্তির নিকট অনায়াসে মস্তক অবনত করিতেই প্রস্তুত।" *

* "In 1897 he had already reached the out-skirt of professional success, with his reputation well founded as a criminal lawyer. But the real man had little to do with law, and was all but wholly taken up with the things of the spirit. Poetry welled-up in him in

চিত্তরঞ্জনের যৌবনের রচিত 'মালঞ্চ' এবং পরিণত বয়সের লিখিত "অন্তর্যামী" এই দুই এর মধ্যে একটা ভাবের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। 'মালঞ্চে' কবি যেন কি খুজিতেছিলেন অথচ তাহার সন্ধান পাইতেছিলেন না। কবি বলিতেছেন,

"আকুল অন্তরে কত শুধায়েছে দাস,
করনি উত্তর দান। মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোথিত শিশু সম, সেই যে কাহিনী
আবার উঠিছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধার।
কোন মোহভরে, কোন পাপ পূণ্য বলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা একবিন্দু;
দুরন্ত অনল ভরা বিদ্রোহ অসীম
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার
কালকুট রূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে; তারি বিষে মোর!
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি
লুণ্ঠিত চরণে তব দীনের বেদনা
দয়া কর আজ॥"

কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনার বলে কবি "অন্তর্যামীতে" তাহার খোজ পাইলেন। তাই তিনি আনন্দবিহ্বল চিত্তে গাইলেন—

"বাজা রে বাজা রে তবে! বাজা জয় ডঙ্কা
নাহি লাজ নাহি ভয় নাহিকোন শঙ্কা!
পরানখানি কাঁপছে কত জয়মাল্য গলে
ফুলের মতন কি জানি গো ফুটেছে হৃদিতলে!
সুখের মতন দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ;
কোন্ গানের গরবে গো ভরিয়াছে বুক?
প্রাণের মাঝে একি শুনি! কি নীরব ভাষা?
বুকের মাঝে কোন পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা!
পায়ের তলে রাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা
বাজারে বাজারে তবে জয়ডঙ্কা বাজা!"

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব সাহিত্যের চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও অবসর সময় বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতেন এবং এই জন্যই তাঁহার "মালঞ্চ" এবং "অন্তর্যামীতে" বৈষ্ণব কবিদের খুব প্রভাব দেখিতে পাই।

চিত্তরঞ্জনের 'মালা' তাঁহার যৌবনের রচনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে। কারণ মালার ভূমিকায় কবি নিজেই লিখিয়াছেন যে ইহার অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার মালঞ্চ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় লইয়া কবির রচিত কতকগুলি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে! কবিতা গুলির ভাব এবং ভাষা সৌন্দর্য্যে পুস্তকের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের কিশোর কিশোরী তাহার পরিণত বয়সের রচনা। ইহার আখ্যান বস্তু হইয়াছে নায়ক নায়িকার প্রেম। এই প্রেমের

---

those days with the spontaneity of tears, and the "Malancha" which he made time for writing and publishing in the midst of his professional pre-occupation was full of the splendour of real poetry. Life carried him off along other auenues of realisation but the two notes that he struck in that little book of poems rose out of the imperishable part of him, and never ceased to vibrate through the rest of his life. The first arose out of a sense of the baffling mystery that brought one's reason into collision with one's thought of the Maker of life; and the second perhaps a consequential one—out of a feeling of over powering sorrow for suffering man and woman. Remember he was below thirty at the time—the age at which we render the most willing allegiance to reason and laugh at our elders prattling of faith or vision".

যে প্রকৃতি কি,তাহা কবি নিজেই এক যায়গায় বলিয়াছেন,"১টী নারী-মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ! অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু, সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি। তখন যে,

"স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ-মূরতি!
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই ততই যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে!

অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোত টলমল পদ্ম অপরূপ!

তারপরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে।"

তারপর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণের দুইটী তীর ভাসাইয়া দেয় এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা একজনের লীলা। পাশ্চাত্য কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (Worsworth) ফুলের রূপের ভিতরে ভগবানের রূপ দেখিতে পাইলেন। "কিশোর কিশোরীর" কবি নারীর রূপের ভিতরে তাহার স্রষ্টার রূপ দেখিতেছেন।

চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীত' বঙ্গাব্দ ১৩২১ সনে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের একটা করুণ ইতিহাস আছে। ১৩১৬ সনে সেই বিখ্যাত আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় স্বদেশ প্রেমিক চিত্তরঞ্জন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করেন। কৃতিত্বের সহিত এই মামলা পরিচালন করার দেশে দেশে তাহার নাম প্রচারিত হইয়া পরে। অরবিন্দের মুক্তির পর হইতে চিত্তরঞ্জনের ও ধনাগমের পথ মুক্ত হয়। কমলা অচলা হইয়া চিত্তরঞ্জনের গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের পরিবারের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকটী বিপদপাত হয়। ঐ সময় চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তরঞ্জন, স্নেহময়ী জননী এবং তাহার পরমারাধ্য পিতৃদেব একে একে স্বর্গারোহণ করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রাণের যাতনা দূরকরিবার জন্য তিনি সাহিত্যকে বিশেষভাবে আকড়াইয়া ধরিলেন এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রাণের দেবতার খোঁজ পাইলেন এবং স্বদেশকে চিনিলেন। এই সময় প্রিয়-পরিজন-বিয়োগ ব্যথা-কাতর চিত্তরঞ্জন 'সাগর সঙ্গীত' রচনা করেন। সাগরের অনন্তরূপে মুগ্ধ কবির আকুল আহ্বান ইহাতে কবিতাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির সাগর দেখিয়া কবি আপনার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং 'ছন্দাতীত ছন্দে' তাহাকে গাঁথিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কবি গাহিলেন,—

হে আমার আশাতীত হে কৌতুক ময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক, তোমা ছন্দে গেঁথে লই!
আজি শান্তি সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল্ কিযে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ, যদি হে রহস্য ময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবেনা সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দবন্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য অচঞ্চলা।

বন্ধুকে দেখিলে যে আনন্দ হয়, সিন্ধুকে দেখিলে কবির সেইরূপ আনন্দ, সিন্ধুর উৎসবে কবির 'সুখের রাশি' ফুল হইয়া ফুটে, সমগ্র দুঃখভার সঙ্গীত-রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সাগরবক্ষে যে গান কখনও ব্যথার সুরে কখনও বা নিবিড় আনন্দের সুরে ঝঙ্কৃত হয়, সেই গান গগনে পবনে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই কবির নিকট সিন্ধু 'অনন্তের গায়ক,' গীতই তাঁহার ধ্যান। কবি তাহাকে 'যন্ত্রী' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, আর 'যন্ত্র' বলিয়াছেন আপনাকে।

"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ! বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে"।

কবি কল্পনা করিয়াছেন, তিনি ও সাগর এক অনাদি, অনন্ত, নিত্য মহাপ্রাণ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছেন, জন্মে জন্মে তাঁহাদের মিলন হইয়াছে, জন্মে জন্মে তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইয়াছে, আবার মিলন হইয়াছে। কবি গাহিয়াছেন—

"ওগো মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।"

"সাগর সঙ্গীত" বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ব্ব বস্তু, ইহা কবিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই কবিতা পড়িয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, "Hindu Review" নামক পত্রে ইহার একটী সুন্দর ইংরাজী ছন্দানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের কবিতার ভাষার প্রবাহ বড়ই সরল এবং স্বচ্ছ। কুত্রাপি একটী কঠিন পদের প্রয়োগ অথবা বাগাড়ম্বরের প্রয়াস নাই। টানিয়া খিঁচিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া, টীকা টীপ্পনি দিয়া নিঙড়াইয়া উহার রস বাহির করিতে হয় না, অথবা আঁধার ঘরে হাতড়াইয়া উহার উদ্দেশ্য উদ্ধার করিতে হয় না। কবিতাগুলির ভিতরে এমন একটা করুণ সুর নিহিত আছে যে, পড়া মাত্রই প্রাণের কোমল তন্ত্রীগুলি আপনা আপনি বাজিয়া উঠে।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতে চিত্তরঞ্জনের সম্পাদকতায় বাঙ্গলা সাহিত্যে "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্রের আবির্ভাব হয়। "নারায়ণের" আকৃতি প্রকৃতি দুইই ছিল নূতন ধরণের। প্রবন্ধসম্পদে "নারায়ণ" ছিল অতুলনীয়। বহু স্ফুটোনোন্মুখ প্রতিভাকে চিত্তরঞ্জন "নারায়ণের" রশ্মিপাতে ফুটাইয়াছিলেন। "নারায়ণ" ৮ বৎসর কাল গৌরবের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছে। "নারায়ণের" "বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা" সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরদিন সম্মানলাভ করিবে।

চিত্তরঞ্জন শুধু সাহিত্য সেবক ছিলেন না, তিনি বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের বন্ধু ও উপদেশক ছিলেন। বহু সাহিত্যিককে ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া ও পরিচালনা করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা পরিচালন করায় চিত্তরঞ্জনের ব্যারীষ্টারীর খ্যাতি যেমন সাধারণে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই "সাগর সঙ্গীত" রচনার পর তাঁহার নাম সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। লর্ড বাইরনের (Lord Byron) এর মত চিত্তরঞ্জনও বলিতে পারিতেন "I woke up one fine morning and found myself famous"-বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজ চিত্তরঞ্জনকে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে আমরা তাঁহাকে তিনবার মূল সভাপতি বা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে পাইয়াছি—বাঁকীপুর, ঢাকায় ও মুন্সীগঞ্জে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি এ বৎসরের মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সভাপতিরূপে তাঁহার পঠিত অভিভাষণ গুলি ভাষাসম্পদে এবং ভাবমাধুর্য্যে উজ্জ্বল। চিত্তরঞ্জনের লিখিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে তাঁহার মধুর এবং বিনয়পূর্ণ স্বভাব, স্নেহার্দ্র হৃদয়, স্বদেশ প্রেম এবং মুসলমান প্রীতির আভাষ পাওয়া যায়।

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনা পরবর্ত্তী যুগে রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আসিতেছিল। তিনি জীবনকে কখনই খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নরূপে দেখিতেন না, তাই ধর্ম্ম সাহিত্য ও রাজনীতি তাঁহার মধ্যে অপূর্ব্ব সমাবেশ লাভ করিয়াছিল। রাজনীতির সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া

চিত্তরঞ্জনের লিখিত অনেক প্রবন্ধের আলোচনা এখানে করিতে পারিলাম না।

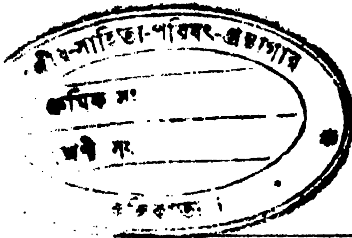
চিত্তরঞ্জন সাহিত্যের সেবা করিয়া, দেশের সেবা করিয়া, দশের সেবা করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন; তথাপি স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেছিলেন—ক্লান্তি এবং অবসাদে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। তাহাতেই তিনি আজ রণ সজ্জায় সজ্জিত বীরের মতন কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

"অন্তর্য্যামীর" কবি চিত্তরঞ্জন কর্ম্মক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী!
এস এস হৃদ্ মাঝারে হৃদয় বিহারী!
এস আমার আঁধার বুকে, এসো আলো করে!
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুঃখ হরে!
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা!
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা!
এস আমার প্রাণের মালা! এস মালাকর!
এস এই ঝড়ের মাঝে! এস বুকের পর!
এস আমার মরণ কালে এস হাসি হাসি!
আন তোমার মরণ হরা সব ভুলানো বাঁশী!"

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাহার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে অমরধামে লইয়া গিয়াছেন।*

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী।



* ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক আহূত ১৩৩২ সনের ১৪ই আষাঢ় তারিখের শোকসভায় পঠিত।

চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সাহিত্য সাধনা।

বাঙ্গালার গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। যে মহাপুরুষ উদ্দীপনার দীপক রাগিনীতে ভারতের নরনারীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। যাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের প্রবল উত্তেজনায় ভারতবাসীর চিত্তসাগর এক নূতন তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। যে অসাধারণ কর্ম্মবীরের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শত্রু মিত্র সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল—যাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ, অতুলনীয় প্রতিভা, অপরিসীম বদান্যতার কিরণচ্ছটায় বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—বাঙ্গালার সেই গৌরবের আস্পদ চিত্তরঞ্জন আর ইহধামে নাই। দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত, রোগক্লিষ্ট, পদদলিত ও লাঞ্ছিত বঙ্গবাসী আর কাহার মুখের দিকে তাকাইবে? কে আর তাহাদের জন্য অম্লান বদনে আত্মোৎসর্গ করিবে? কাহার উদার হৃদয়ের অফুরন্ত করুণা মন্দাকিনীর পূত বারিধারার ন্যায় বঙ্গবাসীকে অভিষিক্ত ও কৃতার্থ করিবে? বাঙ্গালী আজ প্রকৃতপক্ষেই সহায়হীন হইল!

Now is the stately column broke,
The beacon-light is quenched in smoke,
The trumpet's silver voice is still,
The warder silent on the hill!

আজ সেই বিশালায়তন স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; যে উজ্জ্বল দীপবর্ত্তিকা দেশবাসীর পথ প্রদর্শক ছিল, আজ সে দেউটী নিবিয়া গিয়াছে; যে মধুর তূর্য্যনাদ বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ তাহা নিস্তব্ধ হইয়াছে; বাঙ্গালার জননায়ক, বাঙ্গালার রক্ষক গিরিরাজের হিমশুভ্র অঙ্কে নীরব হইয়া গিয়াছেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্ব।

দেশবন্ধুর পরলোক গমনে সমগ্র ভারত ভূমি শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিন্তু ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তাহাতে একেবারে মুহ্যমান হইয়াছে। কারণ তাঁহার সহিত পরিষদের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক ছিল। তিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩১৮ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২০ সনের শেষ ভাগে চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তদবধি বরাবর তিনি ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিগত বৈশাখ মাসে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহাতেও তিনি পুনর্নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং ১৩২০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া তদীয় পরলোকগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বর্ষ কাল তিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশ্যই ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করাতে তাঁহার কোনই গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই, বরং তাহার মহনীয় নামের সহিত ঢাকা সাহিত্য পরিষদের নাম সংযুক্ত থাকায় পরিষদেরই অশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আজ কালের কঠোর কুলিশাঘাতে সেই গৌরব ধ্বজা সহসা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। যে গৌরব ঢাকা সাহিত্য পরিষদের প্রধান সম্বল ছিল আজ পরিষৎ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়!

দেশবন্ধু যখন প্রথম পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন তখন তিনি দেশ নায়কের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তখন তিনি কৃতী ব্যারিষ্টার এবং সাহিত্যরসিক ও সুকবি বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরই তাঁহার পৈতৃক বাস ভূমি। ঢাকার কৃতী সাহিত্য সেবক বলিয়াই আমরা তখন তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্বে বরণ করার জন্য আমরা আর তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইব না। আর ইহাও জানিতাম যে তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসভূমির একান্ত পক্ষপাতী। তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন, সমাজ ছাড়িয়াছিলেন, আর কার্য্যোপলক্ষে সতত কলিকাতা নগরেই বাস করিতেন। কিন্তু এক দিনের তরেও তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষদের বাসভূমিকে বিস্মৃত হন নাই। মহাত্মাজী গান্ধী এক জায়গায় বলিয়াছিলেন যে, Patriotism is doing good to those who are nearest to you. স্বদেশ হিতৈষিতার এই সংজ্ঞাই যদি যথার্থ হয়,—আর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করার বহু পূর্ব্ব হইতেই চিত্তরঞ্জন দাস একজন প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশের যে তিনি কত উপকার করিয়াছিলেন, নিরন্ন ও দুঃস্থ স্বদেশ-বাসীর তিনি যে কত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় হইয়াও, উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াও তিনি অন্যান্যের ন্যায়, স্বীয় পল্লী জননীকে কদাপি বিস্মৃত হন নাই বা তাহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। বরং বিবিধ উপায়ে স্বদেশের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্যই তিনি অতিমাত্র আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই জন্যই তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন। কেবল তাহাই নহে,—তিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদে নিয়মিতরূপে মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এবং ১৩২১ সন হইতে ১৩২৮ সনের পৌষমাস পর্য্যন্ত ঐরূপ অর্থ সাহায্য করেন। তারপর যখন তিনি দেশমাতৃকার আহ্বানে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, দেশ হিতরূপ মহাযজ্ঞে স্বীয় ব্যবসায়, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিকার চিত্তে আহুতি প্রদান করিলেন, কেবল তখন হইতেই, অর্থাৎ ১৩২৮ সনের মাঘ মাস হইতেই, বাধ্য হইয়া তিনি ঐ অর্থ সাহায্য প্রদানে বিরত হন। ইদানীং রাজনৈতিক কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যে তিনি আর পূর্ব্ববৎ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কোন অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পরিষদ তাঁহার হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই স্থান হইতে কখনও উহা

পরিচ্যুত হয় নাই। গত বৎসর তিনি যখন ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন তখন ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কালিপদ সরকার মহাশয় ও আমি তাহাকে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করি। তখন তিনি বলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনরায় ঢাকা আগমন করিবেন। সেই সময়ে সভা আহূত হইলে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। হায়, আমরা তখন জানিতাম না যে ঐ সময়ে অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে বসিয়া কঠোর হাসি হাসিয়াছিল। আমরা তখন জানিতাম না যে ঢাকায় তাঁহার সেই শেষ আগমন। আর ইহজীবনে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। তাঁহার সেই সৌম্য ও হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি আর আমাদের নয়ন পথের পথিক হইবে না। বিধাতার অভিসম্পাত!

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যানুরাগ ও গুণগ্রাহিতা

ঢাকা সাহিত্য পরিষদে অর্থ সাহায্য করাই তাহার সাহিত্যপ্রীতির একমাত্র নিদর্শন নহে। তিনি বহু সাহিত্যিকের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দ দাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত তবে আদিশূরের যজ্ঞভূমি,—বল্লালের অস্থি ভস্মে পরিণত যে দেশের পথের ধূলি—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম।" এই প্রশংসা মৌখিক ছিল না। ইহা যে আন্তরিক তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার কবি গোবিন্দ দাস পীড়িত হইয়া মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালের আশ্রয় লন। সেই খবর সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়া মাত্র, দাস মহাশয় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ ও গোবিন্দ দাসের অকৃত্রিম সুহৃদ, কামিনী কুমার সেন মহাশয়ের নিকটে টেলিগ্রাফ করেন যে, গোবিন্দ দাসের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন। এবং যাহাতে তাঁহার উত্তমরূপে চিকিৎসা হয় তজ্জন্য সুব্যবস্থা করিবার জন্যও কামিনী বাবুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি যে কতদূর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি যে কিরূপ অকৃত্রিম ছিল এই ঘটনাই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

অন্যান্য কত সাহিত্যিকের যে তিনি সাহায্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি বঙ্কিমের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে তিনি স্ব-সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকার এক বঙ্কিম সংখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদিগকে বঙ্কিমের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের সুযোগ দিয়াছিলেন। এইরূপ বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্যানুরাগ ও গুণগ্রাহিতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে বৈষ্ণব কবিগণের, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের, তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনা উহাদিগের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তদ্রচিত অন্তর্য্যামী নামক কাব্যের সমালোচনা কালে আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কবি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগেরই বংশধর। যাঁহারা তাঁহার কাব্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহারাই ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আজ এই সভায় আমি তাঁহার কাব্য-প্রতিভারই আলোচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন বিশিষ্টভাবে আলোচিত হইতেছে এবং আরও হইবে। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক জীবন সে ভাবে আলোচিত হয় নাই। তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার দানও সামান্য নহে। মালঞ্চ, সাগরসঙ্গীত, মালা, অন্তর্য্যামী ও কিশোর কিশোরী, এই পাঁচখানা গীতিকাব্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা সাহিত্য সভায় সভাপতিরূপেও তিনি কয়েকটী সারগর্ভ লিখিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

নারায়ণ পত্রিকার সম্পাদকরূপেও তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও সে গুলিতে তাঁহার রচনানৈপুণ্য, চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এত কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও তিনি কিরূপে ইহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সাফল্য যে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সম্যক পরিপুষ্টির অন্তরায় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনা

বলিয়াছি যে, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের আলোচনা করিব। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। তাহা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শোকসভা সে স্থানও নহে। সেজন্য আজ আমি সেপথে যাইতে ইচ্ছা করিনা। কোনও জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহা বুঝিতে হইলে, আগে উত্তমরূপে উহার স্বরূপ বুঝিতে হয়। আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ না বুঝিয়া তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করা বৃথা। উহার কোন মূল্যই হয় না। অতএব অদ্য আমরা চিত্তরঞ্জনের কাব্যের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। সে কাব্য কোন শ্রেণীর (school) অন্তর্গত এবং উহার লক্ষণই বা কি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এবং সঙ্গে ২ কাব্য হইতে কবিকেও বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

চিত্তরঞ্জনের ভাবুকতা—ভাবুকতার লক্ষণ

যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের কাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মাইকেল, হেম, নবীনের কবিতার সহিত উহার পার্থক্য অনুভব করিয়াছেন। শেষোক্ত কবিগণ সকলেই মহাকাব্য লিখিয়াছেন; চিত্তরঞ্জন কেবল গীতিকাব্যের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্থূল পার্থক্য। বলা আবশ্যক যে এই পার্থক্য স্থূল হইলেও ইহার কারণ সূক্ষ্ম যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ পার্থক্যও আছে। চিত্তরঞ্জনের সুর একটু অভিনব, একটু নূতন। এই নূতনত্ব কোথায়? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ভাবুকতাই (mysticism) চিত্তরঞ্জনের বিশেষত্ব। তিনি একজন খাঁটি ভাবুক কবি (mystic) ছিলেন। এই ভাবুকতার (myticismএর) সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কারণ, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাহা লইয়াই ভাবুকতার খেলা। যে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে আমরা আবৃত রহিয়াছি সেই রহস্য ভেদ করাই ভাবুকদিগের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাহ্য অনুভূতি যে যবনিকার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, ভাবুকেরা সেই যবনিকা অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন। এক অজানা রাজ্যের অজানা কথা শুনিবার জন্যই তাঁহারা কান পাতিয়া থাকেন। সসীম ও অসীমের যে বিরোধ,সান্ত ও অনন্তের যে দ্বন্দ, যাহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত,—যুক্তি যেখানে শক্তিহীন, ভাষা যেখানে মূক,—মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য সেই অতীন্দ্রির রাজ্যেই তাঁহারা বিচরণ করিতে ভালবাসেন। তাহার কথাই তাঁহারা নানা ছন্দে নানা ভাষায় কহিয়া থাকেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতের বিরোধ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, "তুমি এক, তুমি দুই,—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রসস্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা! (নারায়ণ ১৩২১ সন ৩ পৃঃ) কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় হইতে পারে না; জগতের জটিল সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। ভাবুকেরা ইহাই বিশ্বাস করেন। দেশবন্ধু এক রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, Life is higher than logic. একথা কেন বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দীরা বুঝিতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা তাঁহার অন্তরের ইতিহাস জানিতেন, তবে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেন।

ভাবুকতার প্রসার ও প্রাচীনত্ব

এই ভাবুকতা (mysticism) কোনও অভিনব বস্তু নহে। ইহা বহু প্রাচীন সামগ্রী। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সমস্ত বৈষ্ণব কবিরা mystic ছিলেন। তাঁহাদেরও বহু পূর্ব্বে সহজিয়া সম্প্রদায় এই ভাবুকতার প্রচার করিয়াছিলেন। স্বয়ং চণ্ডীদাস সহজিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার কাব্যেই তাহার উল্লেখ আছে,—

সহজ ভজন করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।

তান্ত্রিকেরাও ঘোর মিষ্টিক। তাহাদের ভৈরবীচক্র মিষ্টিক সাধনার উৎকটকোটীতে আরোহণের চরমদৃষ্টান্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে,গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং কোন ২ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে পার্থক্য অল্প। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন চিনি খেতে ভালবাসি"। শাক্ত বিদ্বেষী হইলেও কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবই এই কথায় সায় দিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

এই ভাবুকতা কেবল ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ নহে। মুসলমানদের মধ্যে সুফীসম্প্রদায় ভাবুকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। পারস্য কবি হাফেজ ও সাদির কাব্যও মিষ্টিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ওমার খৈয়মে স্বাধীন চিন্তার (free thinking) প্রভাব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তিনিও ভাবুকতার প্রভাব হইতে একেবারে পরিমুক্ত নহেন। মধ্য যুগের কোন ২ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও 'মিষ্টিক' ছিল *। ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী প্লটিনাস (Plotinus) প্রমুখ নিউ-প্লেটোনিষ্টেরাও (Neo-Platonist) ভাবুক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। আর যদি এতদপেক্ষা প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় উপনিষদ্ সমূহ ভাবুকতার মূল উৎস।

ভাবুকতা (Mysticism) ও মায়াবাদের (Idealism) পার্থক্য।

এই মিষ্টিকেরা জগৎকে অসার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শঙ্কর মতাবলম্বী মায়াবাদীরা (Idealists) যে অর্থে জগতকে অসার বলেন,ইঁহারা সে অর্থে বলেন না। এই জগৎ স্থায়ী নহে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে উহা একেবারে মিথ্যাও নহে। এই জগৎও তিনি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", উপনিষদের এই মহাবাক্যের উপরই ভাবুকতার প্রতিষ্ঠা। সমস্তই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে জগৎও ব্রহ্ম। অসীমই সসীম হইয়াছেন, অনন্তই সান্ত হইয়াছেন, সেই অরূপই রূপসাগরের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। এই রূপসাগরে ঝাঁপদিয়া ভাবুকেরা তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছেন, "গীতি কবিতা প্রাণের সেই অতলস্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে"। "শিল্পের সাধনা করিতে করিতে রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে এই রূপরসভরা শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে; যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়।" (নারায়ণ, ১৩২৪।১২৫পৃঃ।)

কাব্যক্ষেত্রে এই পার্থক্যের ফল

এইজন্য বাহিরের প্রতি ভাবুকদিগের লক্ষ্য অল্প, অন্তরের দিকেই দৃষ্টি বেশী। মিষ্টিক সাহিত্যে বাহ্যজগতের বর্ণনার অল্পই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহারা ভিতর নিয়াই ব্যস্ত। চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন,—

---

* Agape or Love Feasts, a kind of Chakra, were held in early times and discontinued as orthodox practice on account of abuses to which they led; though they are said still to exist in some of the smaller Christian sects of the day. Woodroffe's *Shakti and Shakta p50.*

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা ।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা ॥

এই অন্তর্দৃষ্টির ফলেই ভাবুকেরা গীতিকবিতার চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং এই জন্যই বাহ্যঘটনাবহুল, নানা বৈচিত্র্যময় মহাকাব্য রচনায় তাঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে এই পার্থক্যের ফল

ভাবুকেরাও ত্যাগী। কারণ তাঁহারা জগৎকে একেবারে মিথ্যা মনে না করিলেও উহাকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং সংসারে তাঁহাদের প্রবল আসক্তি জন্মিতে পারে না। এইজন্য চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারত্যাগের সহিত মায়াবাদীর সংসারত্যাগের পার্থক্য ঢের। মায়বাদীরা কেবল সংসার ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাসও করিয়া থাকেন। ভাবুকেরা তাহা করেন না। ভাবুক চিত্তরঞ্জনও সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করেন নাই! সংসার ত্যাগের পরেও তিনি হৃদয়ের শোনিত দিয়া নরনারায়ণের সেবা করতঃ আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। যাহা হউক, তাঁহার বদান্যতা ও বৈরাগ্যের মূল উৎস কোথায় তাহা বোধহয় এক্ষণে আমরা কিছু ২ বুঝিতে পারিয়াছি।

ভাবুকতা ও প্রেম

ভাবুকতা কেবল কাব্যেই নিবদ্ধ নহে। ইহা দর্শন এবং সাধনা জগতেও বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মিষ্টিক সাহিত্য বুঝিতে হইলে উহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। টেইন (Taine) বলিয়াছেন, Beneath every literature there is a solphophy. প্রত্যেক সাহিত্যের অন্তরালেই একটা দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত থাকে। ভাবুক সাহিত্য সম্বন্ধে একথা যেমন প্রযোজ্য এরূপ আর কোথায়ও নহে। অনেকে বৈষ্ণবদর্শন বাদ দিয়া বৈষ্ণবসাহিত্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টার মূল্য কতটুকু তাহা জানি না। যাহা হউক, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই ভাবুকতার দার্শনিক ভিত্তি এবং নায়ক নায়িকার প্রেমাভিসারই উহার কাব্য ও সাধনার অঙ্গ। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, “বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে রূপ চিন্তামনির অচিন্ত্য দ্বৈতদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেলা।” “এই মানব প্রাণের অনন্ত ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলন ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম। ……একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্বধন।” পৃথিবীর সমস্ত মিষ্টিক সাহিত্যই এই প্রেমের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইবে। হাফেজ ও সাদির কাব্য রমনী ও সুরার গুণ গানে পরিপ্লুত। বৈষ্ণব সাহিত্যও পরকীয়া প্রেমে উচ্ছ্বসিত।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,

পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার।

ভাবুকতা ও কোমলতা

ভাবুকেরা ভাবপ্রবণও বটে। এই জন্য মিষ্টিক সাহিত্যে নয়নাশ্রুর আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা নয়নাশ্রুতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। ইহা ভাবুকতার সাধারণ লক্ষণ। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, "mysticism is sensuous and feminine" আমরা নিন্দাপ্রশংসা করিতে বসি নাই; ভাবুকতার স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অভিযোগের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, গোড়াতে ভাবুকতা (mysticism) আদিরসাত্মকও ছিলনা বা

উহাতে নারীসুলভ কোমলতাও ছিল না। উপনিষদে তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার রসের দিক শ্রুতিতে অল্পই অনুশীলিত হইয়াছে। শ্রুতিতে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্তারই পূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। এই জন্য উপনিষদকে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। আর উপনিষদে দ্বৈত ও অদ্বৈতের মিলনের সহিত স্ত্রীপুরুষের মিলনের তুলনা করা হইয়াছে বটে; (একটু পরেই আমরা তাহার আলোচনা করিব) কিন্তু তথাপি কোমলতা উপনিষদের বিশেষত্ব নহে। উপনিষদের প্রত্যেক বাক্যই তেজোদৃপ্ত সিংহের উক্তি। যে কোমলতা, ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব এখন ভাবুক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পরবর্ত্তিকালের পরিণতি। চিত্তরঞ্জনও কর্ম্মজীবনে সিংহবৎ তেজস্বীই ছিলেন। তাঁহারা প্রবল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে পর্ব্বতও নত হইয়াছে, অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড অভিঘাতে বিশাল রাজপ্রাসাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কাব্যে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য ভাবুকসাহিত্যসুলভ কোমলতা, মাধুর্য্য ও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ।

ভাবুকতা ও ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা

আবার ভাবুকদিগের কাব্যের ন্যায়, চিত্তরঞ্জনের কাব্যেও ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা আছে। তিনি তাহার এইভাবে সমর্থন করিয়াছেন,—

"কেহ ২ বলেন ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা, কলাকলায় তাহার স্থান নাই।.........কিন্তু, "ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মনগড়া শুদ্ধ পবিত্রলোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়াও যেমন, শূন্য আকাশে গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ।" (নারায়ন ১৩২৪।৩০৫পৃঃ)

চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবেরা ইহার আরেক প্রকার উত্তর দিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কান্তভাবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া বরণ করিয়াছেন। রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার যে সম্ভাষণ হয় তাহাতে সে কথা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল প্রকার প্রেমেই উপাস্য উপাসকের একটু পার্থক্য থাকিয়া যায়। একমাত্র নায়ক নায়িকার প্রেমেই উহাদের পূর্ণ মিলন হয়; তখন আর ভেদ কিছুই থাকে না। রামানন্দ বলিয়াছেন,—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হম রমনী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥

ইহাই বৈষ্ণব কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব এবং এই জন্যই বৈষ্ণবেরা প্রেম নিয়া এতই মাতোয়ারা। রামানন্দ এই গীতে বৃহদারণ্যকের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্।

প্রিয়তমা স্ত্রীকর্ত্তৃক সম্পরিস্বক্ত হইলে যেরূপ বাহ্য বা অন্তর কিছুই অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সম্পরিস্বক্ত হইলে জীবাত্মাও অন্তর বাহ্য কিছুই অবগত হইতে পারে না।

যাহা হউক, বৈষ্ণবদিগের নিকট কান্তভাবেরই প্রাধান্য এবং এইজন্য বৈষ্ণবকাব্য প্রেমগীতে পরিপূর্ণ।

ভাবুকতা ও দুর্ব্বোধ্যতা

ভাবুক দিগের বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্যতার জন্য ভাব ও ভাষা উভয়ই দায়ী হইতে পারে। সহজিয়াদের দুর্ব্বোধ্যতা অনেকটা ভাষাগত। কারণ তাঁহারা সন্ধ্যা ভাষায় দোঁহা রচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ, আলো আঁধারে

ভাষা ;—কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। কিন্তু সকল মিষ্টিকই এই দোষে দোষী নহেন। চিত্তরঞ্জনের ভাষা অতি সরল ও অনাবিল। উহার স্বচ্ছন্দগতি পাঠকের চিত্তহরণ করে। তিনি আধুনিক লেখকদিগের ন্যায় ভাষা নিয়া ব্যায়াম করেন নাই। ফলতঃ, আধুনিক কোন কবির ভাষাই তাঁহার ভাষার মত প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত নহে। তিনি যে বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা। উহাতে বিদেশীয় ভাষার প্রভাব একেবারেই নাই। এই ইংরেজ প্রভাবের যুগে ইহা বিস্ময়কর বটে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন যে, পদ্যের ভাষাও গদ্যের মত সরল ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জনের রচনা-পারিপাট্যের আদর্শও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আদর্শের অনুরূপই ছিল। এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তিনি এই আদর্শেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা গদ্যের মত সরল ও স্বাভাবিক বলিয়াই তাহা বুঝিবার জন্য পাঠকের কোন বেগ পাইতে হয় না। তবে তাঁহার রচনার যে দুর্বোধ্যতা আছে, তাহা ভাবগত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক অজানা রাজ্যের অজানা কথাই ভাবুকেরা ব্যক্ত করিতে চাহেন। যাহা বুদ্ধির ভূমি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহা নিয়াই যখন ভাবুকতার খেলা, তখন যে তাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপ দুর্ব্বোধ্যতা ভাবুকতার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এদেশে ভাবুকতার পুনরাবর্ত্তন হইয়াছে। মাইকেলের যুগে ইহার প্রভাব ছিল না; ইউরোপেও না। ইদানীন্তন ইউরোপে ইহার পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে। যে ইবসেন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে নাটক লিখিয়া কীর্ত্তিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি ও শেষজীবনে mysticismএর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষকালের এক নাটকে স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছে, You promised to take me to the hill-top and shew me the glories of the world. স্বামী স্ত্রীকে প্রণয়ই দিতে পারে; জগতের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিবে কিরূপে? ইহা ভাবুকতার ভাষা। ইংলণ্ডের কবি Yeats প্রভৃতি ও mystic. আর আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ইহার চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধহয় এখনও আসে নাই।" (নারায়ণ ১৩২৪।১৫১ পৃঃ) সে যাহাই হউক, চিত্তরঞ্জন যে খাঁটি প্রাচ্য ভাব দ্বারা, সুধু বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে উপসংহারে আমরা আরও কিছু আলোচনা করিব।

মালঞ্চ

উপরে ভাবুকতার যে সব লক্ষণ উল্লেখ করা গেল চিত্তরঞ্জনের রচনায় তাহা সমস্তই পরিলক্ষিত হইবে। তাহা সমস্ত দেখাইতে পারিব না; কারণ সময়াভাব; কতক ২ দেখাইতেছি।

আমি বলিয়াছি যে ভাবুকেরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা বাহির নিয়া ব্যস্ত নহেন। চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্য মালঞ্চে তিনি লিখিয়াছেন,

তোমরা ডেকেছ তাই আসিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন মালঞ্চের।
তোমরা দেখেছ সুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের,
হৃদয় সম্পদ রাশি ফুটেনা ভাষায়—
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায়।

চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন,

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ারে খোলা।

আর চিত্তরঞ্জন বলিলেন,

'সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায়।'

উভয়ের কবিতাই একশ্রেণী ভুক্ত কি না তাহা আপনারা বিচার করুন।

এই মালঞ্চ প্রকাশিত হওয়ার পর ইহার তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন, "ইহাতে আদিরসের বাহুল্য—শুধু তাহা নয়—তাহার সহিত সুরাপাত্র, স্বর্ণ সুরাও আছে, বলিতে যদিও একটু লজ্জা হয়—না বলিয়াও থাকিতে পারি না—বারবিলাসিনীও আছে!" সমালোচক এখানে কবির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। এরূপ সমালোচনা নিরর্থক। চণ্ডীদাসে রজকিনী প্রেম আছে; মদিরা ও সাকী নিয়াই হাফেজের কবিতা। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও হাফেজের গজল্ আজিও লুপ্ত হয় নাই; কখনও হইবে না। উঁহাদের সহিত চিত্তরঞ্জনের তুলনা করিতেছি না, কিন্তু পদাবলী গজল্ ও চিত্তরঞ্জনের কবিতা যে এক শ্রেণীভুক্ত তাহাই বলিতেছি। একা চিত্তরঞ্জনকে দোষ দিয়া লাভ কি? এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে এক মালঞ্চ ভিন্ন তাঁহার আর কোন কাব্যে এমন একটী ছত্রও নাই যাহা কাহারও আপত্তিজনক হইতে পারে।

সাগর সঙ্গীত

অতঃপর আমরা সাগর সঙ্গীতের আলোচনা করিব। সকলেই জানেন যে কালিদাস সাগরের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

দুরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবনাম্বুরাশি র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥

ইহা যে সাগরের অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা তাহা সমালোচক মাত্রই স্বীকার করিবেন। কিন্তু mystic দিগের নিকট কেহ এরূপ বর্ণনার আশা করিতে পারেন না। কারণ ইহা বাহিরের বর্ণনা; এরূপ বর্ণনায় তাহাদের মন উঠে না। চিত্তরঞ্জনের সাগর সঙ্গীতে সাগরের এইরূপ বর্ণনা নাই। তিনি সাগরের বাহিরের রূপ দেখেন নাই, ভিতরের রূপই দেখিয়াছিলেন। সাগর দেখিয়া ভাবুকের হৃদয়ে যে ভাব তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, সান্ত জীবের হৃদয়ে যে অনন্তের ছায়া সম্পাতিত হয়, সাগর সঙ্গীতে তাহারই নিপুণ বর্ণনা আছে—

তরঙ্গে ২ আজ যেই গীত বাজে,
সোণার স্বপন ঘেরা প্রভাতের মাঝে
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,—
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার!
নিঙারি ও বক্ষ ভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা
হে নায়ক অনন্তের! কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন লোকে? কোন উষা মাঝে?
তাই আমি মেলিয়াছি হৃদয় দুয়ার—
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে
অপূর্ব্ব এ মিলনের গোটা কত গীতে
পরাণে ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে।

আমি বলিয়াছি যে, যে যবনিকা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সতত প্রতিহত হইতেছে mystic এরা তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন, চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,

আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা
ও দেশের কথা, এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরম ব্যথা।

চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন,

এপারে আলোক ভরা ওপারে আঁধার
পার করে দেও মোরে ওগো পারাবার
(আমি) দেখিব ওপারে গিয়া
ভুলিব পরাণ দিয়ে
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার—
এপারের গীতগুলি,
পরাণে লয়েছি তুলি,
মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার—
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন, 'সেদিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায়ে ঢালিয়া পড়িয়াছে! আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে, এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিতে ২ আমার চোখে জল আসিল। মনে ২ নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ; ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলন ভূমি। বুঝিলাম যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত। যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।" সাগর দেখিয়াও কবির মনে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়াছিল। "সাগর সঙ্গীতে" তাহারই ছন্দোময়ী অপূর্ব্ব বর্ণনা।

অন্তর্য্যামী

১৩২৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা প্রতিভায় আমি 'অন্তর্য্যামী' কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলাম। সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরালোচনা করিব না। তবে তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে চাই যে, তখন চিত্তরঞ্জনের সমগ্র কাব্যের আলোচনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। তখন একমাত্র অন্তর্য্যামী কাব্যের ভিতরকার রহস্য ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য সে প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। এই প্রবন্ধে তাহা করিতে হইয়াছে। যেহেতু এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে।

কিশোর কিশোরী

'কিশোর কিশোরী' কাব্য সেই চিরন্তন প্রেম গীতিতেই পরিপূর্ণ। কিন্তু উহার ভাব সম্পূর্ণ নূতন। মাইকেলও ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, আমরা যেন কবিতা রাজ্যের এক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি। এখানেও বলি যে, আমি মাইকেলের সহিত চিত্তরঞ্জনের তুলনা করিতেছি না। কে বড় কে ছোট তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল উভয়ের পার্থক্য-প্রদর্শন করাই আমার অভিপ্রায়। মাইকেল বৈষ্ণব কবিদের বাহ্য অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সেরূপ করেন নাই। যে ভাবসাগরে অবগাহন করিয়া বৈষ্ণব কবিরা অপূর্ব্ব রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনও তাহাতেই অবগাহন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচনা অন্ধ অনুকরণের ফল নহে। উহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তাহার মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। উহা তাহার প্রাণের কথা।

মাইকেল গাহিলেন,

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা রমণ
চল, সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন!
চাতকী আমি সজনি শুনি জলধর ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান যাক্ কুল মনতরী পাবে কুল
চল ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ!

আর চিত্তরঞ্জন গাহিলেন,—

সেই সে প্রথম দেখা সাঁঝের আঁধারে
ধূসর গগন তলে, নব শ্যাম দুর্ব্বাদলে
ক্লান্ত দেহে ছুটে গেছি তোমা দেখিবারে!
* * * *
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে
বর্ণে বর্ণে উজলিলে, গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয় ভাণ্ডারে।
ওগো ফুল! ওগো মিষ্ট, আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট
কার ডাকে ছুটে এনু?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথমবার সাঁঝের আঁধারে!

জীবনে কত নারীই প্রতিদিন দেখিয়াছি। কিন্তু আর কেহ ত আমার জীবন বর্ণে ২ উজ্জল করিল না, গন্ধে ২ ভরিয়া দিল না? আর কাহারও প্রতি ত আমি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইলাম না, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম কেন?

আমি কেন ছুটে এনু? জানি না আপনি
যখন দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি!
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমাতে ছিল—সে যেন জাগিল!

কোন এক অজ্ঞাত কারণে তোমার কাছে গিয়াছিলাম। তোমার দশাও তাহাই—

আমি জানি নাই কিছু, তুমি জান নাই;
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই—
তবে কার ডাকে তুমি চলে এসেছিলে?
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন মহা পরাণের নীরব নির্জ্জনে
কোন মহা পরাণের নীরব গর্জ্জনে
বল কোন কাজে?

এই যে প্রেমের আকর্ষণ ইহা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ভাবুক কবি এই রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, এ প্রেম যেন নূতন নহে, এ যেন অক্ষয়, অবিনশ্বর প্রেম,

সেই যে দরশ তব আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত! সে যে অনন্ত কালের!
যোগভ্রষ্ট যোগমুক্ত যুগ যুগান্তর!
তোমারে দেখিছে শুভে কত শত বার
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশ তলে।

মাইকেলে ইহার আভাষও নাই। কারণ তাঁহার এই আভ্যন্তরিক অনুভূতি হয় নাই। যদি হইত তবে তিনি আর মেঘনাদ বধ কাব্য লিখিতে পারিতেন না। অন্তর নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। 'ছন্দাতীত ছন্দেই' ডুবিয়া রহিতেন।

কিশোর কিশোরী কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই; কবি বুঝাইতে চাহেন যে, প্রদীপ জ্বালিয়া যদি কোন জিনিষের অনুসন্ধান করা যায়, তবে সেই দীপালোকে কেবল যে সেই জিনিষটাই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহটাই আলোকিত হইয়া যায়। সেইরূপ নায়ক যখন নায়িকাকে ভালবাসে তখন সেই ভালবাসা তাহার প্রেমস্পদেই নিবদ্ধ থাকে না, তাহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত প্রেমের আধার, অখণ্ড প্রেমের মূল উৎসের দিকে প্রধাবিত হয়। তখন সে তাহার প্রেমবিলাসের মধ্যে সকল প্রেমের ভোক্তা সকল রসের আস্বাদনকারী, সেই চির সুন্দরেরই চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিতে পায়।

ওরে দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে
হৃদয় কমল মাঝে কি ধুম লেগেছে
কে নেয় রে মধু লুটি,
হেসে হেসে কুটি কুটি
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?

* * *

এ কার নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে?

প্রেমিক তখন তাহার সমস্ত ভোগ, সমস্ত সুখ তাঁহারই পায়ে উৎসর্গ করিয়া আপনাকে তাঁহারই লীলাবিলাসের যন্ত্ররূপে পরিণত করেন। এইরূপে প্রেমিকেরা পার্থিব প্রেমের মধ্য দিয়াই ভূমানন্দের স্বাদ পাইয়া থাকেন।

চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তা—উহার বৈশিষ্ট্য

তাঁহার কাব্যের সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। আমি বলিয়াছি যে, তাঁহার কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁহার জাতীয়তা সম্বন্ধে কিছু না বলিলে তাহার কাব্যের স্বরূপ সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাহার কাব্য ভাবুক সাহিত্যের অন্তর্গত, এ কথা বলিলেই উহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইল না। সঙ্গে ২ ইহাও বলা আবশ্যক যে উহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীপ্রভাবপরিবর্জ্জিত। তাহার ভাষায় যে বিদেশী প্রভাবের লেশ মাত্র নাই তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ভাবও সেইপ্রকার সম্পূর্ণরূপে

বিদেশী প্রভাব হইতে পরিমুক্ত। তাহার কারণ বুঝিতে হইলে তাঁহার জাতীয়তার স্বরূপ বুঝিতে হয়। তিনি একজন দেশহিতৈষী রাজনৈতিক নায়ক ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহার জাতীয়তার একটু বিশেষত্ব আছে; তাহাও বিবৃত করা আবশ্যক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামঞ্জস্য বিধান সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হয়।

তিনি বলিয়াছেন, "আমি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, 'পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে। আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া যাইয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার সম্মিলনেই জগতের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে?'

"আমি স্বীকার করি, ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচাইতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে, আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাসগৃহ থাকা প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।" (নারায়ণ ১৩২৮।২৮২ পৃঃ)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামঞ্জস্য করার কথাটা শুনিতে খুব ভাল শুনায়। কিন্তু প্রবল ও দুর্ব্বলের সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টার ফলে অনেক সময়ে দুর্ব্বলের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। প্রবল দুর্ব্বলকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসে। এইজন্য ঘোরতর বন্যায় যখন দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, এবং সেই জলস্রোতে যখন এক মৃৎপাত্র ও এক কাংস্যপাত্র তীব্রবেগে অকূল সাগরাভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছিল তখন মৃৎপাত্র কাংস্য পাত্রের সহিত গলাগলি করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। কারণ কাংস্যপাত্রের সহিত ঘেষাঘেষিতে মৃৎপাত্রেরই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অতল জলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে যে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করা আবশ্যক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর চিত্তরঞ্জন যে সে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বতোভাবে খাঁটি স্বদেশী ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক বিলাত না যাইয়াও ভিতরে ২ সাহেব। আর চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়াও ভিতরে ২ হিন্দু ছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি সমাজ ছাড়িয়াছিলেন। তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে তিনি প্রচলিত হিন্দু সমাজের সকল আচার মানেন নাই। তথাপি তিনি যে বিশেষভাবে হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার দানপত্রে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উল্লেখই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকাল দেশের অনেকেই ন্যাসনালিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে বিলাতের একটী নিকৃষ্ট সংস্করণে পরিণত করাই তাঁহাদের অধিকাংশের আদর্শ। চিত্তরঞ্জন সে-জাতীয় ন্যাসনালিষ্ট ছিলেন না। তাহার আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা, ভারতীয় সাধনা ও অবদান অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। উপরে তাঁহার রচনা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে ইহাই উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি কেবল মুখেই ইহার প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—জীবনেও এই আদর্শের অক্ষরে ২ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইজন্য কাব্য রচনায়ও তিনি পরমুখপ্রেক্ষী হন নাই। তাহার কাব্যে বিদেশী প্রভাবের গন্ধমাত্র নাই। বিদেশী প্রভাবকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন না। আধুনিক গীতি কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এইরূপ,—

"এই শতবর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গীতি কবিতার বিরাট আয়োজন, ইহা আমাদের কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই। কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

"পিতলকি কাটারি কামে নাহি আওল
উপরকি ঝিকিমিকি সার।"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতি নয়—মাথার বোঝা; ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা আহরণ করা; ইংরাজী সাহিত্য ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা; হয়ত বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁচে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই,—আছে শুধু অনুকরণ! অনুকরণে কখনও জীবন আসে না; ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জ্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন; একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।" (নারায়ণ ১৩২৪।৩৯৯ পৃঃ)

উপসংহার

কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কাব্যের সহিত বাঙ্গালার প্রাণের যোগ নাই, একথা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলে উহা পরিপুষ্ট। বাঙ্গালার প্রাচীন ভাবধারায় উহা রঞ্জিত ও অভিষিক্ত। তিনি নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে শুনাইতে চাই। যে প্রদীপ আমার প্রাণে জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গালার ঘরেং জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গালা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে। আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আসন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।" (নারায়ণ ১৩২৪। ৩৮৭ পৃঃ)

ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি যে সর্ব্বতোভাবে এবং সযত্নে, এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া কে তাহা অস্বীকার করিবে? তিনি কেবল খেয়ালের বশে কোন কাব্য লিখেন নাই। ভাবুকদিগের কবিতা কেবল ললিতকলার অনুশীলন নহে। প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহিত উহার ঘনিষ্ট সংযোগ আছে। উহা তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ। চিত্তরঞ্জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কীর্ত্তন শুনিতে ২ তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার কাব্য তাঁহার সাধনারই বহির্বিকাশ মাত্র। এই জন্যই উহা সার্থক হইয়াছে। তাই আমরা বলি, ধন্য চিত্তরঞ্জন! ধন্য তোমার সাহিত্য সাধনা! *

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক আহুত ১৩৩২ সনের ১৪ই আষাঢ় তারিখের শোকসভায় পঠিত।

অন্তর্য্যামী

(সমালোচনা)

"মালঞ্চ" "সাগর সঙ্গীত" প্রভৃতির কীর্ত্তিমান্ কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, বার্,এট্ ল, মহাশয়ের রচিত অভিনবকাব্যগ্রন্থ। আমরা যতদূর জানি, এই গ্রন্থের কতকাংশ সুপ্রসিদ্ধ 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহা আমাদের স্মরণ নাই। যাহা হউক, অন্তর্য্যামী এক্ষণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যখন 'নারায়ণে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল তখনই আমরা ইহার একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার ভাষার প্রবাহ বড়ই সরল ও স্বচ্ছ। কুত্রাপি একটি কঠিন পদের প্রয়োগ বা অযথা বাগাড়ম্বরের প্রয়াস নাই। লেখায় সর্ব্বত্রই একটা সংযমের চিহ্ন পরিস্ফুট; অথচ রচনা মধুর ও শ্রুতিসুখকর। অন্তর্য্যামীর কবি ভাষা লইয়া খেলা করিতে চেষ্টা করেন নাই; একটা নূতন কিছু করিবার অনুরোধে আজকালকার লেখকগণ যেমন ভাষাকে মোচ্ড়াইয়া পাকাইয়া উহাকে একেবারে বিকৃত করিয়া তোলেন, এই কবি সেরূপ করেন নাই। তিনি সরল ভাষায় প্রাণের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন

উহা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এইজন্য এই কাব্য সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু এই গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা পূর্ব্বে ধরিতে পারি নাই। সমগ্র গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহার মূলতত্ত্ব ধরা পড়ে।

কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় কিছুই অস্পষ্ট নহে;-একজন বিরহী তাহার বঁধুর জন্য কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়া দূরে একটী মন্দির দেখিতে পাইয়াছে, এবং কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া পথ বাহির করিয়া সেই মন্দিরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। বর্ণিত বিষয় ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কবি ইহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

এই কাব্যকে একটা সাধনার ইতিহাস বা তাহার প্রথম পরিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিরহী এখানে সাধক বা জীবাত্মা। যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী, তিনি সাধকের বা জীবাত্মার নিকটেই আছেন, অথচ যেন তিনি অতিদূরে! জীব তাহাকে দেখে না, কিন্তু প্রতি কার্য্যে প্রতি চিন্তায় তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করে;—

সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে!
সকল গগন মাঝে
তুমি উঠ হেসে!
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি!
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি!
ওগো তুমি মালাকার
মন-মালিকার।
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার!

এইরূপে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও জীব তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠে।

কোথা তুমি কোথা তুমি এ যে অন্ধকার সব?

কিন্তু তথাপি তিনি যে আছেন, এবং অতি নিকটেই আছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে—

* * * *
কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে!
কে যেন জ্বালিছে আলো নিশীথ আঁধারে!
* * * *
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি।

তাঁহাকে না পাইয়া অস্থির হইয়া সাধক তখন বলে,—

দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝেমাঝে ডেক!

এইরূপ ব্যাকুলতা লইয়া সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সহজ নহে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য-দিয়া সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। কবি তাঁহার অপূর্ব্ব-বর্ণতুলিকায় এই সব অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সেদিন হইতে বঁধু!—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে।
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা ত মনে নাই!

জীবাত্মার যখন প্রথম জন্ম হইল, তখন অবধিই সে পরমাত্মার দিকে ছুটিয়াছে। সকল কার্য্যে, সকল ভাবে, সে কেবল তাহাকেই চাহিয়াছে। শৈশবের খেলায়, যৌবনের প্রমোদে, সুখে দুঃখে, সর্ব্বদাই এবং সকলের মধ্যেই সে তাহার অন্তর্য্যামীকে খুঁজিয়াছে।

প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল সনে আপনা বিকাই!
* * * *
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই!
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু;

এটী খাঁটি হিন্দুর ভাব। হিন্দুরা ধর্ম্মকে জীবনের অন্যান্য কাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। ইউরোপীয়েরা তাহা করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারিক কার্য্য ও ধর্ম্মের মধ্যে একটা অনাবশ্যক ও কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং তাহার এক বিভাগে ধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম-সাধনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইতে শয়ন পর্য্যন্ত, যাহা কিছু করা হয়, তাহা সমস্তই ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে প্রাচীন হিন্দুগণ উপদেশ দিয়াছেন। ভোগেও ধর্ম্ম সাধন করা যায়; সুতরাং আমোদে প্রমোদে, সুখে দুঃখে, এক কথায়, সংসারের সমস্ত কার্য্যেই তাহাকে খোঁজা যায় ও পাওয়া যায়। এই তত্ত্বটী কবি এইখানে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ভোগের একটু বিশেষত্ব আছে। ভোগের মধ্যেও তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং তাঁহাতেই আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। তাই কবি বলিয়াছেন—

বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমাকেই চাই!
যে পথেই লয়ে যাও, সে পথেই যাই!

কিন্তু সাধনার পথ যে একেবারেই ক্লেশকর নহে এরূপ নহে। যাঁহাকে পাইতে চাই, তাঁহাকে যদি না পাই, তবেই ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং নৈরাশ্য আসে। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধকের মাঝে মাঝে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, এবং সাধক সময়ে সময়ে অভিমান করিয়া থাকে।—

তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি!
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি।
ছেড়ে দাও ত চলে যাই, তুমি থাক পিছে!
দরশ যদি নাহি দিলে, সোহাগ করা মিছে!

কিন্তু প্রকৃত সাধকের এই অভিমান ক্ষণস্থায়ী হয়; পরক্ষণেই অনুতাপের উদয় হয়।

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান।

এই অনুতাপ কবি এরূপ কাতরতা-পূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। যে এ বেদনা অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়:—

আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব।
কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণ কেমন করে, পরাণি তা জানে,
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে।

তারপর পুনরায় সেই নির্ভরশীলতা এবং সেই আত্ম-সমর্পণ; কিন্তু এবার উহা আরও মধুর এবং আরও গভীর:—

এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর?)
মরম আঁধারে বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে বাজাও বাজাও;
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব!
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

শেষ ছত্র দুটী কেমন সরল অথচ কেমন গভীর ভাব-দ্যোতক!

এই কাতর আগ্রহ ও সরল আত্ম-সমর্পণের ফলে সাধক আরও কিছু অগ্রসর হইলেন; ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার কিয়ৎ পরিমানে বিদূরিত হইল, সাধক দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেন কিন্তু সে দৃষ্টি একখনও কতক তমসাচ্ছন্ন—

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে।
ওগো ছায়ারূপী! কোন ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদি-তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে?

দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছে না—

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণখানি !
এই প্রাণ প্রান্ত হতে কতদূর জানি !
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই !
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই !

এই অস্পষ্ট আলোকে সাধকের নিকট তাহার সাধনার লক্ষ্য প্রথম প্রতিভাত হইল, এই ছায়ালোকে তিনি এক মন্দিরে দেখিতে পাইলেন। এই মন্দিরের বর্ণনাও মধুর ও ভাব গম্ভীর। পার্থিব কোন জিনিষের সহিত উহার সাদৃশ্য নাই, কারণ ইহা অপার্থিব। পরস্পর-বিরোধী অনেক লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান। অথবা, ইহা কেবলমাত্র অনুভূতির জিনিষ, ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা কঠিন ; ভাষায় ইহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না ; সে চেষ্টা করিলে ইহার অনেক লক্ষণ পরস্পর-বিরোধী ও ধারণার অতীত বলিয়া মনে হইবে।

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !
অপূর্ব্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা

... ...

নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া।—

... ...

নাহি চন্দ্র ! নাহি সূর্য্য ! কি যে স্বপ্ন ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন !

... ...

বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দে গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

এই লক্ষ্য দেখিয়া সাধক উন্মত্ত হইলেন। ইহাকেই সাধনার চরম লক্ষ্য ভাবিয়া সাধক ইহা পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কোন পথে এই মন্দিরে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা বাহির করিবার জন্য সাধক আকুল হইলেন। চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দৃঢ়তা না থাকিলে এই পথ পাওয়া ভার। সাধকের এই অবস্থা,—পথ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মনোহর ভাষায় কবি বর্ণনা করিয়াছেন :

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর !
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !

... ...

পথখানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক, যাব আমি যাব !

তারপর—

এদিকে ওদিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে !

... ...

নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কতদূর জানি
এই প্রাণ প্রান্তহ'তে সেই পথখানি

... ...

মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই !—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই

সাধক সব ভুলিয়া এক পথের জন্যই পাগল হইয়াছেন—

সব আশা ঘুচে গেছে ! একটী আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায় !
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার !

তার পর কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও মর্ম্মস্পর্শী—

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি।

... ...

সে পথের পথিকের পদতলে বাজি
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি

... ...

একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তা'র প'রে উঠিতাম মন্দির সোপানে।

ইহা প্রকৃতই বৈষ্ণবীয় বিনয়। সাধুজনের চরণের ধূলি হইয়া দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করা, কত বড় বিনয় এবং কত বড় ভক্তির কথা। বাস্তবিক এই কবি প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-

দিগের বংশধর। ইহার কবিতা অনেক স্থলেই চৈতন্যযুগের সেই ভক্ত কবিদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইরূপ ব্যাকুল দীনতা ও গভীর ভক্তি ব্যর্থ হইতে পারে না। সাধক অবিলম্বেই প্রার্থিত পথের সন্ধান পাইলেন—

একি ? একি ? ওই বুঝি সেই পথ তুমি !
মনমাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি !

পথের সন্ধান পাইয়া সাধকের কতই বা আনন্দ—

সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায় !
সব দুঃখ গীত হ'য়ে পরাণে মিলায় !

কিন্তু সাধনার পথ বড়ই বিপদ সংকুল। পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। সাধক পথের সন্ধান পাইয়া বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছেন—

বাজা রে বাজা রে তবে ! বাজা জয়ডঙ্কা
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা !

এই উল্লাসের আতিশয্য স্বল্পাক্ষরে অথচ অতি সুন্দরভাবে কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

সুখের মত দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ।
কোন গানের গরবে ওগো ভরিয়াছে বুক ?

এই বিজয়োল্লাসে অহঙ্কার না আসিয়া পারে না—

পায়ের তলে বাজে পথ ! প্রাণ আজিকে রাজা।
বাজা রে বাজা রে তবে, জয়ডঙ্কা বাজা !

এই গর্ব্বই সর্ব্বনাশের মূল। ইহাতে চিত্ত বিভ্রান্ত না হইয়া পারে না। সাধকেরও তাহাই হইল। সাধক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—

হাল হারাণ তরীর মত ভাস্‌ছি অবিরত !

তারপর পুনরায় সেই করুণ ক্রন্দন, সেই ব্যাকুল প্রার্থনা—

তোমার আছে অনেক গান, একটী গান গাও !
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও !

সাধক পরিশেষে সেই সাধনমন্ত্র পুনরায় লাভ করিয়া মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাধনার পথ যে কণ্টকময় এবং প্রথম প্রথম সাধক যে তপঃক্লেশে পীড়িত হইয়া পড়ে, কবি তাহা এই স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্বালা প্রকৃত সাধকের ভক্তির তীব্রতা বাড়াইয়া দেয়। কবির এই বর্ণনাও বড়ই হৃদয়গ্রাহী—

তোমার পথে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
আপন হাতে যাহা দেও, তার ভাগ্য মানি !
একটুখানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন !

কিন্তু সাধনার পথ যে কেবল ক্লেশময় তাহা নহে, উহা বিস্ময়ও বটে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সাধক যখন সিদ্ধিলাভের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে ভয়প্রদর্শন করে এবং সাধনার পথ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করে।

কবি দেখাইয়াছেন যে, ইহা শুধু গল্প নয়। মানুষকে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্ম-ফলের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায় নাই, অথচ তাহার নাশ না হইলে সিদ্ধিলাভও অসম্ভব। সেই জন্য সিদ্ধিলাভের প্রাক্‌কালে এইগুলি সাধকের পীড়া জন্মায়—

সেদিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হ'লে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজার করি সকলি ঢালিনু।
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে।
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা !
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা !
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে।

এই ভয়ে বিচলিত হইলে সাধকের বিপদ। তখন সেই ভক্ত-ভয়-হারীর শরণ ভিন্ন গতি নাই।

এস আমার আঁধার হেরা ! এস ভয়হারী !
এস এস হৃদ্-মাঝারে, হৃদয়-বিহারী !

এই শেষ প্রার্থনাটিও বড় হৃদয়স্পর্শী। ইহার পরই কবি গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। সাধক মন্দিরে পৌঁছিতে পারিল কি না এবং মন্দিরে পৌঁছিয়া শান্তিলাভ করিতে

সমর্থ হইল কি না, কবি তাহা কাগে বর্ণনা করেন নাই। এই জন্যই আমরা এই কাব্যকে সাধনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। এইরূপ কাব্য আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি। আজকালকার কাব্যে কেবল ভাষার কারিকুরী। এমন ভাষায় কাব্য লিখা হয়, এবং এমন ছন্দে তাহা রচিত হয় যে, কাব্য বোঝা ত দূরের কথা, পাঠ করাই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। আবার, উপলব্ধি বা অনুভূতি ভিন্ন কাব্য হয় না। যাহা ব্যক্ত করিতে চাই, তাহা প্রাণে অনুভব করা চাই ;—তবেই কাব্য-রচনা সার্থক হইতে পারে। কিন্তু প্রাণে কিছু অনুভব না করিয়া কেবল বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কবিতা খাড়া করিলে তাহা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। উহা একরূপ মানসিক ব্যায়াম মাত্র। এই জন্য আধুনিক কবিতা পাঠ করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয় যে, এই কাব্য সেই জাতীয় নহে। ইহার প্রত্যেক কথা কবিহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ কাব্য পাঠে হৃদয় সরস ও স্নিগ্ধ হয়। ভাষা-জননীর কণ্ঠ এক অপূর্ব্ব মাল্য দামে ভূষিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা এই কবিকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি।*

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কতিপয় সভ্যের অনুরোধে, ১৩২৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা প্রতিভা হইতে এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রঃ সঃ

ভাবুক চিত্তরঞ্জন

বাংলার দধিচী তিল তিল করিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিয়া শেষ আহুতি দিলেন যা' ছিল তাঁহার শেষ পার্থিব সম্বল —কর্ম্ম ক্লান্ত, রোগ-ক্লিন্ন দেহ খানি। বাংলার বুক ভাঙ্গা কান্নায় আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেই কাঁদিতেছে। অন্যে দূরের কথা, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যাহারা তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া লড়াই করিয়াছেন, তাঁহারাও চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে কাঁদিতেছেন। এ দৃশ্য জগতে বিরল—কারণ চিত্তরঞ্জনও জগতে বিরল। বাঁচিয়া লড়াই করে, মরিয়া কাঁদায়—এ দৃশ্য আর কোথায় মিলিবে! কি গুণ ছিল চিত্তরঞ্জনের যে তাঁহার তিরোধানে দেশময় এই করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! কাঁদিতেছে সকলেই, কারণ এ যুগে এমন করিয়া আপনাকে নিঃশেষ আহুতি দিতে পারিয়াছেন কেবল চিত্তরঞ্জন। সে যুগের ফলমূলাশী নিঃস্ব ঋষি দধিচী তপশ্চর্য্যায় দেহত্যাগ করিয়া আপন অস্থি দিয়াছিলেন দেবতার কল্যাণে, আর এ যুগের সংসারী, ভোগী, বিলাসী চিত্তরঞ্জন ত্যাগের সাধনায়, বিপুল বিত্ত পায় ঠেলিয়া ফকির সাজিলেন দেশের জন্য—আর বিশ্বজিৎ যজ্ঞে শেষ আহুতি দিলেন আপন দেহখানি।

এই ক'দিন চিত্তরঞ্জনের জীবন যজ্ঞের কত কথা কত রকমে বলা হইয়াছে—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকও তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া কত ত্যাগ, কত দানশীলতার কথায় অধ্যায়ের পর অধ্যায় ভরিয়া দিবে। সাহিত্য পরিষদের এই সভায় আমি তাঁহার জীবনের একটা মাত্র কথা বলিতে চাই। সে কথার সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক আছে এবং সেই কথাটাই তাঁহার জীবনের বড় কথা এবং একমাত্র কথা। সেই কথাটী বুঝিতে পারিলেই তাঁহার জীবনের সকল কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে—কারণ সেইটাই তাঁহার স্বরূপ কথা। জীবনে চিত্তরঞ্জন যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার পিছনে ছিল মস্ত বড় একটা ভাবুকতা। চিত্তরঞ্জনের সমগ্র

জীবনের ইতিহাস এক কথায় কার্য্যকরী ভাবুকতার ইতিহাস। মানুষের জীবনে Logic যেখানে হার মানিয়া যায়, চিত্তরঞ্জনের জীবনে সহজ ভাবুকতা সেখানে Magic এর মত কাজ করিয়াছে। সে দিন চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কে একজন লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের সকল রহস্য একটা কথায় প্রকাশ করা যায় "Reckless abandon." "Reckless abandon" ত বটেই; দুনিয়ার সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া, সমস্ত ভ্রূকুটী অগ্রাহ্য করিয়া, সকল কষ্টে এমন আপনা ভোলা হইয়া আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জনই। সকল ডাকে চিত্তরঞ্জন সাড়া দিতেন, সকল কর্ম্মে আপনাকে বিলাইয়া দিতেন, খেয়াল বা হুজুগের বশে নয়—ভাবুকতার প্রেরণায়।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত চিত্তরঞ্জন সারা জীবন এই ভাবুকতার আগুণ অন্তরে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনে এই ভাবুকতার অভিব্যক্তির একটা ধারা আছে। ত্রিশ বৎসরের তরুণ কবি চিত্তরঞ্জন যখন "মালঞ্চ" লিখেন তখনই বাহিরের জগৎ তাহার অন্তরের কথার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিল। সে দিন Mr. B. C. Chatterji চিত্তরঞ্জনের কবি প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে "মালঞ্চে" Agnosticism বা সন্দেহবাদের একটা সুর আছে। খুব সত্য কথা। "মালঞ্চেই" চিত্তরঞ্জনের জীবনের 'Logic ও Magic', বিচারবুদ্ধি ও ভাবুকতার লড়াই সুরু হইয়াছে। Mystic বা ভাবুকের অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তরুণ কবি সুন্দরের সন্ধানে ছুটিতেই বিচার বুদ্ধি আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচার বুদ্ধি যেখানে প্রবল, সুন্দর সেখানে আপনাকে ধরা দেয় না। তাই মালঞ্চে একটা সংশয়ের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই "মালঞ্চের" কবিই হইলেন শেষে "সাগর সঙ্গীতের" কবি। সাগর সঙ্গীতে কবির অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে—সুন্দরের ধ্যানে কবি বিভোর হইয়াছেন। ভাবুকের কান দিয়া সাগরের গর্জ্জনে কবি শুনিলেন সুন্দরের সঙ্গীত। ভাবুকের দৃষ্টি দিয়া সাগরের লহরীতে দেখিলেন লীলাময়ের লীলানর্ত্তন—আর "বুকের মাঝে" দেখিলেন "বরণ করা বনমালী"। "নারায়ণে" এই বরণ করা বনমালীকে লক্ষ্য করিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন "সকল ভোগের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমিই কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা হে অনন্ত রূপী নারায়ণ। তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি, ইতিহাস শুধু তোমারই লীলা কাহিনী। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!" "নারায়ণে" এই নব-বৈষ্ণব ভাবুকতায় (Neo-vaishnavic mysticism) "মালঞ্চের" সংশয় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। "সাহিত্যে রূপান্তর" সার্থক হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের ভাবুকতার সন্ধান আমরা পাইলাম। কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুধু ভাবুক ছিলেন না; লীলার ধ্যানেই শুধু বিভোর ছিলেন না; চিত্তরঞ্জন ছিলেন মহাকর্ম্মী, লীলার সহায়ক। কবি চিত্তরঞ্জন ভাবুকের দৃষ্টিতে যে সুন্দরের সন্ধান পাইলেন, কর্ম্মী চিত্তরঞ্জন, বাস্তব জগতে সেই সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় আপনাকে বিসর্জ্জন দিলেন। বাস্তব জগতে যাহা কিছু অসুন্দর চিত্তরঞ্জনের সুন্দর-পিয়াসী হৃদয় তাহাতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—তাই চিত্তরঞ্জন সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনার রূপটা চিত্তরঞ্জন আদৌ সহিতে পারিতেন না, তাই জনসেবায় অকাতরে অর্থ বিলাইয়াছেন, তাই অসুন্দরের ধ্বংশকল্পে যোদ্ধা চিত্তরঞ্জন ধ্বংশের বিষাণও বাজাইয়াছেন।

দেশবাসীর দুঃখ লাঞ্ছনা দেখিয়া দেখিয়া চিত্তরঞ্জনের ভাবুক হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। আর সহিতে না পারিয়া পাগল চিত্তরঞ্জন যে দিন সমস্ত বিত্ত পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া ধ্বংশের বিষাণ বাজাইয়া দেশ বাসীকে আহ্বান করিলেন, সেই দিনই চিত্তরঞ্জনের জীবনে সুন্দরের সাধনার প্রকৃত আরম্ভ হইল। সেই দিনই অ-সুন্দরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরব্ধ হইল এবং এই সংগ্রামে দেহ পাত করিয়াই চিত্তরঞ্জন সুন্দরের সাধনা সার্থক করিলেন।

সাহিত্য পরিষদের আক্ষেপ থাকিতে পারে যে, সুন্দরের সাধক চিত্তরঞ্জন কাব্য ভাণ্ডারে আরও কত কিছু দান করিলেন না ; রাষ্ট্র নীতির মোহে পরিয়া বুঝি কবি চিত্তরঞ্জন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। কবি কিন্তু আপনাকে মোটেই হারান নাই। কবির ভাবুকতা শুধু ছন্দে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া কর্ম্মে প্রকাশ করিল। চিত্তরঞ্জনের সমস্ত জীবনই তাই একটা মহাকাব্য—an epic of emotional abandon. এই মহাকাব্যকে অবলম্বন করিয়া দেশের সাহিত্য নূতন করিয়া গাড়িয়া উঠুক—সাহিত্য পরিষদের আক্ষেপ করিবার কিছুই কারণ থাকিবে না। *

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপনের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার!
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর?"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোচনীয় মৃত্যুতে বংলা আজ সত্যই শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আজ ভগ্ন হৃদয়ে কিরূপে আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিব! আমাদের নায়ক, আমাদের আদর্শ পুরুষ চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়া আমরা আজ সত্য সত্যই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি। ত্যাগের উজ্জল আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ; যে বাঙ্গালীর চোখে শত শতাব্দীর ঘুম জড়াইয়া আছে, হতচেতন যে বাঙ্গালী কিছুতেই জগতের সকলের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না ; সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও যে শৌর্য্য, বীর্য্য, মনুষ্যত্বও দৃঢ়তা আছে তাহা তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। "মন্ত্রং বা সাধয়ামি, শরীরং বা পাতয়ামি" তাঁহার মন্ত্র ছিল। তিনি জানিতেন,—

"পথখান যেথা থাক, পাব আমি পাব!
যেমন করেই হোক, যাব আমি যাব!"

বাংলা দেশের অদৃষ্ট চিরকালই মন্দ। "ঘন ঘোর মেঘে ঘেরা" ইহার আকাশে কয়েকটী উজ্জল তারা ফুটিয়াছিল, কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই একে একে তাহার তিনটি অন্তর্হিত হইল। ত্যাগী কর্ম্মী অশ্বিনীকুমার ও পুরুষপ্রবর আশুতোষ, এই দুই মহাপুরুষের বিয়োগ জনিত আঘাতের বেদনা প্রশমিত হইতে না হইতেই সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত আমাদের চিত্তরঞ্জন তাহার দেশবাসীকে প্রগাঢ় তিমিরে ডুবাইয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের এই শোক স্মৃতি ভুলিবার উপায় কোথায়?

দেশের প্রতি চিত্তরঞ্জনের জলন্ত অনুরাগের কথা কে না জানেন? বাঙ্গালার নেতাদিগের মধ্যে কেহ যদি দেশকে সত্য সত্য ভালবাসিয়া থাকেন, তবে চিত্তরঞ্জনই বাসিয়াছিলেন। তিনি কবির ভাষায় বলিতে পরিতেন

"India, with all thy faults, I love
thee still, my country!"

দেশকে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার আকর্ষণী শক্তি আরও বেশী হইত। তেজদীপ্ত, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি যখন আপনার প্রাণের ফোয়ারা খুলিয়া দিতেন, তখন তাঁহার অগ্নিময়ী ভাষায় সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং বলিয়াছেন, "চিত্তরঞ্জনের মত দৃঢ় তেজপূর্ণ ভাবে কথা বলিতে আমি কাহাকেও শুনি নাই।"

চিত্তরঞ্জন ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। মানুষ যত সম্পদের আশা করিতে পারে তাহা সমস্তই তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে করিতে পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে২ দানও অজস্র করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব্ব ভাবের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্তরঞ্জন চারিদিকের

* ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক আহূত শোক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তাঁহার জীবনে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন তাঁহার স্বরচিত "সাগরসঙ্গীতের" এই গীতিটী তাঁহার বাস্তব জীবনে অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিল।

"আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ?
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে ?
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !"

তখন কোথায় রহিল ধন, কোথায় রহিল বৈভব ! এ যেন দ্বিতীয় বার জগতের মুক্তির জন্য সিদ্ধার্থ পদ প্রতিপত্তি ধনসম্পদ সমস্ত ত্যাগ করিলেন। শাস্তি নয়, পুরস্কার স্বরূপ ভিখারীর চীরবাস রাজাধিরাজের ন্যায় ধনীর অঙ্গে কে তুলিয়া দিল ! হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার Mr. C. R Das দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনরূপে জগতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী।

তাহার পর তিনি রাষ্ট্র সেবার জীবন উৎসর্গ করেন। উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি স্বরাজের পথে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা কে তাঁহাকে বাধা দিল, কে ডাকিয়া কহিল,

"রাখ, রাখ রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
* * * *
রাখ রথ, শান্ত হও।"

সেই নিষ্ঠুর আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। যে দিন তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় জয়লাভ হইল সেই দিনই তিনি চলিয়া গেলেন। ১৭ই জুন মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে সংবাদ আসিল, দ্বৈতশাসন দুই বৎসরের নিমিত্ত স্থগিত রহিল— মৃত্যুপথযাত্রী চিত্তরঞ্জন তাঁহার শেষ জয়বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। সন্ধ্যাবেলা সব শেষ হইয়া গেল !

দেশবন্ধু চলিয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি ত্যাগ, সাহস ও কর্ম্মকুশলতায় উজ্জ্বল আদর্শ তাহার দেশবাসীর সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা সকলে তাঁহার বাণী সার্থক করিতে পারি। দেশবন্ধু একা ছিলেন, হাজার হইবেন। তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার তেজ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। তাঁহার দৃষ্টান্ত যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন

[১৪ই আষাঢ়, ১৩৩২]

শোকসভা

কার্য্য বিবরণী

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং পৃষ্ঠপোষক **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের** পরলোক গমনে গভীর শোকপ্রকাশার্থ বিগত ১৪ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে, ঢাকা বার এসোসিয়েসন হলে, পরিষদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় পরিষদের সভ্যগণ এবং সহরের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় বি,এল,মুন্সেফ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অপর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত কালীপদ সরকার এম্,এ, অস্থায়ী বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর মহাশয়ের সমর্থনে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত রমনীকান্ত দাস, বার-এট-ল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ঢাকা ইডেন কলেজের সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় মহাশয় তাঁহার স্বভাব সুলভ কোমল কণ্ঠে নিম্নলিখিত সময়োপযোগী সঙ্গীতটী গান করেন। উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গায়কের এই গান শুনিয়াছিলেন।

রচয়িতা—শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ এম্ এ।
সুর—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

দিকে দিকে আজি একি হাহাকার
নয়নে নয়নে উছলে ধারা,
হারায়ে গিয়াছে কাঙালের মণি,
অন্ধের নব আঁখির তারা।

না ফুরাতে দিবা গগনের পারে
ডুবিল কি রবি সাঁঝের আঁধারে?
আসিছে নামিয়া ঘন অমারাতি,
পথিক কাঁদিছে বিজনে হারা।

আরতির বেলা যায় বহে যায়
কুসুমের সাজি শুকালো যে হায়,
পূজা-মন্দিরে পূজারী কোথায়,
ভকত সকলে ডাকিয়া সারা!

দেশ-জননীর স্নেহের অমিয়া
পাসরিলে আজি কোন্ সুধাপিয়া?
এলায়ে পড়িলে কার স্নেহকোলে
খেলায় শ্রান্ত শিশুর পারা!

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটী অতি সুন্দর ও নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—"অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য যে কি তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে, সুধু বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটা কান্নার রোল উঠিয়াছে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বহু সভা সম্মিতি হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ঐ সব সভায় তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্ম-জীবনের এবং তাঁহার অসাধারণ ত্যাগের কথাই বেশী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু দেশবন্ধুর জীবনের যে আর একটী দিক আছে—তাঁহার সাহিত্য সাধনার দিক—তাহার প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি তেমন পড়িতেছে না। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতি সভায় তাহার বড় একটা আলোচনা হইত না; আলোচনা হইত তাঁহার অপরিসীম দানশীলতার কথা। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক জীবন কতকটা চাপা পরিয়াছে সত্য; কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রেও চিত্তরঞ্জনের স্থান ছিল অতি উচ্চে। আজ সাহিত্য পরিষদের এই সভায় দেশবন্ধুর শুধু সাহিত্যিক জীবনের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।" চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় অতি সংক্ষেপে চিত্তরঞ্জনের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেন। তৎপর তিনি বলেন যে, দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সাহিত্য সেবাতেও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দুঃস্থ সাহিত্য সেবীর সাহায্য কল্পে চিত্তরঞ্জন অনেক সময়ে অযাচিত ভাবে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বহু সাহিত্যসেবীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন। বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ অনেক আছে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি স্বর্গগত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রের ঋণ পরিশোধের কথা এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি ৺ গোবিন্দ দাসকে অর্থ সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদকে তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বজাতি প্রেম ও সাহিত্যপ্রীতির জন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে চিত্তরঞ্জন স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেও অবসর সময়ে তিনি 'প্রদীপ' 'নির্ম্মাল্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। বহু গীতিমাল্য রচনা করিয়া তিনি বাণীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন। তাঁহার "সাগরসঙ্গীত" বাঙ্গলা সাহিত্যে অমূল্য দান—এই কবিতায় চিত্তরঞ্জনের গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার "মালঞ্চ", "মালা", "অন্তর্য্যামী", "কিশোর কিশোরী"—বাঙ্গলা পদ্যসাহিত্যের অতুল সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯১৫ খৃঃ চিত্তরঞ্জন "নারায়ণ" নামক এক নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন এবং প্রায় ৮ বৎসর

কাল অতি দক্ষতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজও তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুন্ঠিত হন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে কয়েকবার তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ এই ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ বার মুনসীগঞ্জের ষোড়শ অধিবেশনেও তাঁহাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হইয়াছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, ডেপুটী কালেক্টর মহাশয় তদ্রচিত "স্মৃতি-তর্পণ" এবং শ্রীযুত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এল্ উকিল মহাশয় তদ্রচিত "চিত্তরঞ্জন-তর্পণ" নামক হৃদয়গ্রাহী কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ তদীয় "চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সাহিত্য সাধনা" নামক প্রবন্ধ এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল মহাশয় তদীয় "সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন" নামক সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর অন্যতম সহকারী সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সভা সমক্ষে উপস্থিত করেন এবং তৎসম্পর্কে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

প্রস্তাব—"ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও পৃষ্ঠ-পোষক, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ ও ভক্ত সাধক, জন নায়ক, কর্ম্মবীর, দানবীর ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং দাস মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি-এল মহাশয় এবং শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ মহাশয় সমর্থন করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে উভয়েই সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন।

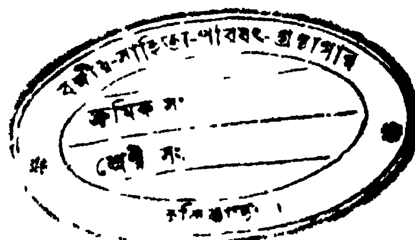
তৎপর সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সভা সমক্ষে উপস্থিত করিলে সভাস্থ সমস্ত সভ্যবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শ্রদ্ধাসহকারে নীরবে উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন, যে উক্ত প্রস্তাব দেশবন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত হউক। ঐ প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ গুহ, এডিসনাল জজ, মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

এই সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীবা সাধারণতঃ কোন সভা সমিতিতে যোগদান করেন না, তাঁহারা যে শুধু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন নয়, তাঁহারা সভার কার্য্যেও যোগদান করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিতে থাকিলেও কেহ কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। সকলের মুখেই যেন একটা বিষাদ ছায়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সকলেই নিস্তব্ধে মৃতমহাত্মার গুণকাহিনী শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যাদি শেষ হইলে সকলেই নিঃশব্দে শান্তভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, সম্পাদক।



প্রতিভা

১৫শ বর্ষ　　শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২　　২য় সংখ্যা

বাঙ্গালার ভাষা এবং সাহিত্য।

(ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে নির্ব্বাচিত)

গৌড়বঙ্গের সমবেত সাহিত্যিক সজ্জন-সম্মিলনে আমি আজ বাঙ্গালার ভাষা এবং সাহিত্যসম্বন্ধে দুইচাবি কথা বলিতে অভিলাষ কবিতেছি। ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই সম্মিলন-সভায় অনেক আছেন, আমি কোন বিষয়েবই বিশেষজ্ঞ নহি। তবে, আমি বাঙ্গালী,-বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা এবং বাঙ্গালার সাহিত্য বাঙ্গালী জাতিব আচাব, ব্যবহার, সভ্যতা ও জীবনযাত্রার প্রণালীব ইতিহাস অথবা দর্পণ; সুতরাং উভয়েই আমার সাধনাব এবং ভালবাসাব বস্তু। এই জন্মগত এবং কর্ম্মগত অধিকাবেব উপব ভবসা রাখিয়াই আমি এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কয়েকটি কথা বলিব। আশা এবং প্রার্থনা কবি যে উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমাকে অনুমতি দিয়া কৃতার্থ কাবেন।

বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতে আমি কেবলমাত্র পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ এই চারিটি বিভাগমাত্রই বুঝিতে চাই না; আমি তদপেক্ষা অনেক বড় দেশের কথা বুঝিতে চাই। পৌবাণিক সময়ে যে দেশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ওড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বিদেহ এবং মগধাদি বিভাগে বিভক্ত ছিল, পবে যে দেশ গৌড়মণ্ডল নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, পালবংশেব সম্রাট্ ধর্ম্মপাল যে বিশাল এবং সুন্দর দেশেব সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন,—আমি বাঙ্গালা বলিতে তত বড় দেশ বলিতে চাই। এখনও মৈথিল কবি ঠাকুর বিদ্যাপতি বাঙ্গালা-ভাষাব কবি বলিয়া পূজিত হইতেছেন। ইংরেজ-রাজ্যেব পূর্ব্বে আসাম অথবা কামরূপ বাজ্যের লোকের ভাষা যে পূর্ব্বোত্তব বঙ্গেব ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, বা পৃথক এক ভাষা ছিল,—অর্থাৎ "অসমীয়া ভাসা" বলিয়া একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ভাষাব অস্তিত্ব ছিল, তাহা কেহ জানিতেন না। আসামেব পুবাতন পুথি যাঁহাবা পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে পূর্ব্বোত্তর বঙ্গেব ভাষার সহিত উহ প্রায় অভেদ।

ওড়িয়ার অক্ষরগুলিও বাঙ্গালা অক্ষর। কিন্তু অক্ষর পৃথক হইলেও ভাষার যে পার্থক্য হয় না,—অথবা অক্ষর এক হইলেই যে ভাষা এক হয় না, তাহা এই বিদ্বজ্জনসমীপে না বলিলেও হয়। মরাঠি এবং হিন্দী (হিন্দীর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যাদি ভেদও আছে) দেবনাগরে লেখা হয়, আরবী অক্ষরে অনেকগুলি ভাষা লেখা বা ছাপা হয়,—আর য়ুরোপের রোমান অক্ষরের দৃষ্টান্ত ত জগদ্‌বিখ্যাত। আমাদের ঘরের কাছেই দেখুন,—চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে যে অক্ষরে বাঙ্গালাভাষা লেখা হয়,—তাহাকে ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরই বলিতে হয়। পূর্ণিয়া জেলার "সিরিপুরিয়া" ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইলেও কাইথী অক্ষরে লেখা হইয়া থাকে এবং মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে ওড়িয়া অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষা লেখা হইয়া থাকে। ওড়িয়ার যদি অক্ষরগুলি পৃথক্ না হইত, তাহা হইলে ঐ ভাষাকে আমি "বাঙ্গালা"ই বলিতাম। মৈথিল মহাকবি বিদ্যাপতি যদি বাঙ্গালা-ভাষার কবি বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন, তাহা হইলে ওড়িয়া মহাকবি রাজা উপেন্দ্রভঞ্জকে (ভঞ্জ বীরবর) ও বাঙ্গালা কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগের ওড়িয়া মহাকবি পণ্ডিত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের রচনার নমুনা দেখুন।

চিলিকা (চিল্কা হ্রদের বর্ণনা।)

(ক) উৎকল-কমলা-বিলাস-দীর্ঘিকা,
মরাল-মালিনী নীলাম্বু-চিলিকা;
উৎকলর তুহি চারু অলঙ্কার,
উৎকল-ভুবনে শোভার ভণ্ডার,
স্বভাবে ভাবুক মানস-উল্লাসী—
দিগন্তবিস্তার তোর বারিরাশি,
প্রসন্ন-বদনা উজ্জ্বলবরণা
মুখশ্রী দেখান্তি যহিঁ দিগঙ্গনা,—ইত্যাদি।

অন্যত্র—"ভারতর রত্ন-সীমন্ত-অচল
(খ) দেখিলি হিমাদ্রি হিম-উর্জ্জ্বল,
পাদে কোটি কোটি শিখরি-সমাজ,
সর্ব্বোচ্চে শোভন্তি শুভ্র শৈলরাজ,
শৃঙ্গোপরি শৃঙ্গ শৃঙ্গ তদুপরি,
নীল ব্যোমপটে চিত্র হেলা পরি
নীহার-মুকুটে মস্তক-মণ্ডিত,
স্কন্ধে শোভে শুভ্র গঙ্গা উপবীত,"—ইত্যাদি।

কেহ মনে করিবেন না যে আমি বাছিয়া বাছিয়া নমুনা তুলিয়াছি। অনেক স্থলে ওড়িয়া রচনা একেবারে বাঙ্গালার সহিত একাকার বলিলেও চলে, আবার কোথায়ও বা দুই একটি খাঁটি ওড়িয়া শব্দ আছে। আমাদের উদ্ধৃত (ক) নমুনার মধ্যে "তুমি" স্থলে "তুহি" "দেখিতেছেন" স্থলে "দেখন্তি", "যথায়" স্থলে "যহিঁ" এবং (খ) নমুনার মধ্যে "দেখিলাম" স্থলে "দেখিলি," "শোভিতেছেন" স্থলে "শোভন্তি" এবং "চিত্রিত হইল" স্থলে "চিত্র হেলা" ব্যবহৃত হইলেও সাহিত্যিক বাঙ্গালীর পক্ষে উহাদের একটিও প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্ব্বোধ নহে; কেবল মাত্র "মত" এই অর্থ বুঝাইতে যে "পরি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—উহাই বাঙ্গালীর নিকট নূতন। অপর পক্ষে যাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, এবং পদাবলী, বৈষ্ণব কবিগণের রচনা—অধিক কি কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম প্রমুখ কবিকুলের লিখিত কাব্যাবলীর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল পুস্তকে রাশি রাশি প্রাচীন শব্দ এবং প্রয়োগরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, আধুনিক স্কুল কলেজে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা তাহাদের অর্থগ্রহ করিতে পারেন না। আধুনিক বিদেশীয়রূপে শিক্ষিত যুবকেরা বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ঐ প্রাচীন রচনাগুলি যে আমাদের মাতৃভাষার শিরোভূষণ স্বরূপ, তাহা আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। আমরা প্রাচীন পুথির আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের বাঙ্গালা কাব্যগুলির ভাষায় প্রাদেশিক প্রভেদ খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের গান, মনসার ভাসান, রামায়ণ মহাভারত, অথবা পৌরাণিক প্রস্তাবাদির পুথি বিশাল গৌড়বঙ্গের যে প্রদেশেই লিখিত হউক না কেন

অন্য প্রদেশের লোকের সে গুলি বুঝিতে কষ্ট হইত না। পুরাতন পুথি একখানি আবিষ্কৃত হইলে উহার ভাষা দেখিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না যে উহার প্রকৃত জন্ম স্থান কোথায় ছিল। দ্বন্দ করিতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা একই পুথি লইয়া এখন কতই দ্বন্দ করিতেছেন। ময়নামতীর অথবা মীনচেতনের পুথি কোথায় লেখা হইয়াছিল, এই প্রশ্নের মীমাংসা এবং সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত বলিলেন "উহার প্রকৃত জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গে, উত্তর বঙ্গের পণ্ডিত বলিলেন "না,উহার আসল জন্মভূমি উত্তর বঙ্গে" আবার রাঢ়ের শাব্দিক বলিলেন "না, না, উহার জন্ম উত্তরেও নহে,—পূর্ব্বেও নহে, একেবারে রাঢ়ে।" এ যেন সেই "অন্ধ হস্তী" ন্যায়ের কলহ! আসল কথা এই যে পূর্ব্বে আমরা বড় ছিলাম, বিস্তৃত ছিলাম, এত ছোট হই নাই, তাই প্রাচীনদের সাহিত্য রচনাও খুব দিগন্ত বিস্তারিণী ছিলেন। প্রাচীন গৌড়ীয় সাহিত্য পূর্ব্বে কামরূপ শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা-চট্টল হইতে পশ্চিমে মিথিলা, মগধ, ঝাড়খণ্ড এবং কলিঙ্গ সীমা পর্য্যন্ত বিশাল দেশে একাধিপত্য করিত। আমার আশা এই যে যদি আমরা প্রাদেশিকতার কলহ কোলাহল পরিত্যাগ করিতে পারি,—তাহা হইলে আমাদের আধুনিক সাহিত্যও তদ্রূপ দূর-বিস্তৃত দেশে আধিপত্য করিতে সমর্থ হইবে।

আরও একটু প্রাচীন কথা বলিতে চাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রি মহাশয় নেপাল হইতে "বৌদ্ধগান ও দোহা" এবং "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" নামক যে অমূল্য পুথি আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাষা সাহিত্যিক সুধী-জনের অনেকেই দেখিয়াছেন। আমরা যে বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, "কানু ছাড়া গীত নাই"—তাহা হইতে মনে করিতাম সেই কানু "ব্রজের কানাই" ছাড়া আর কেহই নহেন। শুধু আমি কেন, বাঙ্গালা দেশের অনেকেই তাহাই মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রি মহাশয়ের কৃপায় দেখিলাম,—বাঙ্গালার সে "কানু" রাসমণ্ডলের মহারসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নহেন, পরন্তু আমাদের এই গৌড়-মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য অথবা কাহ্নপাদ। এই কাহ্নপাদ সে কালে গান-রচনায় দেশে এত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার যশঃ এরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করিয়াছিল, যে লোকে সমস্বরে বলিত "কানু ছাড়া গীত নাই।" যে "কানুর গীত" এককালে লোকের কণ্ঠহার স্বরূপ ছিল, এখনকার শিক্ষিত সজ্জনেরা উহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন না। তাঁহার ভাষা "বাঙ্গালা" কিনা,—তাহা লইয়াই বাঙ্গালার সাহিত্য-সমুদ্রে তর্কের তুমুল তরঙ্গ উঠিয়া পড়ে। সেই কাহ্নপাদের রচনার একটু নমুনা দেখুন,—

"লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হুউঁ পরমথে পবীন।
কোটিহ মাহ এক জন হোই ণিরংজনলীন ॥১॥
আগমবেঅ পুরাণে পংডিত্ত মান বহংতি।
পক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভমরন্তি ॥২॥

এই দুইটি দোহা,—ঠিক গান নহে। যাঁহারা হিন্দী ভাষার সহিত সামান্য রূপও পরিচিত আছেন,—তাঁহারা এই বাঙ্গালা দোহার সহিত হিন্দী দোহার নৈকট্যসম্বন্ধ সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে সরোজবজ্র, অদ্বয়বজ্র, ভুসুকপাদ, ডোম্বীপাদ এবং লুইপাদ প্রমুখ সে কালের সিদ্ধাচার্য্যগণের রচনার নমুনা আছে। অপ্রচলিত শব্দ এবং প্রয়োগ-দুষ্টি সেই সকল রচনা হইতে নমুনা তুলিয়া সভ্যমহোদয়গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে চাহিনা। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী, তাঁহারা এইসকল প্রাচীন রচনার সহিত পরিচিত আছেন;—অথবা পরিচিত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই সকল রচনা পড়িবার পর আমার মনে হইয়াছে যে ইহা যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা এককালে আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত গৌড়মণ্ডলে সুপ্রচলিত ছিল এবং সেকালে মগধী (মগাহী), মৈথিলী, বাঙ্গালা, অসমীয়া এবং উড়িয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাষার নাম এবং অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। বিখ্যাত চারণ-কবি চান্দবর্দ্দাই এর "পৃথ্বীরাজরাসো" যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল,—তাহাকে পণ্ডিতেরা "হিন্দী" ই বলিতেছেন; অথচ সেকালে পঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতী এবং হিন্দী ও স্বতন্ত্র নাম অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। সেই সময়

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে দুইটি প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল,—একটির নমুনা আজও "পৃথ্বীরাজরাসো" মহাকাব্যে পাওয়া যায় এবং অপরটির নমুনা আমরা এই শাস্ত্রি-মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকে পাইতেছি। তাহারও পূর্ব্বে, ঠিক এই ভাবেই, শৌরসেনী এবং মগধী এই দুই নামে, আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব এই দুই বিভাগে প্রাকৃত ভাষার দুইটি মাত্র ভেদ অথবা প্রকার বিদ্যমান ছিল। তাহারও পূর্ব্বে সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃত-ভাষা আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থলেই রাজত্ব করিত ;—অন্ততঃ সাহিত্যের ভাষা একটিই ছিল,—লোকের মুখে মুখে প্রচলিত "ভাখা"র ভেদ নিশ্চয়ই ছিল। আচার্যপাদ দণ্ডী সেই প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাকে "গৌড়ী" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। "দেবানাং পিয় পিয়দশী"র অনুশাসন গুলিতে এই অতি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরে এই ভাষার নাম "মাগধী" হইয়া যায় বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা অনুমান করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভাষাতত্ত্বের রসগ্রাহী পণ্ডিত হর্ণলি তাঁহার পুস্তকে আর্য্যাবর্ত্তে (এবং দক্ষিণাপথের মরাঠীকেও) প্রচলিত আধুনিক সমুদায় ভাষাগুলির সাধারণ নাম "গৌড়ীয়"ই রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে আফগানিস্তানের প্রচলিত "পস্তু" ভাষার বক্ষের উপরও প্রাচীন গৌড়ী প্রাকৃতের বহু নিদর্শন অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়।

এত প্রাচীন কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,—প্রথমে আমরা একই ছিলাম, এখন পৃথক্ হইয়াছি। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, বাঙ্গালী, সুতরাং বিশাল ভারতবর্ষ এবং সেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষার কথা ভুলিব না ; সে কথা তুলিলে এরিয়ান, নন-এরিয়ান, সেমিটিক, মোঙ্গল, তুরানীয়ান—ইত্যাকার অসংখ্য কুট সমস্যাজালে আচ্ছন্ন হইয়া দিশেহারা হইয়া পড়িব। আমি নিজে এরিয়ান, দ্রাবিডিয়ান, সেমেটিক, মোঙ্গল ইত্যাকার নরতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্বের বুলি বুঝিও না,—মানিও না। যাঁহারা ঐ সব তত্ত্বের তাত্ত্বিক, তাঁহারাও যে ঐ সকল গভীর তত্ত্বের তলদেশে এখনও পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। লম্বা, চওড়া অথবা অন্যরূপ মাথার আকার এবং নাসিকার কিংবা শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য অথবা হ্রস্বতা লইয়া যে বিজ্ঞান বিচার আরম্ভ করিয়াছেন,—তাঁহার এখনও শৈশবাবস্থা। উহার অধিকারী মহাশয়দিগের মধ্যে যেরূপ কলহ কচকচির ধূম উঠিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মত অনধিকারীর পক্ষে ওদিকে প্রবেশ করিবার আশা সুদূর পরাহত। আমি বলিতে চাই যে, যে পর্য্যন্ত বিদেশী সভ্যতা (তাহা সেমেটিক ই হউক অথবা ইণ্ডো-য়ুরোপীয়ই হউক) আমাদিগের দেশে আসিয়া আমাদের পুরাতন সামাজিক একতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই,—সে পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র না হউক অন্ততঃ এই প্রাচ্য বিভাগে,—অর্থাৎ পশ্চিমে মগধ ও মিথিলা হইতে পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত দেশ গুলিতে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং ভাষার অনেকটা ঐক্য ছিল। মহানন্দানদী প্রাচীন মিথিলা এবং বরেন্দ্রীর সীমা নির্দ্দেশ করিত ; নামে সীমা নির্দ্দেশ করিলেও ঐ নদীর দ্বারা উভয় প্রদেশের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিচ্ছেদ হয় নাই। আজ আসামে অসমীয়া, মিথিলায় মৈথিলী, মগধে মগাহী এবং ওড়িশায় ওড়িয়া (এবং ঝাড়খণ্ডে এক অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষায়) ইত্যাকার এক এক পৃথক্ ভাষার নাম এবং রূপ রহিয়াছে বটে, কিন্তু মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অনেক দিন পর পর্য্যন্তও এত ভেদ ছিল না। আজ আসাম অসমীয়ার জন্য, ওড়িশা ওড়িয়ার জন্য, বেহার বেহারীর জন্য,—অধিক কি জলপাইগুড়ী জেলার দুয়ার অঞ্চল "দুয়ারী"র জন্য ইত্যাদি চীৎকার সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্ণাকুলার তালিকায়ও ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন নামরূপধারিনী ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমার আশঙ্কা হয়, যদি বঙ্গ-বিভাগ-ব্যবস্থা চিরস্থায়িনী হইতেন,—তাহা হইলে পূর্ব্বী হিন্দী এবং পাশ্চাত্য হিন্দীর নমুনায় পূর্ব্বীয় বাঙ্গালা এবং পাশ্চাত্য বাঙ্গালা দুইটি পৃথক্ ভাষারও সৃষ্টি হইত। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন সাহেব প্রমুখ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সজ্জনেরা সুস্পষ্টই বলিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাটি পশ্চিম, মধ্য এবং

উত্তরবঙ্গের ভাষা হইতে একেবারে পৃথক্। যদি পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম প্রচলিত বার্মিজ বা মগী অক্ষরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যন্তে প্রচলিত ভাষা বা Dialect গুলি লেখা এবং ছাপা আরম্ভ হয়,—তাহা হইলে যশোরের বাঙ্গালীকেও শ্রীহট্টে গিয়া দোভাষীর শরণাপন্ন হইতে হইবে। আর যদি মগী অক্ষরের উপর কাহারও বিতৃষ্ণা অথবা বিরাগ থাকে, তাহা হইলে জগৎপ্রসিদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অপ্রতিহত প্রভাব রোমান এলফেবেট ত সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র নিজ প্রতিপত্তি প্রচারের নিমিত্ত প্রস্তুত এবং সচেষ্ট রহিয়াছেন। এতকাল সাঁওতাল, মুণ্ডা হইতে খাসিয়া জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী জাতি কোন ভাষা অথবা সাহিত্য শিখিতে গেলে হয় দেবনাগরী (অথবা কায়থী) কিংবা বাঙ্গালা অক্ষরের আশ্রয় লইত, এখন পরম দয়ালু মিসনরীদের কৃপায় তাহাদের ভাষা সুসভ্য রোমান-এলফেবেটের গাউন-বডিসে সুসজ্জিত হইয়া পরমা শোভা লাভ করিয়াছে। অসমীয়া যে এই কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের পরম লাভ।

বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া এত অবান্তর কথা বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমি এই কথা উত্থাপন করিতেছি। আজ বঙ্গের পরম পবিত্র বিক্রমপুর রাজধানীর সান্নিধ্যে গৌড়বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ সমবেত হইয়াছেন। যে দেশে মহাভারতের সময়ে চন্দ্রসেন সমুদ্রসেন মহারাজ রাজত্ব করিতেন, যে দেশ মাগধ সম্রাড়গণের ছত্র ছায়ায় এবং তাঁহাদের মিত্র রাজন্য মণ্ডলের আশ্রয়ে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী এবং বৈরাগ্য-মণ্ডিত সভ্যতার আধার ছিল, উত্তর কালে যে ভূভাগ চন্দ্র, খড়্গ, পাল, বর্ম্মা, সেন প্রমুখ নরপতিবৃন্দের ক্রীড়াস্থল ছিল, বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ এবং জৈন ইত্যাদি বিবিধ নামে পরিচিত মহাভারতের ধর্ম্মপ্রাণ মহাবীর মহাসাধক মণ্ডলীর পদধূলিতে যে দেশ সর্ব্বদা পবিত্র, সেই দেশের সেই পুণ্যময় পীঠস্থান" বিক্রমপুর সমাবাসিত "জয়স্কন্ধাবারের" সমীপে,—অথবা তাহারই উপরে,-আজ গৌড়মণ্ডলের সারস্বত তীর্থযাত্রিগণ সমবেত হইয়াছেন। আজ আমাদের মনে যে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা মুখে বলিবার উপায় নাই, আর সেই ভাবোচ্ছাসের তরঙ্গ তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমি যে প্রয়োজন বোধ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিতেছি, তাহাই বলিব।

অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালা ভাষা অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্ব্বজনবোধ্য অথবা সোজা করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার মূলের কথা এই যে বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার মাতামহী অথবা প্রমাতামহী সংস্কৃত ভাষার শাসন হইতে মুক্ত করিয়া "স্বাধীন" করিতে হইবে। "বাঙ্গালা ভাষা 'বাংলা' যে 'সংস্কৃত' বা সাংস্কৃট্ নহে"—এই উচ্চরব অনেক সময়ই শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কারক বা সুধারকগণ বলেন,—"বাঙ্গালা-ভাষার ঘাড়ের উপর স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘতার ভেদ, ঋ, ৯, ঐ এবং ঔ এর অস্তিত্বের বোঝা। এবং ব্যঞ্জনের দুটা জ (জ এবং য), দুটা ন (ণ এবং ন) দুটা ব (ব এবং ব্), তিনটা শ (শ, ষ এবং স) এর চাপ অসহ্য হইয়াছে ;—উহাদিগকে বর্ণমালার বেড়া হইতে বাহির করিয়া দাও।" পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যন্তবাসীও বলিতে পারেন যে "এইগুলি ব্যতীত, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, ড়, ঢ় এবং চন্দ্রবিন্দুর উৎপাত এখনই তুলিয়া দিতে হইবে।" অসমীয়া ভ্রাতৃগণ বলিতে পারেন,—ত বর্গ টা গোটাই আমাদের নিষ্প্রয়োজন, আমরাও বাঙ্গালীর 'মূর্দ্ধণ্য ণ,' "অন্তঃস্থ জ", ইত্যাদির উপর "দন্ত্য ট" মুখস্থ করিতে করিতে মারা গেলাম।" শব্দের আদিস্থ "স" অথবা "শ" এ ও তাঁহাদের প্রয়োজন নাই,—"হ" অক্ষরের "হাহায্যে" ই কাজ চলিবে কিন্তু "চ" ও "ছ" এর স্থলে এ কথা খাটে না ; তাঁহারা "চিল" স্থলে "সিল" অপর পক্ষে "সিদ্ধ" স্থলে "চিদ্ধ" চালাইবেন। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে ও অনেক কাট ছাঁট করিতে হইবে। যদি এই বিশাল গৌড়-বঙ্গের প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীর উচ্চারণ-সঙ্গত (Phonetic) বর্ণবিন্যাস বা বানান ভাষায় অথবা সাহিত্যে চালাইতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মী, (অর্থাৎ আমাদের এই দেবনাগর অথবা বাঙ্গালা) সেমিটিক এবং রোমান এই সকল বর্ণ মালার প্রায় সকল অক্ষরগুলিই

পরামর্শযুক্ত হইলে। মেদিনীপুরের স্থানবিশেষে সিংহভূম এবং মানভূম জেলায় মূর্ধণ্য "ণ" এর এবং বৈদিক "ল" কারের (ळ) উচ্চারণ খুব বেশী। সেখানে মানুষ "মাড়ুষ" এবং জল "জড়" রূপে উচ্চারিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ বৈশিষ্ট দেখাইবার প্রয়োজন নাই,—যে হেতু সভ্যগণের অনেকেরই সে তথ্য সুপরিজ্ঞাত।

বানান কে উচ্চারণের অনুযায়ী করা ব্যতীত, সংস্কারকগণ আরও কয়েকটি "সুধার" করিতে চাহেন। সংস্কৃত ভাষার শব্দ সমূহের প্রাকৃতরূপও তাঁহারা চালাইবার অনুরাগী। পদ্ম কে "পদ্দ" এবং পদ্যকেও "পদ্দ" এবং শয্যা এবং সজ্জা কেও "শজ্জা" রূপে তাঁহারা লিখিবার এবং পড়িবার প্রয়াসী। লক্ষ্য, লক্ষ এবং লক্ষ্ম তিনই "লক্‌খ" হইবে। এরূপ উদাহরণ তাঁহারা অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাকৃত-ভাষার দোহাই দিয়া তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ যুগান্তর ঘটাইতে চাহেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে বাঙ্গালা ভাষাকে এই প্রকারে সংস্কৃত ব্যাকরণের ষত্ব, ণত্ব, বর্ণবিন্যাস ইত্যাদির নিগড় মুক্ত করিলেই গৌড়বঙ্গের আপামর অধিবাসী অত্যল্পকালের মধ্যেই ভাষা এবং সাহিত্যে "লায়েক" হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের পক্ষে "বানান ভুল" করা আর সম্ভব হইবে না।

আর এক শ্রেণীর প্রতিভাবান লেখক আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে "সাধু ভাষা"কে বিদায় দিয়া তাহার স্থলে চলিত ভাষাকে চালাইতে চাহেন। তাঁহারা মুখে এইরূপ বলিলেও কাজে তাহা করিতেছেন কি? এই "চলিত পন্থিগণের" রচনায় আস্ত আস্ত সংস্কৃত শব্দাবলীর ভুরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—কেবল ক্রিয়াপদের বেলায় তাঁহারা কলিকাতার কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বীরবলের মত যাঁহারা ওস্তাদ লেখক তাঁহাদের লেখনী মুখে এই ধরণের যে ভাষা বাহির হয়, তাহার একটি অতি সুন্দর, মধুর এবং চটুল ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেরূপ ভাষায় রস, মাধুর্য্য অথবা তেজঃ কিছুরই অভাব হয় না। পরন্তু যাঁহারা আনাড়ী হইয়াও ওস্তাদী করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের হাতে এই বীরবলী ষ্টাইলের বড়ই দুর্দ্দশা দেখিতে পাই। উৎকট এবং অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সমূহের সহিত "খাচ্চি", "যাচ্চি" কিংবা "খেলুম" "গেলুম" মিশাইয়া ইংরাজী রচনা পদ্ধতির অনুকরণে তাঁহারা "চলিত ভাষা" নামে যাহা চালাইয়া থাকেন,—তাহা নিতান্তই বিকট হইয়া পড়ে। অনেক নামজাদা বড় বড় লেখকেরাও বীরবল কিংবা রবি বাবুর ভাষা বা ষ্টাইল নকল করিবার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজ নিজ রচনা-পদ্ধতিকে সাংকর্য দোষে দুষ্ট এবং সাহিত্যকে অনর্থক দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য প্রবীণ লেখকেরা বিশেষ বিশেষ রচনা রীতির আশ্রয় লইয়া থাকেন,—তাহা উত্তম কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও প্রদেশ বিশেষের কোন বিশেষ লেখক কোনও একটি রচনা রীতি অবলম্বন করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন বলিয়া, সেই রীতির অনুকরণ করিয়া অপরেও যশস্বী হইবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। আর কলিকাতার কথ্য ভাষার অতি প্রয়োগেরও অনুরূপ দোষ আছে।

কতকগুলি যশস্বী লেখক কলিকাতার কথ্য ভাষার ভুরি প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গালার সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিতেছেন বলিয়া গৌড়বঙ্গের অন্যত্র,—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে—একটি অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ অসন্তোষের উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা প্রতিভাশালী, তাঁহারা অপরের নকল করিতে প্রস্তুত হন না,—আর যাঁহারা অক্ষম হইয়াও শুধু নকল-নবিসী করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহেন—তাঁহারাত হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। কবি দীনবন্ধুর রামমাণিক্য অনেক প্রকার সাধনা করিয়াও "কলকত্তাই হইতে পারেন নাই"—বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। প্রতিভাশালী লোকেরা "কলকত্তাই" হইতেই লজ্জাবোধ করিবেন,—আর শক্তিহীন লেখকেরা যতই কসরৎ করুন,

রামযাণিক্যের মত হতাশ হইবেন। নাটক অথবা প্রহসন ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের সাহিত্যেই কোন প্রকার প্রাদেশিকতার অতি প্রভাব বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাতে এই প্রাদেশিকতার অতি প্রচলন সাহিত্যে রহিত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের মধ্যে যাঁহার যে স্থানে নিবাস, তাঁহার নিকট সেই স্থানের চলিত ভাষা মধুর হইলেও, সাধারণ সাহিত্যে সেই ভাষার অতি প্রয়োগ কখনই ভাল নহে। প্রতিভাশালী লেখক নিজ নিবাস-স্থানের ভাষা সাহিত্যে চালাইতে পারেন বটে, কিন্তু অপর সাধারণের পক্ষে সে পথ কখনই সাধু নহে। আর প্রতিভাশালী লেখকের পক্ষেও উহা একপ্রকার অত্যাচার বিশেষ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি রবার্ট বার্ণসের অনুকরণে কবি নবীনচন্দ্র সেন যদি চাটগেঁয়ে ভাষায় তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ কিংবা রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসাদি কাব্য লিখিতেন, তাহা হইলে কোন কোন কাব্যামোদী প্রাণের টানে উহা পড়িতেন বটে, কিন্তু পাঠকেরা সেই কষ্ট স্বীকারকে কবির কৃত অত্যাচারই বোধ করিতেন;—অথবা ঐ ভাষার কাব্য লিখিলে কবি আদৌ যশোলাভ করিতে পারিতেন কিনা, তাহাই বা কে জানে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে সমস্ত গৌড়মণ্ডলে যে সাহিত্যের প্রচার এবং প্রতিপত্তি, তাহা প্রাদেশিক-বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত এবং সাধু রচনা রীতি সঙ্গত হওয়াই উচিত।

একতার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিকতা বর্জন সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নহে। সংস্কৃত ভাষারই দৃষ্টান্ত দেখুন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে পাণিনি-প্রমুখ বৈয়াকরণগণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত এবং সংশোধিত হইয়াই "সংস্কৃত ভাষা"র উৎপত্তি হইয়াছিল,—ঐ ভাষা কোথাও কোনকালে মানুষের চলিত ভাষা ছিল না; অর্থাৎ উহা প্রথম হইতেই মৃত ভাষা! সাহেবদের দেখাদেখি এদেশী শিক্ষিতদিগেরও কেহ কেহ এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। প্রাচীনের পদানুগামী আমরা অবশ্য এই মতের সত্যতা স্বীকার করি না; তথাপি তর্কের স্থলে, "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া এই মত মানিয়া লইলাম। বিশেষ চেষ্টার দ্বারা কতকগুলি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সৃষ্ট অথবা সংস্কৃত এই ভাষার শক্তি, প্রসার এবং প্রভাবের বিষয় চিন্তা করুন। য়ুরোপীয় মনীষিগণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যে সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে মধ্যএসিয়ার (অধুনা) মরুময় মালভূমি হইতে ভারতসাগর গর্ভস্থ দ্বীপমালায় এবং পূর্ব্বে জাপান হইতে পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত এই বিশাল ভূভাগে (প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র) এককালে এই দৈবী ভাষার অপ্রতিহত প্রভাব এবং প্রচার ছিল। আজিও বালি এবং যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক পুস্তকের প্রচার রহিয়াছে। ভারত মহাসাগর বক্ষঃস্থ দ্বীপমালার অধিবাসি-বর্গের প্রায় সকলেই কোরাণের অনুবর্ত্তী হইলেও তাহাদের ভাষার মধ্যে আজিও সংস্কৃত ভাষার চিহ্নাবলী অপরিবর্ত্তনীয়-রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রাকৃত ভাষা এক সময়ে প্রাকৃত বা সাধারণ জনের কথিত ভাষাই ছিল; কিন্তু, কালে সেই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইলে উহাকে প্রাদেশিকতা শূন্য করিয়া ব্যাকরণের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে সেতুবন্ধাদি মহাকাব্য এবং অজস্র এবং অসংখ্য জৈনধর্ম্মের নিবন্ধাদি এবং পালী অথবা মাগধী প্রাকৃতে হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থ রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারেন যে কোন ভাষাকে তাহার প্রচলিতরূপ এবং প্রাদেশিকতা হইতে বঞ্চিত করিলে উহা কৃত্রিম এবং প্রাণহীন বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা বলি, ঐরূপ প্রাদেশিকতা বর্জন এবং সংস্কারের দ্বারা উহা অনেক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া পড়িলেও নিস্তেজ অথবা প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে না। আমাদের মতে "ভাষা"র প্রকৃতি অকৃত্রিম হইলেও সাহিত্য বস্তুটি কৃত্রিমই বটে; যেহেতু সাহিত্য একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প। শিল্প নিশ্চয়ই কৃত্রিম,—কিন্তু সে কথনই নিস্তেজ অথবা প্রাণহীন নহে। শিল্পের সাহায্য ভিন্ন স্বাভাবিক বস্তুকে সভ্য মানবের ব্যবহারে

আনয়ন করা যায় না। আমাদের খাদ্য, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বাসস্থান, উদ্যান, সরোবর, উপাসনা মন্দির—প্রভৃতি সমুদয়ই কৃত্রিম; অধিক কি এ দেশের ধর্ম্মপ্রাণ সাধকের আরাধ্য দেবদেবীর বিগ্রহগুলিও শিল্প-জাত বা কৃত্রিম। অসভ্য মানবের ব্যবহার্য অনেক বস্তু স্বভাবজাত হইতে পারে, কিন্তু সভ্য মানবের সকলই কৃত্রিমতা পূর্ণ; এক কথায়—"সভ্যতা" শব্দের অর্থ বলিতে বা বুঝাইতে গেলে "কৃত্রিমতা"ই ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং সাহিত্যের ভাষা কৃত্রিম হইবে বলিয়া ভয় করিবার কোন কারণ নাই এবং সেই ভয়ে গ্রাম্য অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার করিবারও কোন কারণ নাই।

ফলতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ-বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের যশস্বী লেখকবৃন্দ যে ভাষার সাহায্যে সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কোন প্রদেশ বিশেষের "চলিত ভাষা" বা ভাখা বলা যায় না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ওড়িয়া ছিলেন,—এবং কালীপ্রসন্ন ঢাকার এবং নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের নিবাসী ছিলেন; আর সকলেই রাঢ় দেশের নিবাসী অথবা রাঢ়ীয় প্রভাবের অধীন ছিলেন। এই লেখক তালিকায় আমরা ইচ্ছা করিয়াই কোন জীবিত যশস্বী লেখকের নাম করি নাই। প্রাগুক্ত লেখকগণের মধ্যে কেহই নিজের "দেশের" বা অঞ্চলের ভাখা ব্যবহার করেন নাই এবং তাঁহাদের রচনা গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। গৌড়বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্য-সাধকের শতাধিক বর্ষব্যাপিনী তপস্যার ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিবার কোনও আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাব্য, কথা, জীবনবৃত্ত, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ব, দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের প্রত্যেক অংশই এই সাহিত্যিক ভাষার সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে ঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং প্রতিভাশালী লেখকগণের সাধনার ফলে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার এবং প্রভাব দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। এই সুপরিচিত এবং মহাজনানুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত, অপরীক্ষিত এবং নুতন পথে যাইবার কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই, আমরা আজ সমাগত এবং সম্মিলিত সাহিত্যিক সজ্জনগণ সমীপে এই নিবেদন উপস্থিত করিতেছি।

এই মহাজনানুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন উন্নতি অথবা উপকারের পরিবর্ত্তে ভয়ানক হানির আশঙ্কা আছে। সংস্কৃতের সাহায্য পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মতত্ব, দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগ ত একেবারে বিকল হইয়া যাইবে, এমন কি উচ্চাঙ্গের রস-রচনা অথবা কাব্য কলার সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকিবে না। কানু পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণের রচনার অনুশীলন করিয়া দেখুন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃশাস্ত্র এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন ভিন্ন উক্তরূপ রচনা সৃষ্টি সম্ভব কি না। প্রাচীন প্রাকৃত-সাহিত্যের শিল্পিগণ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়াই নিজ নিজ কীর্ত্তি সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আর প্রাদেশিক অথবা কল্পিত আদর্শমূলক; (Standard ;) উচ্চারণ-সঙ্গত বর্ণবিন্যাস চালাইতে গেলে যে কি মহা গোলযোগের ব্যাপার হইবে,—তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রাদেশিক উচ্চারণ (তাহা রাঢ়েরই হউক অথবা শ্রীহট্টেরই হউক) যে চলিবে না, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াই সংস্কারক মহাশয়গণ একটি আদর্শমূলক বা Standard উচ্চারণের কল্পনা করিয়াছেন। এই আদর্শমূলক উচ্চারণের অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিতে গেলে যে কিরূপ "ব্যাবেলের" উদ্ভব হইবে, তাহা আমি ভাবিতেও পারি না। যে কোন একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ঐ (Standard) উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিয়া ছাপাইয়া দেখুন,—উহা সম্ভব কি না। কেহ কেহ কলিকাতার উচ্চারণ কে Stand

ard বা আদর্শ করিতে চাহেন। পশ্চিমে মানভূম, উত্তরে কোচবেহার এবং পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের অধিবাসিবর্গ (যাঁহারা কলকত্তাই উচ্চারণের সহিত পরিচিত নহেন) কি-রূপে যে ঐরূপ উচ্চারণ আয়ত্ত করিবেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির একান্ত অতীত। আমার সামান্য বুদ্ধিমতে এবম্প্রকার সংস্কারের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

তবে, প্রচলিত সাধু সাহিত্যিক ভাষার বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ আছে। যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ ভাষা শিক্ষা করেন নাই,—তাঁহারা গ্রন্থকার হইয়া সাহিত্য-রচনা করিতে গেলে বড় দুরবস্থায় পড়িয়া যান। তাঁহারা ভাবেন, বাঙ্গালা তাঁহাদের মাতৃভাষা (—ইংরাজি ভাষায় হয়ত তাঁহারা শিক্ষিত) অতএব কৃপা পূর্ব্বক কলম ধরিলেই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রগুলি এই প্রকার লেখকের পক্ষে যে পর্ব্বতোপম বাধা, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। আজ কাল মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে এবং পুস্তকাকারে যে অগণ্য অসংখ্য রসরচনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে,—উহার অধি-কাংশই নানাবিধ দোষে দূষিত। অনেক দুঃখেই এইরূপ কথা সজ্জন-সমীপে বাহির হইয়া পড়ে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী "ঔপন্যাসিক কবিগণ" অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আত্মসংবরণ করিতে পারিলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের, তথা বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল হইত।

বিলাতী কামলালসার বিষম বিষে বাঙ্গালার লঘু সাহিত্য আজ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; অথচ ঐ শ্রেণীর তরল-সাহিত্যই আজকালকার যুবক যুবতীদিগের প্রধান অবলম্বন! "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" প্রকৃতই আজ "বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য রক্ষার" মত অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। স্বনাম ধন্য চিকিৎসক রায় শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহা-দুরের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত Anti-malaria-Co-operative Society বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া, কালা-আজার প্রভৃতি শত্রু নিপাত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে ;—রায় বাহাদুরের চেষ্টা ফলবতী হউক,—তাঁহার যশঃ অক্ষয় হউক। এই সমবেত সাহিত্যিক সজ্জন-সংঘ সমীপে আমার সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্য ক্ষেত্রের ম্যালেরিয়া কালা-আজার প্রভৃতি আপদ দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত দেহ বাঙ্গালীর মন এই বিলাতী-বিলাস-লালসা বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে,—ইহার উপায় চিন্তা করা স্বদেশের শুভানুধ্যায়ী প্রত্যেক সজ্জনেরই কর্ত্তব্য।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়াছে,—এইখানেই শেষ হউক। শ্রীভগ-বানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, আপনারা, সৌহার্দ্য এবং প্রেম বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আপনাদের সাধনা সার্থক করিতে সমর্থ হউন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ফিরে এস

বিলাসমগ্ন অভাবগ্রস্ত নগরবাসী বাঙালীর গোপন হৃদয় বীণায় যেন আজ মৃদুঝঙ্কার উঠিতেছে "ফিরে এস ফিরে এস"। অভাবের ঘন ঘোর যেন তাহার সকল উৎসব সকল সজ্জা মলিন করিয়া তাহার মনের বসন্তকে বর্ষায় পরিণত করিতেছে। নগরের ঐশ্বর্য্য ও অবিরাম কোলাহলের মধ্যে তাহার চিত্ত যেন আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না ; ভবিষ্যতের চিন্তা ঠেলিয়া রাখিয়া আপাতমধুর বর্ত্তমানে সে মজিয়াছিল—অভাবের কশাঘাতে তাহার মোহ অপসৃত হইয়া আজ তাহার জ্ঞানের নয়ন ধীরে খুলিতেছে।

যে পল্লী ও পল্লিবাসী তাহার উপেক্ষা ও রহস্যের বিষয় ছিল, তাহাদের কথা সে আজ বাধ্য হইয়া ভাবিতেছে। নগরে বাস করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের ভার যখন তাহার দুঃসহ হইয়া উঠে, তখন অনাদৃত পরিত্যক্ত পল্লীভবনের কথা তাহার মনে পড়ে। তখন সত্যই তাহার মনের গোপন কোণে বাজিয়া উঠে "ফিরে এস ফিরে এস"।

কিন্তু সাহসে কুলায় কৈ ? দারুণ লজ্জা ও আত্মাভিমান আসিয়া তাহার পথরোধ করে। সে দৈন্যের পঙ্কে আরও

ডুবিয়া যায়—গাঢ়তর অন্ধকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কি কোন উপায় নাই? এ স্বখাত-সলিল হইতে উদ্ধার পাওয়া কি সম্ভব নহে?

পানীয় জলের অভাব, রোগাধিক্য, অপরিচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতা পল্লীর শ্যামশ্রী নষ্ট করিয়াছে। শিক্ষার অভাবই এই সর্ব্বনাশের মূল। কবির কল্পনার পল্লী এখন বাস্তব হইতে বহু দূরে। তাহার 'জলে স্বর্ণ ফলে সুধা শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি' আর আছে কি? শত শতাব্দির অন্ধ কুসংস্কার, দুর্ব্বল পাইয়া তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়াছে—ঘরে ঘরে অকালমৃত্যু, শোকের বিভীষিকা, স্বার্থের হলাহল—প্রবলের অহেতুক অত্যাচার, পীড়িতের নিস্ফল আর্ত্তনাদ—ইহাই আজ পল্লীর নিজস্ব!

কি লইয়া গ্রামে ফিরিব? কোন্ ভরসায় এই অরণ্যে প্রবেশ করিব? কোন্ সুখে সেখানে থাকিব?

বাংলায় নগরের সংখ্যা ১৩৫টী; গ্রামের সংখ্যা ৮৪৯৭৬; মধ্যবিত্ত বাঙালী তথাকথিত উচ্চশিক্ষার চাপে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অর্থহীন হইয়া, ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের ভারে অবসন্ন হইয়া, দারুণ দৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া পলে পলে মরিতেছে। অর্থে, সামর্থ্যে, সম্ভ্রমে হীন হইয়া বাঁচিতে কে চায়? তবু এ দাস বংশ বাল্যবিবাহের কল্যাণে নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবেকানন্দ বলিতেন আমাদের কাজ সুধু আহার নিদ্রা ও নিয়মিত বংশবৃদ্ধি। ওদিকে দারিদ্র্য মৃত্যুর মত করাল "হত্যার মত ভীষণ" ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এ সমুদ্রে কি কূল নাই?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রের নূতন সুর—"Back to the village"

তিনি তরুণকে আহ্বান করিয়াছেন। দেশের তরুণ তাহার দুঃখময় ভবিষ্যৎ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। তাহারা 'খা মারিয়া' 'আধমরা-দের' বাঁচাইল—কিন্তু অন্ন দেওয়া যে বাকি আছে। এই অনন্ত দুঃখসমুদ্রে তাহারাই ত মাথা তুলিয়া তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। কবীন্দ্রের রাগিনীর ঝঙ্কারে মৃতম্লান মূক মুখে ভাষা ফুটিয়া উঠে, শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে আশা ধ্বনিত হয়—তাই ভরসা হয় তাঁহার এই নূতন উদ্যম সফল হইতে পারে। বক্তৃতা ও আলোকচিত্র সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে পরিচ্ছন্নতা, রোগনিবারণের উপায় শিক্ষা ও বাঁচিয়া থাকিবার সাধারণ জ্ঞান প্রচার কল্পে গবর্ণমেণ্ট ও দেশের মনীষিবৃন্দ সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু দেশের তরুণের সাড়া কই? তাহাদের জাত্যাভিমান বংশগৌরব ও উচ্চশিক্ষা কি পল্লীসংস্কারের অন্তরায়?• কোথায় সেই প্রাণ যাহা একদিন মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল—যাহার অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিস্পর্শে এই দাসবৎ উদ্যমহীন মেরুদণ্ডহীন জাতি তন্দ্রাঘোর হইতে উঠিয়া বসিয়াছিল? হে সবুজ, হে অবুঝ—একবার পল্লীতে পল্লীতে বসন্তের আনন্দের মত ছড়িয়ে পড়। স্নেহের বন্যায়, সৎশিক্ষার প্রবাহে গ্রাম্যদলাদলি, সঙ্কীর্ণতা ও দাসসুলভ ঈর্ষ্যা ভাসিয়ে দাও—মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা কর। তোমার শিক্ষা যদি তোমার চিত্তকে বলিষ্ঠ করিয়া থাকে, যদি স্বামিজীর অগ্নিময়ী ভাষা তোমায় দেশত্মবোধে পাগল করিয়া থাকে—যদি কবীন্দ্রের এই নবজাগরণের কবিতায় গানে তোমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেণু বাজিতে থাকে—তবে এই দুর্দ্দিনে পল্লীজননীর আকুল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিও না। তুমি পথ দেখাও, সারা বাংলা তোমার অনুসরণ করিবে। তুমি লাঙ্গল ধরিয়া চাষ কর, চাষির সহিত হৃদয়ের বিনিময় কর, তাহাকে নূতন উপায়ে চাষের উন্নতির সহজ বিধান শিখাও,—দেশের তথা কথিত উচ্চশ্রেণীর অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট 'ভদ্রসম্প্রদায়' চাষে মনোনিবেশ করিবে; না খাইয়া যে মরিতে বসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমার বোঝা বহিয়া সভ্যতার দুরপনেয় ছাপ পরিয়া, মিথ্যা স্বচ্ছলতার আবরণে, দৈন্যের সহিত মধ্যবিত্ত বাঙালী আর কতদিন যুঝিবে? মনুষ্যত্ব হারাইয়া দাসবংশ বৃদ্ধি করিয়া, বিশ্বসমাজে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হইয়া কেমন বিপুল সমারোহে আমরা ধ্বংসের পথে চলিয়াছি!

আশু বাবু Mysore University Convocation এ ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমরা উঠিবে না আরও পড়িবে?"

"তোমরা কি বাঁচিতে চাও, না মরিতে চাও ?"—উৎসাহের অবতার, প্রতিভার দীপ্তসূর্য্য অক্লান্তকর্ম্মী সেই পুরুষবর নিজেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—

"তোমরা উঠিবে, তোমরা বাঁচিবে, তোমরাই পরিচালন করিবে।" কি উপায়ে বাঁচিব ? আর বৃদ্ধির পথ কোথায় ? দৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া মধ্যবর্ত্তি বাঙালী আপনার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে ; জীবন মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার কালবৈশাখী তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে।

"সন্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার !
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল 'চাই স্বাস্থ্য' আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট"

এই কবি ডাকিতেছেন—হে তরুণ, এই প্রচণ্ড দৈন্যের মধ্যে স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি নিয়ে এস, উৎসাহের ঝরণা ধারায় মলিনতা ধুইয়ে দাও।

হে বাংলার ত্যাগি, হে ব্রহ্মচারি, হে মুক্তি মন্ত্রের হোতা—আরও কিছুদিন অবিবাহিত থাকিয়া এই উদ্ধার ব্রত পালন কর দুই বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, একশ্রেণী অর্থকরী শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রাণ ঢালিয়া দাও, বিদেশ হইতে অর্থকরী নূতন বিদ্যা, নূতন চিন্তা, নূতন উন্মাদনা নিয়ে এস—আর একশ্রেণী বাংলার পরিত্যক্ত পল্লীভবন মাতাইয়া তোল। কয়জন সরকারি কার্য্য পাইতে পারে ? কয়জনইবা ব্যবহার ও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ভদ্রভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারে ? যাঁহাদের এই পথগুলি ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কি ব্যর্থ হইবে ? ভাবিবার দিন বহু পূর্ব্বে আসিয়াছে। জড়ের মত বসিয়া ভাবিতেছি, আশায় আশায় দিন গণিতেছি—কিন্তু অন্ধকার যে ঘনাইয়া আসিল ; কে এই অন্ধকারে পথ দেখাইবে ?

ঐ ত নবযুগের ঋষি গাহিতেছেন—

"সকল মহৎ কর্ম্মে পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয় ;
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্বভয়।

* * * *
* * * *

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্ত দর্শন

বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ।

রামানুজাচার্য্য বেদান্তদর্শনে বিশিষ্টাদৈত বাদের সংস্থাপন করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ সমর্থন করিবার জন্য

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাত্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।

শ্বেতাশ্বতরের এই শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মতে মায়াই প্রকৃতি, মায়ামুক্ত মহেশ্বরই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম নির্গুণ নহে, ব্রহ্ম সর্ব্বদা সগুণ, মায়া বলিতে, অদ্বৈত বাদীর অজ্ঞান নহে, বিচিত্রার্থ সৃষ্টি কৃত্‌গুণাত্মিকা প্রকৃতিই মায়া, ব্রহ্ম নির্গুণ নহে, তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর, তাহাতে হেয় গুণের লেশ মাত্রও নাই। ইহাই নির্গুণ বলিবার তাত্পর্য্য, অদ্বৈত বাদীগণ, "জন্মাদ্যস্যযতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিত ও প্রলয় সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, "যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যত্ প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি, তত্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তত্ ব্রহ্ম।" যাহা হইতে জগতে সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম, উল্লিখিত ব্রহ্ম সূত্র ও শ্রুতি, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের তটস্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী রামানুজ তাহা স্বীকার করেন নাই। রামানুজ ঐ সূত্র ও শ্রুতি অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, উক্ত শ্রুতি ও সূত্র ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নহে, পরন্তু স্বরূপ নির্ব্বাহক, স্বরূপ নির্ব্বাহক

তটস্থ লক্ষণের ভেদ রামানুজাচার্য্য স্বীকার করেন নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের মতে, "দ্রব্যং দ্বিধা, বিভক্তং জড়মজড় মিতি," দ্রব্য দুই প্রকার জড় ও অজড়, জীব ও ঈশ্বর ভেদে অজড় আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, জড় বস্তু ভোগ্য, অজড় ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভোগ্য ও ভোগের নিয়ন্তা, উল্লিখিত মত সমর্থনের জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ হইতে,

উদগীত মেতত্ পরমস্তু ব্রহ্ম।
তস্মিন এয়ং সুপ্রতি স্বাক্ষরঞ্চ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈতত্।

ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উদ্ধৃত শ্রুতির অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও উল্লিখিত ভাবটীই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরস্যৈব ভোক্তৃ ভোগ্যয়োরুভয়োরন্তর্যামি রূপেনাবস্থানং" অর্থাত্ ভোক্তা ও ভোগ্য পৃথক হইলেও পরমেশ্বর বা ব্রহ্মই ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়তেই অন্তর্যামি রূপে অবস্থান করিতেছেন, রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন, "তদেতত্ কার্য্যা বস্থস্যচ কারণাবস্থস্যচ চিদ্ চিদ্বস্তনঃ সকলস্যস্থূলস্য সূক্ষ্মস্যচ পরব্রহ্ম শরীরত্বং"অর্থাত কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাযুক্ত চিত্ ও অচিত্ স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল বস্তুই পর ব্রহ্মের শরীর, উদ্ধৃত বাক্যের প্রমাণ দেখাইবার জন্য "পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যস্য পৃথিবী শরীরং, যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠণ বিজ্ঞানং যস্য শরীরং যঃ আত্মানি তিষ্ঠন্ যস্য আত্মাশরীরং "জগৎ সর্ব্বং শরীরংতে""সোহ ভিধ্যায় শরীয়াত্ স্বাত্" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতি সমূহ দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পৃথিবী প্রভৃতি জড় ও চিত্ বা আত্মা জীব সকলই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের শরীর, তিনি নিজ শরীর হইতে সকল বস্তু সৃষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদির মতে, যেরূপ জগত্ প্রপঞ্চ জীব প্রভৃতি ... কল্পিত মিথ্যা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদির মতে জীব ও জড় প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান জগত্ মিথ্যা নহে, উহাদের ও পৃথক অস্তিত্ব আছে, উহারা সকলেই ব্রহ্মের শরীর, ফলতঃ ব্রহ্ম বস্তুর প্রকারভেদ ও সত্।

অদ্বৈতবাদিগণ রামানুজের ঐরূপ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, চিত্ অচিত্ ও ঈশ্বর ভেদে ত্রিবিধ বস্তুই যদি পরমার্থসৎ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" আত্মা বা ইদমগ্র একত্রবাসীত্, আত্মা বা ইদমেকাগ্রআসীত" এই সকল অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যের তাত্পর্য্য কি? বিশিষ্টাদ্বৈত বাদিগণ ইহার উত্তরে "একমেব ব্রহ্ম নানা ভূত বিদ চিত্ প্রকারং নানা ত্বেনাবস্থিতং" উদ্ধৃত বাক্যটী দ্বারা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বলিয়াছেন, একই ব্রহ্মের নানা ভূত চিত্ অচিত্ প্রকার ভেদ মাত্র তিনিই নানারূপে অবস্থিত, উদ্ধৃত শ্রুতি গুলির ইহাই তাত্পর্য্য নয় যে জীব ও জড় মিথ্যা কল্পনা মাত্র, পরন্তু উদ্ধৃত শ্রুতির ইহাই প্রকৃত ব্যাখা বা তাত্পর্য্য, হইবে যে, প্রলয়াবস্থায় চিত্ ও অচিত্ জীবও জড় অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ, সকলই নামরূপ ভেদ রহিত হইয়া অনির্ব্বাচ্যভাবে ঈশ্বর বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, ঐ অব্যাকৃত অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই ছিল না বা নাই অন্য সকল বস্তুই মায়া কল্পিত মিথ্যা, ঐ সকল উদ্ধৃত শ্রুতির এইরূপ অর্থ নহে।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, "বস্তন্তর বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং" অর্থাত্ মায়াযুক্ত পরমেশ্বর বা ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, শ্রীভাষ্যে আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন, ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা, কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম-চিত্ অচিত্ তাঁহার শরীর, তিনি সর্ব্বদাই সকলের আত্মারূপে অবস্থিত। "আত্মা বা ইদমগ্রআসীত্" এই শ্রুতি দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে, প্রলয়ে সকল বস্তুই ব্রহ্মেলীন ছিল, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, সকলই একীভূত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা জগতের স্বরূপ প্রতিসিদ্ধ হইতেছে, না। জগত্ স্থূলরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম অবস্থিত ছিল, কাজেই সূক্ষ্মচিত্ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই অদ্বৈতরূপে

জগত্ কারণ বলিয়া রামানুজ প্রচারিত মত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে পরিণত হইয়াছে। জগত্‌কে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বা অপৃথক বলিবার তাত্পর্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, জগত্ যেহেতু ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মেরই প্রকারভেদ মাত্র, তখন আর অভিন্ন ব্যতীত কি বলিয়া জগতের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করা সম্ভব হইবে? কাজেই জগত্ ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অভিন্ন বস্তু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতিশ্রুতি প্রভৃতি যে জগতের মিথ্যাত্ব কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহার তাত্পর্য্য অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে জড় বস্তু সর্ব্বদাই বিকৃত হইয়া থাকে, জড়বস্তু বহুকাল একরূপে অবস্থান করিতে পারে না, কাজেই ব্রহ্মের ন্যায় জড় বস্তুকে কি করিয়া প্রকৃত সত্ বলা যাইতে পারে, কাজেই ব্রহ্মাবয়ব জড়বস্তু সকল মায়া কল্পিত নহে, পরন্তু সর্ব্বদা পরিণামী বিকারশীল সুতরাং মিথ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। অদ্বৈত বাদির মতে জীবও ব্রহ্ম পরস্পর অভিন্ন বা এক, পৃথক নহে। বিশিষ্টাদ্বৈত বাদিগণ তাহা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। জীব আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ ত্রয়ের অধীন। ব্রহ্ম কাহারও অধীন নহে। পরন্তু জীব নিত্য বস্তু, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই। প্রলয়াবস্থায় জীব সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে, সৃষ্টিকালে আবার স্থূলরূপে লোকলোচনবর্ত্তী হইয়া পড়ে। জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আমরা যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জানিতে পাইয়াছি, তাহা একটু অন্যরূপ বুঝিতে হইবে। বেদান্ত সার গ্রন্থে বলিয়াছেন "জীব ব্যাপিত্বেন অভেদোব্যপদিশ্যতে" অর্থাত্ জীবব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক, তাই উভয়ের একত্ব ব্যপদেশ হইয়াছে। বাস্তবিক জীব ও ব্রহ্ম এক বস্তু নহে। বহু ২ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নত্ব প্রতিপাদনে আচার্য্য রামানুজ যত্নবান হইয়াছেন।

"এষেহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" "নজায়তে মৃয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা জীবকে নিত্য ও অনু বলা হইয়াছে, এই অনুরূপ জীব বা আত্মা কেবল মাত্র চিত্ত বৃত্তিদ্বারা জ্ঞাতব্য, জীব, ব্রহ্মের অংশও নহে। "অংশো নানা ব্যপদেশাত্"—এই ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা, প্রভা যেরূপ বহ্নির অংশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, বাস্তবিক জীব ব্রহ্মের অংশ নহে। ব্রহ্ম অখণ্ড সর্ব্ব ব্যাপী মহান্ সকল গুণের আকর, ইহাই আচার্য রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী বলেন সগুণ ও নির্গুণ ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। উহার ফলও দ্বিবিধ। সগুণ উপাসনার ফল সগুণ ব্রহ্মে লয়, নির্গুণ উপাসনার ফল ব্রহ্মের সহিত মুক্তের একত্ব লাভ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন।

"পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণ মেব ব্রহ্ম উপাস্যং—
ফলঞ্চ একমেব" অর্থাত্ সকল পরা বিদ্যায় সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য ফলও একই, উল্লিখিত মত সমর্থনের জন্য

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুঃ মুক্তানা মীশ্বরস্যচ।
সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব মেবৈকং তেভ্যঃ দেবে বিশিষ্যতে॥

এই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঈশ্বরও মুক্ত পুরুষ. সমান গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু সর্ব্বকর্তৃত্ব একমাত্র ঈশ্বরে বা ব্রহ্মেই আছে, মুক্ত পুরুষে তাহা নাই, ইহাই মুক্ত ও ঈশ্বরের ভেদ। মুক্ত পুরুষ বিদ্যা বলে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সকল বস্তু এখন কি ভূত ভবিষ্যত পর্য্যন্ত দেখিতে পান, এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত মুক্ত পুরুষের উপহার লইয়া উপস্থিত হন। কামনামাত্র পিতৃ পুরুষগণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী একমাত্র ধ্যানকেই উপাসনা বলেন নাই। তাঁহারা বলেন।

অবিদ্যাঞ্চৈব বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদ স বুদ্ধিমান্।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই জানে, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার হইয়া, বিদ্যা দ্বারা অমৃত অর্থাত্ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেনন অবিদ্যা রূপ কর্ম্ম, আসন প্রাণায়াম অর্চ্চনা দ্বারা মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অন্তে মুক্তিফল পাইয়া থাকেন,

অমরত্ব লাভ করিতে পারেন, ধ্যান ধারণা ইহারই কারণ। অদ্বৈতবাদী ধ্যান ধারণাকেই প্রধানতঃ মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত বাদির মতে অর্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্ম ও ধ্যান-ধারণা উভয়ই মিলিতরূপে মুক্তির কারণ। মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর তুল্য গুণবান হইবে, ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে, মুক্তের নির্গুণ হওয়াই যুক্তি সঙ্গত হইত। পরন্তু আমরা সে সকল মুক্ত পুরুষের বার্ত্তা, ইতিহাস পুরাণে পাইয়াছি। প্রত্যক্ষতঃ তাঁহারা কেহই নির্গুণ নহে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অদ্বৈত মতে মুক্তগণ নির্গুণ হইয়া পরিত। অদ্বৈতবাদী তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমি "অদ্বৈতবাদ বেদান্ত দর্শন" প্রবন্ধে, ব্যক্ত করিয়াছি। আর বিরক্ত করিব না, অদ্য বিশ্রাম লইলাম।

শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

স্বচ্ছ সাম।

আমি যারে ভালবাসি সে রয় মনে
সদা সুর-সঙ্গত, কুসুম বনে!
সে আমারি প্রাণে মিশে' রয় সদা অনিমিষে—
তারি সুর, সুরতি সে, বীণায় ধ্বনে!
ঝঙ্কারে ফুটে ফুল, কামনা গুলি
—সুযাপিত সৌরভ আপনা ভুলি',
সমীরণ বহে তায় ছন্দ ও গীতিকায়—
বরণে সুপ্রভা পায় প্রকাশ ক্ষণে!
আমি যাঁরে ভালবাসি সে রয় মনে!

—o—

সে জীবিত-প্রিয়তম, জানি না সে কি
সে বিহনে মোরে যেন অজীব দেখি!
সে আমাতে আছে, তাই জগত পরশি পাই
সুরে ভাব সমুঝাই, কাহিনী লেখি!
কোনো রূপ নাহি, প্রিয় বরণ বিনা,
নর কিবা নারী সেই তাহা জানি না!
জানি শুধু সে আমারে দিল রূপ উপচারে
জাগিনু অহঙ্কারে বিশ্ব পেখি'।
সে বিহনে মোরে যেন অজীব দেখি!

—o—

হই যদি কোনো ক্রমে আত্মহারা
পারি যদি ভুলিবারে স্বার্থ সারা
মিলিবারে তার সনে পারি নিরজন মনে
অনন্ত-অমুখনে ক্ষণের পারা!
বুঝিয়াছি অনুমানে প্রাণের দেশে
সেই আর আমি আছি এক নিমেষে!
মিলনে সে স্বত-সুর মুরছিত অবিদুর
লয় যাহে সুরপুর চন্দ্র-তারা!
হই যদি কোনো ক্রমে আত্মহারা!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ ও গবর্ণমেণ্ট।

কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রয়োজন আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই অনুসন্ধান করিতে হয়। যদি বিষয়টি প্রতিপিৎসিত হয় তবে তাহার আলোচনা দ্বারা দেশের ও দশের উপকারের আশা করা যায়। নতুবা নিরর্থক আলোচনা দ্বারা আলোচকের মূর্খতা প্রকাশ পায় ও তাহার প্রকাশক ও সমর্থনকারীরা সর্ব্বত্র হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট বা দেশের জন সমাজ কি করিবেন, এবং কিরূপে তাহাকে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহার বিচারের পূর্ব্বেই,— এতদ্দেশে সরকার ও গণ্যমান্য জন সমাজে অনুমোদিত তাদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী

বর্ত্তমানে, দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রয়োজন আছে কি না, তাহারই বিচার করিতে হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রের দুইটি প্রয়োজন দেখা যায়। চরক বলেন, "স্বস্থস্য স্বাস্থ্য রক্ষণম্, বিকারস্যচ প্রশমনম্" (১) দেশের সুস্থ জন সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা (২) ব্যাধির চিকিৎসা। প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদে এই দুইটি বিষয় একই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ চিকিৎসাবিভাগ পৃথক করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই দুইটি প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিতে বর্ত্তমানে এদেশে তাহার উপযোগিতা আছে কি না? তাহার মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের উপযোগিতা প্রথম আলোচনা করিব।

অনেকে বলেন বর্ত্তমান কালে ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দেশের সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যহানীর কারণ "জীবাণু;" তাহাদের সত্তা, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির জ্ঞান বা প্রতিষেধের কোন উপায় আয়ুর্ব্বেদে না থাকায়, তাহার তথাকথিত স্বাস্থ্যতত্ত্ব বর্ত্তমান বিজ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্বের তুলনায় নিরর্থক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবাণুবাদ যেমন ব্যাধ্যুৎপত্তির প্রতি অদ্বিতীয় কারণ বলা হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু অদৃশ্য ক্রিমির ব্যাধ্যুৎপত্তির প্রতি কারণতা আয়ুর্ব্বেদে অস্বীকৃত হয় নাই। তবে তাহাকে একমাত্র বা প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এই জন্যই ব্যাধ্যুৎপত্তি নিবারণ বা ব্যাধি প্রতিষেধের জন্য জীবাণুর আকৃতি প্রকৃতির জ্ঞান অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে কতগুলি ব্যাধির সংক্রামকতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং, জনপদোধ্বংসনীয়' ব্যাধিতে একইকালে বহুব্যক্তি একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। এই সব ব্যাধির কতকগুলির কারণ জীবাণু এতক আবিষ্কৃত হইয়াছে, আবার কতকগুলির হয় নাই। ভূমি, জল ও বায়ু এই সব ব্যাধির বীজ বাহক, তাহাও আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ জীবাণুর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ মনে করেন নাই।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। আয়ুর্ব্বেদ কেন, জগতের যে কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানই স্বীকার করিবেন যে যেমন বীজ, ঋতু, জল ও ভূমির যথাযোগ্য সংযোগ হইলে শস্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি ব্যাধ্যুৎপত্তির প্রতিও বীজ, ভূমি জল লোক আদির যথাযোগ্য সংযোগের প্রয়োজন আছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জীবাণু ব্যাধির বীজ ও মানবাদির শরীরই ব্যাধির ভূমি। এখন ব্যাধ্যুৎপত্তি হইতে না দেওয়া কল্পনা করিলে প্রধান ভাবে দুইটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়;—এক শরীরে ব্যাধির বীজ প্রবিষ্ট হইতে না দেওয়া—আর ভূমি স্থানীয় শরীরকে উষর করিয়া সেই বীজের প্রয়োগ হইতে না দেওয়া। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ প্রথম উপায়ই প্রধান ভাবে অনুশীলন করিতেছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি ব্যাধির বীজ এতক আবিষ্কৃত হইয়াছে, কাহারও বা এতক আবিষ্কৃত না হইলেও অনুমান দ্বারা তাহাদের সত্তা অবগত হইতে পারা যাইতেছে এবং কতকগুলি ব্যাধির বীজ এতক আছে কিনা নির্ণীত হয় নাই। এই সব জীবাণুগুলি পাশ্চাত্য মতে বীজ স্থানীয়। ইহারা চর্ম্মচক্ষে অদৃশ্য, ও মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ সন্তান প্রসবশীল। এবং প্রতি ব্যাধিতের শরীর হইতে এত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে যে, সুবিধা হইলে শত শত লোকের শরীরে তাহা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত করিতে পারে। কিন্তু তাহা সকল শরীরে প্রবেশ করা মাত্রই কাজ করিয়া থাকে, ইহা সম্ভব কেহই স্বীকার করিবেন না। আমেরিকার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, তথাকার শতকরা ৭০।৮০ জন ব্যক্তির শরীরে যক্ষ্মা ব্যাধির জীবাণুর সত্তা পরীক্ষায় পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে শতকরা ২।৩ জনও উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এতদ্দেশের স্বাস্থ্য পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শতকরা ৮৫ জন লোকের শরীরে 'হুক' পোকার সত্তা আছে; কিন্তু তাহার

মধ্যে কয়জন উক্ত পোকার উপসর্গে জড়িত হয়! সম্ভা যক্ষ্মা-বীজ সম্বন্ধেও এদেশে প্রতি শরীরের রক্ত পরীক্ষা করা যাইত, তবে অধিকাংশের শরীরেই তাহার বীজের সত্তা প্রমাণিত হইত। কিন্তু সকলেই কি সমানভাবে আক্রান্ত হয়? সুতরাং সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, শরীর যদি অনুপযোগী হয়, তবে প্রবিষ্ট জীবাণুও কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই প্রকার অদৃশ্য, এবং যাহাদের অনবরত আমাদের শরীরে প্রবেশের সুবিধা আছে—তাহাদের সংস্পর্শে না আসা দুই চার জন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হইলেও জন সাধারণ তাদৃশ জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ জন সাধারণের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। কতিচিৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্রের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এই সব অদৃশ্য জীবাণুর হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তারা যে বিধান দিয়াছেন, এবং আমাদের দেশের গণ্য মান্য কৃতী ধন্বন্তরী কল্প পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যে ব্যবস্থা করেন, তাহা বদ্ধমান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইলেও আপামর সাধারণের জন্য অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ জনতার জন্য নহে। আমি জানি, গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ‘হুক্” পোকার পরিত্রাণ কল্পে ৮৲ আট টাকা মুল্যের বুট জুতা সর্ব্বদা অন্ততঃ পায়খানা যাইবার কালীন পরিধান করিয়া থাকিতে ও ৪০০।৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া পায়খানা (Auqa Privy) করিয়া তাহাতে মল ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদেরই জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য চিকিৎসক যক্ষ্মার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রত্যেককে দোতালায় বাস করিবার জন্য ও প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ মাংস খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা সকলেই জানেন ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বদা মশারি খাটাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের সম্ভা পনর আনা লোকই এই সব বহুমূল্য উপদেশ পালনের যোগ্যতা রাখে না। যে দেশের পনর আনা লোকই আজকাল একরূপ বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ, তাহাদিগকে ৮৲ টাকা মূল্যের বুট্ জুতা পরিতে বা সর্ব্বদা মশারি খাটাইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া কতদূর নিরর্থক, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। যে দেশের অধিকাংশ লোকের শাকান্ন সংগ্রহ করার, বা মাথা লুকাইবার জন্য তৃণ কুটির নির্ম্মাণ করার অধিক ক্ষমতা নাই, তাহারা দোতালায় বাস করিয়া পুষ্টিকর আহার করিবে এরূপ আশা করা যায় না। এতাদৃশ যে সব উপায় জীবাণু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা যথারীতি প্রতিপালন করিলেও অনেক সময় তাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রকার বীজ-স্থানীয় জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার চেষ্টা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ বিবেচনায়ই প্রাচ্যগণ তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়ার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অপর যে উপায়টী আছে অর্থাৎ শরীরটা বীজের অনুপযোগী করা তাহাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। এবং সেইজন্যই প্রত্যেক ব্যাধি কি কি শারীরিক অনিয়ম হইতে হইয়া থাকে তাহারই অনুশীলন প্রধান ভাবে করিয়াছিলেন। যাহাতে এই সব নিয়ম জন সাধারণের প্রতি বাধ্যকর হয়, তজ্জন্য প্রতি কার্য্যেই তাঁহারা ঐ নিয়মগুলি ওতঃপ্রোতঃভাবে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়াইয়া বিধি ও নিষেধের ছড়াছড়ি করিয়াছিলেন।

আমরা একটা উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। আজকাল আমাদের দেশে যক্ষ্মা-রোগের বিশেষ আধিক্য দেখা যাইতেছে, এই ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র প্রায়ই অসাধ্য, সুতরাং এই ব্যাধি যাহাতে দেশে বিস্তার করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার কারণ একপ্রকার জীবাণু বলেন। ঐ জীবাণু ব্যাধিত ব্যক্তির কাস আদি হইতে অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রান্ত হইয়া তাহাকেও ব্যাধিত করিয়া থাকে। ইহার বাহক বায়ু সুতরাং তাহার প্রতীকারের প্রথা অতি দুরূহ।

এ অবস্থায় পাশ্চাত্যগণ কি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন তাহা জানি না তবে প্রাচ্যগণ এই ব্যাধিকে সংক্রামক বলিলেও শারীরিক অনিয়মই এই ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রাচ্যগণ ব্যাধিকে সংক্রামক বলিয়া একটু সাবধান থাকিতে বলিয়াছেন মাত্র; কিন্তু ব্যাধির উৎপত্তি 'সাহস', সন্ধারণ, বিষমাশন ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়াদি কারণে শারীরিক ক্ষয়, এই চারটি কারণের কোন একটি উপসেবা না করিলে কখনও সহস্র জীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও হইতে পারে না, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণও স্বীকার করিতে বাধ্য। আমেরিকার ষ্টেট স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ তত্রত্য জনসমাজের অধিকাংশ লোক ক্ষয়ের জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও শতকরা দুই একজন ব্যতীত আর কেহ উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। এদেশের স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টেও জানা যায় যে দেশের অধিকাংশের শরীরে হুক ক্রিমি থাকিলেও তাহার আক্রমণের ফল অতি অল্প লোকের শরীরে প্রকাশ পায়।

সুতরাং ইহা স্থির যে, পাশ্চাত্যগণ জীবাণুকে যেমন প্রধান হেতু বলিয়া থাকেন, তাহা হইতে পারেনা। বরং শারীরিক অনিয়মই ব্যাধির প্রধান কারণ, এইরূপ প্রাচ্যগণের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। ব্যাধির বীজ বা জীবাণুর যে প্রকার প্রজনন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শরীর উপযোগী হইলে ব্যাধি বীজের অভাব কদাচ হয় না। শারীরিক নিয়ম রক্ষা জীবাণু হইতে আত্মরক্ষা চেয়ে অনেক সুগম। এবং পাশ্চাত্য নির্দ্দিষ্ট পন্থা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এই জন্যই আমরা বিদ্বজ্জন সমাজকে একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি যে, এখন গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত স্বাস্থ্যবিভাগের মশামারিতে কামান পাতিবার চেষ্টায় যে পরিমাণ দেশের অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে তাহা অপেক্ষা অল্পব্যয়ে দেশের জন সমাজকে আমাদের দেশের উপযোগী স্বাস্থ্য পালনবিধি বুঝাইয়া দিলে কত সুন্দর কাজ হইতে পারে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের বিধি অনুসারে প্রতি জেলা বোর্ডকে স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য যেপ্রকার ব্যয় করা স্থির হইয়াছে তাহার একটু নমুনা এই ক্ষুদ্র রাজসাহী জেলার মঞ্জুরী ব্যয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

বিষয়	বার্ষিক নিম্নতমব্যয়	বার্ষিক উচ্চতমব্যয়
১। ১জন হেল্থ অফিসার	৩৬০০৲	৬০০০৲
২। ৩টি মহকুমার ৩জন ডেপুটি	১৮০০৲	৩৬০০৲
৩। ২৭টি থানায় ২৭জন সেনিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর	৬৪৮০৲	৬৪৮০৲
৪। হেল্থ অফিসারের পাথেয় ব্যয়	১৫০০৲	১৮০০৲
৫। ডিপুটির পাথেয় ব্যয় নির্দ্দিষ্ট	৫৪০৲	৫৪০৲
৬। সেনিটারীইন্‌স্‌পেক্টরের পাথেয় নির্দ্দিষ্ট	১৬২০৲	১৬২০৲
৭। ১২টি দাতব্য ঔষধালয়ে স্বাস্থ্যবিভাগের কাজের জন্য অতিরিক্ত	১৪৪০৲	২১৬০৲
৮। ঐ কম্পাউণ্ডার	৭২০৲	৭২০৲
৯। অফিসের কেরানী	৩৬০৲	৪৮০৲
১০। ২জন পিয়ন	১৯২৲	১৯২৲
১১। অন্যান্য	২৫০৲	২৫০৲
	১৮৫০২৲	২৩৮৪২৲

ইঁহারা সংক্রামক ব্যাধির নিবারণকল্পে প্রভূত চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা কতটুকু উপকার সাধিত হয়? দেশে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে তাহার বোধহয় তিন চতুর্থাংশ এক জ্বর ব্যাধিতেই হয়। এই বিভাগের জন্য যে প্রকার অর্থব্যয় হয় সম্ভব তাহাদ্বারা দেশের অনেকটা জল দৈন্য নিবারিত হইতে পারিত। এখন বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তাও নাকি এই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে মশা তাড়াইবার পূর্ব্বে দেশের হাজা মাজা জলপ্রণালীর সংস্কারই প্রধান আবশ্যক মনে করেন।

আয়ুর্ব্বেদে দেশ, কাল, বয়স, অবস্থা সত্ত্ব স্বাস্থ্য ও প্রকৃতিভেদে যে প্রকার আহার বিধান করা হইয়াছে, যদি তাহা অধিকাংশভাবে চেষ্টা করিয়া মানব প্রতিপালন

করে, তবে সহস্র সহস্র জীবাণুর সত্তা চতুর্দ্দিকে থাকিলেও নীরোগী ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং অদৃশ্য জীবাণুর পিছে পিছে ঘুড়িয়া বেড়ান হইতে আমাদের স্ব স্ব আহার বিহারের নিয়ম প্রতিপালন অনেকটা সুগম। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে এই দরিদ্রদেশের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে তাহারও নিবারণ হইতে পারিবে সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়া দেখিলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষ উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন আছে কি না তাহাই বিচার করিব। আমাদের দেশে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী অধিকাংশ লোকের এক বেলা আহার জুটাই কঠিন, এ অবস্থায় যত অল্প খরচে এদেশের লোক চিকিৎসা পায় তাহা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা গরীবের উপযোগী নহে; ৫।৭ টাকা সপ্তাহের ঔষধ দরিদ্রের দেশে কয়জনে খাইতে পারে। এই সব দুর্দ্দশা দেখিয়াই দুই একটী আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান নাম মাত্র লাভ লইয়া ঔষধ বিক্রয়ের কারখানা খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও কোন কোন ঔষধের তোলার দাম চার পাঁচ টাকাও লইয়া থাকেন। সেই স্থলে ডাক্তারী মতে এমন কোন ঔষধ বোধ হয় নাই যাহার আউন্স ১০৲।১২৲ টাকা বিক্রয় হয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদের এই তর্ক নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ওজন হিসাবে পাশ্চাত্য প্রাচ্য ঔষধের মূল্যের তুলনা করিলে ঐ প্রকার ফলই হয় বটে, কিন্তু প্রতি রোগীর প্রতি ব্যবহৃত ঔষধের তুলনায় দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা প্রাচ্য চিকিৎসায় বহু অল্প অর্থব্যয় হইয়া থাকে। আমরা এই সিদ্ধান্ত পক্ষপাতী হইয়া করিতেছি না, দেশের ভিন্ন ভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তুলনা করিয়া আমরা উক্ত সিদ্ধান্ত সুন্দররূপে প্রমাণ করিতে পারিব। এই বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় খুব কমই আছে। রাজসাহী জেলায় করচমাড়িয়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহার দুই বৎসরের রোগীর সংখ্যা ও খরচের হিসাব নিম্নে লিখিত হইল।

সাল	মোটরোগী	নূতনরোগী	আরোগ্য	দৈনিকরোগী	মোটব্যয়		দৈনিকব্যয়	প্রতিরোগীর দৈনিকব্যয়
					ঔষধ	বেতনাদি		
১৩২৭ সাল	১২২৪০	২১৯৮	১৮৯৪	৩৭॥০	৩১০৲	৩৪০৲	১৸১০	প্রায় ৯ পাই
১৩২৯	১০৭৫৫	১৭৫৮	১৫৫০	২৯॥০	ঐ	ঐ	ঐ	প্রায় /০ আনা

পৃথক রোগির সংখ্যা	১৩২৭ সাল	১৩৩২ সাল
জ্বররোগী	১৫৫৪	৭৬১
কাসশ্বাস	১৬১	১২১
অজীর্ণ আমাশয়, গ্রহণী	৩১৮	৪২৮
জ্বরাতিসার	৮২	১০২
যক্ষ্মা	২২	১৯
কলেরা	২৩	১৯
অন্যান্য	২৮	১০৫

মান্দ্রাজে ভেপারী পল্লীস্থিত আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচের যে হিসাব মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, প্রত্যেক রোগীর জন্য দৈনিক, ব্যয়ের গড় মাত্র ৮ পাই হইয়াছে। এবং উক্ত সমিতি পাশ্চাত্য পদ্ধতি দাতব্য চিকিৎসালয়ের কয়েকটীর খরচের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রতি রোগীর দৈনিক খরচের গড় তিন আনা হইতে ছয় আনা দুই পাই পর্য্যন্ত হইয়াছে।*

আয়ুর্ব্বেদে অনেক বহুমূল্য ঔষধ থাকিলেও তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ কখনও করিতে হয় না। এবং অনেক ব্যাধিতেই দেশীয় অযত্ন সুলভ বৃক্ষ লতাদির সাহায্যেই বেশীরভাগ চিকিৎসা সম্পন্ন করিতে পারা যায়; এই জন্যই প্রাচ্য চিকিৎসার খরচের অনেক ন্যূনতা হইয়া থাকে। আজকাল দেশের যেরূপ অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতি অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থের অনাটন জন্য দেশের এই অচিকিৎসায় মৃত্যুর তর্ক আয়ুর্ব্বেদের দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিরই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আজকাল যে পরিমাণ অর্থব্যয়ে যতলোকের চিকিৎসার আনুকূল্য করা যাইতেছে, সেই পরিমাণ ব্যয়েই তাহার চতুর্গুণ লোকের সহায়তা হইতে পারিবে।

এখন এক তর্ক হইতে পারে যে, এইরূপ অবৈজ্ঞানিক (?) চিকিৎসায় দেশের অনেক প্রাণীকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। এরূপ তর্ক নিতান্ত ভিত্তিহীন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার বিশেষ বিশেষ ব্যধির সফলতা সম্বন্ধে অধিকাংশ জনমত অনুকূল থাকিলেও আমরা বর্ত্তমান কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য দাতব্য ঔষধালয়ের অনারোগ্যের হার তুলনা করিয়া তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারিব। উক্ত মান্দ্রাজ কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ—ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট আয়ুর্ব্বেদীয় হস্‌পিটালে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা একজনেরও কম। এবং সেইস্থলে মান্দ্রাজের দুইটী পাশ্চাত্য হস্‌পিটালে শতকরা ৭ হইতে ১০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয়ে বর্ত্তমানে উপযুক্ত শিক্ষার স্থলের অভাবে কেবল মাত্র কায়চিকিৎসা অনুশীলিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষার স্থল হইলে অল্পব্যয়ে সমস্ত বিভাগেই সুন্দররূপে চিকিৎসা চলিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

এই দরিদ্রের দেশে অনেক লোক অর্থের কৃচ্ছ্রতায় ব্যাধি হইলেও সুচিকিৎসার অভাবে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এবং বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টেরও যে প্রকার অর্থের অনাটন তাহাতে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ও বহু পরিমাণে হইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় যদি গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রণালী অনুমোদন করেন এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন তবে স্থানে স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীন আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে অল্পব্যয়ে অধিক লোকের উপায় করিতে পারিবেন। কত অল্পব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় হসপিটাল চলিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং রাজানুমোদিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা থাকিতেও যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

* মান্দ্রাজদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্ট Appendix I. 99 পৃঃ।

সেনহাটীতে বিষ্ণুমূর্ত্তি।

বিষ্ণু বলিতে সেকালে কোন দেবতাকে বুঝাইত—প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" বলিয়া কাহাকে অভিনন্দিত করিতেন তাহা স্থির করিয়া বলা একরূপ অসম্ভব। আমাদের কিন্তু এখন 'বিষ্ণুমূর্ত্তি' কল্পনা করিতে বসিলেই মনে পড়িয়া যায় নিজ গৃহ দেবতা শালগ্রাম চক্র,

প্রতিবেশীর বাটীর কৃষ্ণ ঠাকুর, আর গ্রাম-প্রান্ত-স্থিত পল্লীর 'বাসুদেব বিগ্রহ'। সুতরাং যখন আমরা শুনিতে পাই যে কোন স্থানে কূপ বা পুষ্করিণী খননকালে মৃত্তিকা নিম্নে এইরূপ কোন বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন তখনই আমরা তীর্থযাত্রীর আগ্রহ লইয়া সে বিগ্রহপানে ছুটীয়া যাই—ভক্তি নম্রচিত্তে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার বিষয়ে খুটীনাটী সব কথা জানিতে চাই—আর ফিরিয়া আসিয়া তীর্থ প্রত্যাগতের ন্যায় বিনীত ভাবে সে বিগ্রহ-কাহিনী দশজনকে বলিয়া গৌরব বোধ করি।

সম্প্রতি গত ফাল্গুন মাসে আমার বাস পল্লী খুলনা জেলার সেনহাটীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত গোপাল পাড়ায় একটী পুরাতন পুষ্করিণী খনন কালে একখানি নিখুঁত পাষাণময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী একখানি ২'—৭"×১'—৩" শূর্পাকৃতি কষ্টি পাথরে উৎকীর্ণ। শুধু মূর্ত্তিটী ১'—৯" দীর্ঘ। মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, গলদেশে কণ্ঠমালা, কৌস্তুভ মণি, পরে উত্তরীয়, নিম্নে আনাভি যজ্ঞোপবীত, জানুদেশাবলম্বী বনমালা। বামাধঃ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধে চক্র, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা দক্ষিণাধে পদ্ম-শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের পদনিম্নে যোড় হস্ত, স্তব পরায়ণ দুইটী উপবিষ্ট সাধক মূর্ত্তি। মূল মূর্ত্তির বামে বিণাধারিনী সরস্বতী, দক্ষিণে পদ্ম হস্তা লক্ষ্মী, সরস্বতীর বামে ও লক্ষ্মীর দক্ষিণে দুইটী কিরীটধারী মূর্ত্তি—'পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি।' এই মূর্ত্তির উপরে হস্তী, তাহার উপরে লম্বালম্বি ভাবে একটী সিংহ, সিংহের উপরে আবার প্রকাণ্ড হস্তী, তাহার উপরে দুইটী ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মস্তকের উপর দিকে চালের উভয় পার্শ্বে পক্ষধারী বিদ্যাধর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি ব্যতীত বিগ্রহের আশে পাশে উপরে নীচে নানাকারে কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুমূর্ত্তি একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন। মূল পাথরখানির নিম্নে কীলক আছে; কিন্তু উহা যে পাদপীঠে সংবদ্ধ ছিল সেখানি পাওয়া যায় নাই।

এ বিগ্রহ ঠিক কত দিনের, কাহার দ্বারা কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া কোথা হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিল বহু অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে 'যশোহর খুলনা'র ইতিহাসকার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র অনুমান করেন—'পাঠান বিজয়ের প্রথমভাগে মুসলমান বিজেতৃগণের আক্রমণ ভয়ে, কারণ বশতঃ বা অকারণে অনেক স্থানে হিন্দু গৃহস্থগণ এই জাতীয় গৃহ বিগ্রহগুলিকে জলমধ্যে বা মৃত্তিকা নিম্নে লুকায়িত করিয়া রাখিতেন, বাসভূমির পরিবর্ত্তনে বা নানা বিপর্য্যয়ে উহারা মূর্ত্তি উঠাইয়া পুনরায় পূজা প্রবর্ত্তন করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই। কালক্রমে সেই সকল মূর্ত্তিই লোক চক্ষু গোচরীভূত হইতেছে। মূর্ত্তিগুলির বয়স সহস্র বৎসরের কম হইবে না।'।

প্রবীন ঐতিহাসিকের এ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াই আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মায়ের ছেলে।

মৃত্যুকে একথা বলিতে বলিতে মৃত্যু যে কি তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন—যে ব্রহ্মময়ীর তিনি সন্তান পরিণামে তাঁহাতে মিশিয়া যাওয়াই একমাত্র সিদ্ধান্ত। তাই তিনি গাইলেন,—

প্রাসাদী সুর—একতালা।

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে?
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্যগণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে॥

এক ঘরেতে বাস করেছি, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে সব সময় হ'লে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥"

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু এ সংসার চক্রের নিস্পেষণে ভক্ত বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁর আর দিন চলে না। দারিদ্র—দারিদ্র! চারিদিকে কেবল নাই নাই। তা ভগবানই ত বলিয়াছেন—"যে করে আমার আশ,—তার করি সর্ব্বনাশ"। সংসার আবল্যে মাকেও বুঝি ভুলিতে বসিয়াছেন। সংসার তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'অব সব বিষ সম লাগয়ে মোয়।' একদিন অসহ্য হওয়ায় মায়ের কথা মনে পড়িল, অমনি কাঁদিয়া বলিলেন,

মূলতান—একতালা।

"তারা কোন অপরাধে দীর্ঘ মিয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল?

প্রাতঃকালে উঠি কতই খাটুনা খাটি (শ্যামা মাগো)
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল; হয়ে অর্থ অভিলাষী
ভ্রমি দিবানিশি, সর্ব্বনাশী জানিশ কতই ছল॥

এনে ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে (শ্যামা মাগো)
দিবানিশি জ্বলে দুঃখানল; আমার বাঁচিতে সাধ
নাই, বাসনা সদাই—ফণী ধরে' খাই হলাহল॥"

মা সন্তানের দারিদ্র ঘুচাইলেন, কিন্তু তাহার ফল কি হইল? হায় মায়ের ছেলে বাসনার দাস হইলেন। যত পান, তত আরো চা'ন! "তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে"। কিন্তু একদিন চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন আমি এ কি করিতেছি! কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচে অভিলাষ আমার! বাসনা-রক্তবীজ কেবল বাড়িয়াই, চলিয়াছে! এখন মনে হয় এজীবন চিরস্থায়ী হউক—ভোগের মাত্রা বাড়িতে থাকুক। এ কি করিলি মা? আর মা রক্তবীজ নাশিনী—তোর ঐ অসির আঘাতে দানবকুল সমূলে ধ্বংস কর। মা,—

মূলতান—আড়াঠেকা।

"ধনাশা জীবন আশা গেল না,—সকলই গেল।
কৌমার যৌবন গত,—জরা আগমন হল॥

ছিল না মা জলপাত্র, কর পাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জল পাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে না, দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হ'ল বাড়া,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা—হয় সে ভাল॥

সমান বয়সী যত প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব,
আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে ভ্রান্তি রহিল॥

চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি,—চরণের গতি;
আছে কান্তা অভিলাস, অদর্শনে আসার আশ,
দরশনে জরা বলে,—কি দায় হল॥

তোমার মায়ায় গুণে পদ্মযোনি পঞ্চানন,
ক্ষীরোদ শায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল,
শ্রীরাম দুলালে ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছাপূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল॥"

মা, চাই না আর এসব। আর তোর মায়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখিস নে মা। তোর ঐ রাঙ্গা চরণে স্থান দে।

মিশ্র—একতালা।

"ব্রহ্মময়ী মহামায়া (মা)
ব্রহ্মাণ্ড উদরী তুমি সিদ্ধেশ্বরী—(বিশ্বেশ্বরী)
শঙ্করী কিঙ্করে কর গো দয়া॥

সংসার সাগর অকূল পাথার,
মীন রূপে তাহে ভ্রমি নিরন্তর,
রবি সুত তাহে হয়েছে ধীবর,
জঞ্জাল জালে ঘিরে রেখেছে কায়া॥

বাসা করে থাকা দিনেক, দুইদিন চারি,
মিছে আশার আশে ভেবে চিন্তে মরি,
ভূতেরি বেগারী, বেগার খেটে মরি,
আমায় চরণ তরী দাও মা অভয়া॥"

আমার কি গতি হইবে মা?

মিশ্র—একতালা।

"কুল কুণ্ডলিনী আমায়, অকূলেতে ভাসাইলে।
মা হয়ে মা এই করিলে,—সন্তানে সন্তাপ দিলে ॥

ছিলেম বা কি,হলেম বা কি, আরো বাকি আছে বাকী,
প্রাণমাত্র আছে বাকি,—তাও কিভাবে রাখিলে ॥

নিজ সুতের এই মিনতি, ঘুচাও গো মা এ দুর্গতি,
নামে রেখ না অখ্যাতি, নিবেদি চরণ কমলে ॥

এত করিয়াও তো মায়া পাশ কাটে না! সে এমনি দুশ্ছেদ্য! হায়,—

খট্—ঝাঁপতাল।

"এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি করিতে পারে ॥

বিল করে' ঘুনী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে ॥

গুট পোকায় গুটী করে, পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে ॥"

মাগো, তোর মায়ার বশীভূত হইয়া কেবল

প্রসাদীসুর একতালা।

"মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছুই সম্বল নাইকো গেঁটে ॥

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥

পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেও শোনে না, দিন তো আমার গেল ঘেটে।

যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি মত ধর্‌তে চাই মা, কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্ম ডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্ম-রন্ধ্র যায় যেন ফেটে ॥"

তখন আবার ভক্ত ভাবিলেন না, আমার এ মায়া বন্ধনের জন্য আমিই তো দায়ী! মাকে কেন দোষ দেই?

মূলতান—একতালা।

"দোষ কারু নয় গো মা।
(আমি) স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ॥
ষড় রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল মনোরমা ॥

আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী, বিগুণ করেছি স্বগুণে; কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে;

বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন
নাহি হয় রক্ষে, তবে তরি চরণ তরী দিলে,
ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা ॥"

আবার ভাবিলেন আমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় যে আমার দোষ ভাবিতেছি? সকলইত তার ইচ্ছায় ঘটিতেছে তখন গাইলেন—

প্রসাদীসুর—একতালা।

"মন গরিবের কি দোষ আছে?
তুমি বাজি করের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে"
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমিই দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥

প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাট্‌না কেটেছে।
মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে ॥"

মা ছাড়াত আর কেহ এ মায়া কাটিতে পারিবে না, তাই মাকে বলিলেন;—

লুমঝিঁঝিট—একতালা।

"ফিরিয়েনে তোর বেদের ঝুলি।
ওমা মজাস্‌নে আর আমায় কালী॥

ভবের খেলা খেলতে ভবে, আমায় একা পাঠাইলি।
(ওমা) কি ভাব ভেবে বল্‌না শিবে, ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি॥

মায়ায় মজে বেদে সেজে' বারে বারে যতই খেলি।
এম্‌নি অধঃপেতে ঝুলি—খেলার জিনিস হয় না খালি॥

মনে করি খেল্‌ব না আর, ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
এম্‌নি কুহকিনীর কুহক, আবার তার কুহকে ভুলি॥

এমন সর্ব্বনেশে মায়া, মহামায়া কোথায় পেলি?
(আমি) আর যে পারিনে শিবে, বলতে আত্মারামের বুলি॥

প্রেমিক বলে কি বলে' মা, তনয়ে বেদে সাজালি।
(ওমা) দয়াময়ি, দয়াময়ী নামে কালী, কালি দিলি॥"

কিন্তু আমি যে দিবানিশি মা মা বলিয়া ডাকিতেছি তা কি মা শোনেন না? ছেলে এবার মায়ের উপর ঠেস দিয়া আব্দারের সুরে বলিতেছেন,—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তার কপালেই বিপদ ঘটে॥

হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়ায়েছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥

সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥

প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পলাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে' প্রাণ ত্যাজি জাহ্নবীর তটে॥"

আবার বিচার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আকুল ক্রন্দনে বলিয়াছেন,—

মালসী—একতালা।

"আনন্দময়ী হয়ে গো তারা, নিরানন্দে রেখ না গো॥
ওদুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানেনা।
(ওগো) তপন তনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না গো॥

অহরহ নিশি দুর্গানামে ভাসি, তবু দুখ রাশী গেল না।
(ওগো) আমি যদি মরি, ও হর সুন্দরী, দুর্গা নাম কেউ আর লবেনা গো॥

ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
(ওগো) অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে—স্বপনেও তাত জানিনা গো॥"

সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গে দিশাহারা হইয়া ভক্ত গাইলেন,—

সুরট—আড়াঠেকা।

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী।
মায়া ঝড়, মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥

একে মন মাঝি আনাড়ি, তাহে ছয়জন কুজন দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি—হাবু ডুবু খেয়ে মরি॥

(আমার) ভেঙ্গে গেছে ভক্তির হাল,
ছিড়ে গেল শ্রদ্ধারই পাল,
নৌকা হল বাঙ্কাল, কিসে কি করি;
উপায় না দেখি আর, নীল কমল ভেবে সার,
সাগরে দিয়েছে সাতার—
দুর্গা নামের ভেলা ধরি॥"

আবার গাইলেন,—

সুরট মল্লার—একতালা।

"(মাগো) আর কত কাল এ ভব যন্ত্রনা।
যাতায়াত ক্লেশ, হবে নাকি শেষ,
জনমে জনমে আর যে পারি না॥

ছেঁড় কর্ম্মফাঁস, জীবনের ত্রাশ,
অশান্তি উদ্বেগ ভাবনা হুতাশ,

কর দূর মায়া, দে মা পদ ছায়া,
মিটেছে আমার সংসার কামনা ॥

দেখি মা নিয়ত, আসে যায় কত,
জলবিম্ব সম ফোটে ডোবে শত,
গ্রহ তারা খসে, পুন চাঁদ হাসে,
সে হাসিতে মন প্রবোধ মানে না ॥

কেঁদে কেঁদে হায় হয়েছি পাষাণ,
জীবন যেন গো বিজন শ্মশান,
সয়েছি বিস্তর, বিপদ দুস্তর,
সকলি ত জান তুমি ত্রিনয়না ;

(আর) কাজ নাই খেলা, পড়ে এল বেলা,
চাহি না জিতিতে (এবার) হারিবার পালা,
ধীরে ডোবে মোর অদৃষ্টের ভেলা,
হায়রে পাষাণি, তোরি ত ছলনা ॥

—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পুনরায় গাইলেন—

কাফি—ঝাপতাল।

"চরণ ধরে আছি পড়ে' একবার চেয়ে দেখিসনে মা।
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা ॥

একি খেলা খেলিস ঘুরে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জুড়ে ;
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে' ডাকে মা মা ॥

হাতে মাতোর মহা প্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হাহাঃ অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্ত ধারা ;
এত দিন কালী ভীমা, তারি পূজা করেছি মা—
পূজা আমার সাঙ্গ হল, এখন মা তোর অসি নামা ॥

আয় মা অভয়া রূপে, স্মিত মুখে শুভ্রবাসে,
নিশার ঘন আধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা অভয়ে অভয় দেমা—
কোলে তুলে নেমা শ্যামা, কোলে তুলে নেমা শ্যামা ॥"

—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

তখন মনকে প্রবোধ দিয়া মাতৃ ভক্ত সন্তান গাইলেন,—

প্রসাদীসুর—একতালা।

"মন কেমনরে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে. কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়েব পদানত ॥

ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত ॥

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয়রে ভীত ॥

মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবেরে তোর তেমি মত ॥

দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত।
ও মন, গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত ॥"

ভক্ত ভাবিলেন আমি মায়ের ছেলে আমার মনে কেন ভয়ের সঞ্চার হয়? মাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

মিশ্র সুরট—একতালা।

"মা, আমি গো তোর ছেলে,
এ তো জগৎ ভরে' জানে সকলে ॥
তুমি সর্ব্ব মঙ্গলা যার জননী, তার,
দশা এমন হয় কি বলে'!

এমন সতী মা তাঁর অসৎ সুত,
মা চৈতন্যময়ী, সন্তান অজ্ঞান,
জন্মেছে অদ্ভুত।
আমাদের মা আর বেটা সকলই উল্টা,
(কেন) মার স্বভাব না ছেলে পেলে ॥

(মা) তুমি নিত্য মুক্তা শিবা,
আমি তোমার ছেলে কর্ম্মজালে বদ্ধ,
নাম মোর জীব,—

(তাই) দেখে শুনে ভাবি, মনে, মা,
আম গাছে কি আমড়া ফলে!

আমি কার দোষ দিব কিসে,
ছিলাম সৎ, হ'লাম অসৎ
পাঁচটা অসৎ সঙ্গে মিশে;
আমি ছিলাম ব্রহ্ম, (আবার) হব' ব্রহ্ম,
(একবার) বস্‌লেই ব্রহ্ম ময়ীর কোলে।
আমি নিত্যানন্দ হব' গো মা
বস্‌লে নিত্যানন্দময়ীর কোলে॥"

—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভক্ত ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে মায়ের মহামেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ঘোর বর্ণা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি প্রকট হইল। ধ্যান ভঙ্গে গাইলেন,—

বারোয়াঁ—ঝাঁপতাল।

"কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ।
পাগলিনীর বেশ মা তোর, এলো থেলো কেশ।
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
তোর কটিতে কিঙ্কিনী শোভে,—চরণে মহেশ।"

সেই হরবাঞ্ছিত পদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্ত বলিলেন,

প্রসাদীসুর—একতালা।

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপন করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তার ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি।
সারাৎসার তারানাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে' আছি॥"

ভক্ত ভাবিতে লাগিলেন এ সংসারের সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, ভাল মন্দ সবইত মায়ের দেওয়া, তাঁহা হইতেইত সব উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিইত সব। আমার মাইত সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া রূপে, চেতনা রূপে, বুদ্ধি রূপে, নিদ্রা রূপে, ক্ষুধা রূপে, ছায়া রূপে, শক্তি রূপে, তৃষ্ণা রূপে, ক্ষান্তি রূপে, জাতি রূপে, লজ্জা রূপে, শান্তি রূপে, কান্তি রূপে, লক্ষ্মী রূপে, বৃত্তি রূপে, স্মৃতি রূপে, ভ্রান্তি রূপে, অবস্থিত। তিনিইত অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এবং জ্ঞান কর্ম্মাত্মক একাদশ ইন্দ্রিয়ের এবং সেই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপিনী। আমার মাইত বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপে এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ভক্ত তখন ভাবিলেন সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী ব্রহ্মময়ীকে যে রূপে যে ভাবে যে কেহ উপাসনা করে সকলইত সফল। যাহা কিছু এ জগতে করা হইতেছে সবইত তাঁহারই পূজা। তিনি বিভোর চিত্তে গাইলেন,—

পিলুবাহার—জৎ।

"ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচরে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবা নিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামামারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে॥

ভক্ত আজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,—ভাবিতেছেন এ সংসারে কোমলতা এবং কঠোরতা পাশা পাশি রহিয়াছে। মানুষের মন সর্ব্বদাই তথা কথিত সুখান্বেষণে পাগলের মত ছুটিতেছে; কিন্তু দারিদ্র, দুঃখ, রোগ, মহামারী প্রভৃতি দেখিয়া মহা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, ইহা দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা দূর করিয়া সর্ব্বদাই দুঃখ ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকাই বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব। বীরহৃদয় ভাবুকের হৃদয়েই সেই করালিনী শ্যামা নৃত্য করেন। ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া গাইলেন,—

"ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী, যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গ বাসী বিতরিছে ধরাবাসে ॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কতবা কমল দোলে ॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিনী,তান তরঙ্গিনী,গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রী নিচয়,লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগ বাণী ॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলি কর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণ খেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে ॥"

আবার—

"মেঘ মন্দ্র, কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী!
অন্ধকার উপরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বাসিছে প্রলয় বায়ু ॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলি জ্বালা।
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকার, উর্ম্মি ধায়,লঙ্ঘিতে পর্ব্বত চূড়া ॥
ঘোর ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥"

আবার—

"শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীল পয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী।
দ্রাক্ষা ফল হৃদয়-রুধির, ফেন শুভ্র শির, বলে মৃদু মৃদু বাণী ॥
শ্রান্ত পথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কত মত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী তপ্ত শ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥
বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখী ॥"

আবার—

ডাকে ভেরী, বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নকাড়, বীরদাপে কাঁপে ধরা।
ঘোরে তোপ বম বম-বম, বম-বম-বম, বন্দুকের কড়কড়া ॥
ধুমে ধুম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফোটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার ঘোড়া হাতী ॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধুম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রু তোপ আনে ছিনে ॥
আগে যায় বীর্য্য পরিচয় পতাকা নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীর মদে মাতোয়ারা ॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীর কায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥"

অন্যত্র—

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধারা।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার ॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥
রুদ্র মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
রক্তধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি কর কর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়া ভেদ, সুখ স্বপ্ন দেহে দয়া ॥
মুণ্ডমালা পড়ায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্ বাস, বলে মা দানবজয়ী ॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে ॥

মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষ কুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে ॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা ॥

× × × ×

ভাঙ্গ বীণা প্রেম সুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারী মায়া।
আগুয়ান, সিন্ধু রোলে গান, অশ্রুজল পান, প্রাণ পণ যাক্ কায়া ॥
জাগ বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বীর সন্তান তখন গাইলেন—

বেহাগ-খাম্বাজ—যদ্।

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে', শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা, নাচ্‌বি বলে' নিরবধি ॥

আর কিছুই নাই মা চিতে, চিতার আগুণ জ্বল্‌ছে চিতে,
চিতা-ভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা, আসিস্ যদি ॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলিয়ে চরণ তলে।
নেচে আয় মা তালে তালে, দেখি মা নয়ন মুদে ॥"

ভক্ত এখন জগদ্দল দুঃখ জয় করিয়া তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন,—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"আমি কি দুখেরে ডরাই ?
ভবে দাও দুখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা, বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥"

মাতৃগত প্রাণ সন্তান এখন বুঝিতে পারিয়াছেন এ দুঃখরাশী তাঁহার মায়ের দয়া বই আর কিছুই নহে। তাই তিনি গাইলেন,—

বেহাগ খাম্বাজ—যদ্।

বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
দুখ নয় সে দয়া তোমার দয়াময়ী, দুখহরা ॥

সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে।
তাই আমি বহিতেছি সুখ দুখের পসরা ॥

× × × ×

আমি তোমার পোষাপাখী, মা, শিখাও মা তাই শিখি।
শিখায়েছ তারা বুলি, তাই ডাকি মা, তারা তারা ॥"

সময়ান্তরে অসিখর্পর-ধারিনী করালিনীর ভ্রুকুটি ভঙ্গি হেরিয়া তাঁর বীর সন্তান এবার নির্ভিকভাবে বলিলেন—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"আমি কি আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোক্ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরেন যা হৃদ কমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥

শিবের দলিল সইমোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥

জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্ত করে' লবে কোলে ॥"

একদিন প্রকৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। আকাশে একটি নক্ষত্রও নয়নগোচর হয় না—কে যেন সব মুছিয়া ফেলিয়াছে। ঘোর বজ্র নির্ঘোষকারী আন্দোলিত কৃষ্ণ মেঘরাশি প্রবল বেগে অন্য মেঘ সমূহকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। বিঘুর্ণিত ঝঞ্ঝা বায়ু যেন কারামুক্ত কোটি কোটি উন্মাদের প্রেতাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া গর্জ্জন শব্দে বৃক্ষ সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিতেছে আর দূর দূরান্তরে উড়াইয়া ফেলিতেছে। প্রকৃতির এই ভীষণাহবে সমুদ্রও যোগদান করিয়াছে, এবং পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতে চাহিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের তীব্র আলোকে দেখা যাইতেছে—ধূলি ধূসরিত কৃষ্ণ কায় মৃত্যুর সহস্র সহস্র ছায়া মূর্ত্তিগুলি যেন দিকে দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তখন বীর সাধক অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—এমনই সময়ে তোর ঐ দুঃখ শোক যন্ত্রণা আর মহামারী সমূহ চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া ছড়াইয়া উন্মাদানন্দে নাচিতে নাচিতে আয় মা, আয়! ভয়ঙ্করীই তোর নাম, তোর শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু ছড়াইয়া পড়ে, আর তোর প্রতি পদক্ষেপে চিরতরে এক একটি জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। তুই মহাকালী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, আয় মা, আয়! সাহসী বীরের মত যে দুঃখকে বরণ করিয়া এবং মূর্ত্তিমান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া প্রলয় নৃত্যে নাচিতে পারে, তুইত মা তারই কাছে অট্ট অট্ট হাসিতে দিঙমণ্ডল আপূরিত করিয়া উপস্থিত হোস্! * শক্তিমান সাধক দৃঢ়কণ্ঠে গাইলেন,—

মূলতান—একতালা।

"আয় মা সাজন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ॥
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়িতাতে।
(দিয়ে) জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবান বসে' আছি ধরে' ॥

(মাগো) দেখ্‌ব আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন;—
বারে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
(ভক্ত) রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিন্‌ব তোমায় সমরে ॥"

ভক্ত সাধক ধ্যানস্থ হইলেন। খানিক পরে তাঁহার প্রশান্ত নির্ম্মল বদনমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি পরিস্ফুট হইল। বিলম্বিত গভীর ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি গাইলেন,—

মিশ্র কালাংড়া—ঝাঁপতাল।

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি গুহা বাসী ॥

অনন্ত আঁধার কোলে, মহা নির্ব্বান হিল্লোলে।
চির শান্তি পরিমল, অবিরত যায় ভাসি ॥

মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা, কে তুমি গো একা বসি;
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥"

তখন তিনি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

সিন্ধু—ঠুংরি।

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা ॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥

* শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের "Kali the Mother" দ্রষ্টব্য।

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা॥"

ভাবিতে ভাবিতে ভাবুক সাধক গাইলেন,—

বাউল সুর—আড়া।

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়॥
কালী পদ সুধা হ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা হোম, যাগযজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥"

সাধকের মাতৃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তিনি মাকে পাইয়াছেন। এখন তাঁহার সুখও নাই, দুঃখও নাই তিনি এ সকলের অতীত হইয়াছেন। এখন কেবল আনন্দ, —আনন্দ! তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে গাইলেন,—

কাফি—ঝাঁপতাল।

"মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা,
শ্যামা পদ নীল কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো—
কামাদি কুসুম সকলে॥
মায়ের চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল!
দেখ পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে,
আশা পূর্ণ এত দিনে,—
সুখ দুঃখ সমান হলো—
আনন্দ-সাগর উথলে॥"

ইহলোকে মায়ের ভক্ত ছেলের কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। কর্ম্মত কবেই ফুরাইয়াছিল, কেবল কুলাল চক্রভ্রমীবৎ কএকটাদিন সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে ছিলেন মাত্র। আজ তাঁহার শেষ দিন। আজ এ ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাইবেন। রোরুদ্যমান আত্মীয় স্বজনগণ গম্ভীর ভাবে তাঁহার অন্তিম শয্যার পার্শে অবস্থিত। অনন্ত ধাম যাত্রী সুগম্ভীরে গাইলেন,—

বিভাস—ঝাঁপতাল।

"আমি যাই রে, সেই আনন্দ কাননে।
সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে॥
ওরে, ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মিশাইবে, শুভ দিন,
ঘটাকাশ আজকে আমার মহাকাশে হবে লীন,—
জল যাবে সেই জলাধারে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে,
রন্ধ্রগত বায়ু আমার, মিশবে মহা সমীরণে॥
ওরে, শিরোলুণ্ঠন ছলে মায়ের কাছে মাথা নেরে ভাই,
আর হবে না ব'লে আমি কৃত পাপের ক্ষমা চাই;
তোরা বল্‌ছিস মৃত্যুকাল, তাই মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি,
আমি তো ভাই চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি স্বর্ণ ভূমি,
বৈতরণীর নয় তপ্তজল, তরঙ্গ উথলে কেবল,
আনন্দময় হংস যে তায় কচ্ছে সুখে সন্তরণ॥
ওরে তোরা বলছিস্ বিকার বাত, দারুণ বিভীষিকা ভরে,
করছি আমি এপাশ ওপাশ; ভীষণ মূর্ত্তি ভীত হয়ে;
তোরা বল্‌ছিস মৃত্যুকাল তাই মুখে একবার হরিবল,
আমি তো ভাই স্থির নেত্রে দেখি শ্যামা মায়ের কোল,
মা আমার সদয়া হয়ে, দুটি বাহু প্রসারিয়ে,
বলছে আমায়, কোলে আয় বাপ, ভয় কি দুরন্ত শমনে॥
ওরে, শয্যা কণ্টক ছলেরে ভাই, করছি আমি এ পাশ ও পাশ
পাশফিরিয়ে দেখছিরে ভাই, ছিড়ল কিনা মায়া পাশ,
ভাই বন্ধু দারা সুত, তারাইত কারাগারে,
দারুণ মায়া শৃঙ্খলে ভাই, বেঁধে রেখেছিল মোরে,
তাইতে ওরা এসে কাছে, ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে,
তাইতে করি এ পাশ ও পাশ, বিকট আকৃতি বদনে॥
ওরে, আনন্দ তরুতে পাখী, আনন্দ সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফল আর ফুলে দুলছে আনন্দেরি বায়;

নিত্যানন্দ ধাম সে যে, সদাই আনন্দময়,
পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী,
যদি কার লাগে ক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দ সুধা,
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের আজ, এত আনন্দ মরণে ॥"

ওঁ

"হৃদয় কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহর বিধি বেদ্যং যোগিভির্ধ্যান গম্যম্ ॥
জনন মরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্য মীড়ে ॥
—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ওঁ

"দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥"
—চণ্ডী।

ওঁ

"মহামায়ে জগন্মাতঃ কালিকে ঘোর দক্ষিণে।
গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ওঁ॥"

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

সমাপ্ত।

———•———

সিদ্ধা কানুপার গীতের ভাষা।

আমরা দেখিয়াছি কানুপা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গ ছিল। তাঁহার রচিত গীত ও দোহার ভাষাকে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে পারি কি না—ইহাই এখন আলোচ্য। আমরা সোজাসুজি বলিতে পারি যে দোহার ভাষায় বাঙ্গালার কোন লক্ষণই নাই। কাজেই তাহা বাঙ্গালা ভাষার কোঠায় আসিতে পারে না। গীতগুলি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। আমরা এস্থলে গীতগুলির ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিব।

ভাষার জাতি ঠিক করিতে হইলে তাহার কতকগুলি পরিচয় জানা দরকার; যেমন, তাহার ধ্বনি-বিজ্ঞান (phonology), ব্যাকরণ (morphology), বাগ্ধারা (syntax) ও শব্দসমষ্টি (vocabulary)।

ধ্বনি বিজ্ঞান।

আমরা প্রাকৃত ব্যাকরণে বিভিন্ন প্রাকৃতের বিভিন্ন ধ্বনি-বিজ্ঞান দেখিতে পাই; যেমন মাগধীতে সংস্কৃতের র স্থানে ল শষস স্থানে শ, জ স্থানে য; মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীতে শষস স্থানে স, ন স্থানে ণ; পৈশাচীতে গজদব স্থানে কচতপ; ইত্যাদি। কানুপার গীতগুলির ধ্বনি-বিজ্ঞান সুষ্ঠু নির্ণয় করা অসম্ভব। তাহার কারণ গীতগুলির বানান সংস্কৃতমূলক, ধ্বনিমূলক নহে। কাজেই এখানে ধ্বনি-বিজ্ঞানের কোন সাহায্যই আমরা পাইব না। তবে একটী জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাঙ্গালার বানানে আমরা যেমন সংস্কৃতের ণ, শ, ষ, স, য ইত্যাদি রক্ষা করিয়া থাকি, যদিও আমরা ণন, শষ, জয এইগুলির উচ্চারণে কোনই তফাৎ করি না, এই গীতগুলিতেও সেইরূপ সংস্কৃতের মূল বর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—দশ (৯নং) শক্তি শশী, শালী (১১ নং), অবশ (১২ নং), শরণ, শূন (১৩ নং), নিবাস, উআস (৭ নং), বিলসঅ, আসব, সহজ, সঅল, সহাব (৯ নং), চৌষঠ্ঠী (১০ নং) চউষঠ্ঠি (১২ নং), মন, জিন, ম (৭ নং), নলিনী বন (৯ নং), ভণই, (৭ নং), করিণি, (৯ নং), যাইসো (সং যা ধাতু) (১০ নং), যোগী (১১ নং), জিতেল, জিতা (১২ নং)। আবার যেমন প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে এই সংস্কৃতমূলক বানানের অনেক ব্যত্যয় দেখা যায়, এই গীতগুলির ভাষায়ও সেইরূপ অনেক অনিয়ম আছে; যথা,—অবণা গবণে, নিঅড্ডি, পইসই, তিনি (সং ত্রীণি) (৭ নং), বাহ্মণ, পইসি, রিসঅ, (সং ঈর্ষ্যা), বরিসঅ (সং, বৃষ্ ধাতু), জিসেঁ, কিলেসেঁ (৯ নং), জে (৭ নং), জোই, জাসি (১০ নং) ইত্যাদি

ইত্যাদি। এমন কি ইহাতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান দেখা যায়; যেমন,—তিনি (৭ নং), তিণি (১৮ নং), মন (৭ নং), মণ (১৯ নং), শূন (১৩ নং), সুণ (৩৬ নং), শূণ (৪২ নং), জিন (৭নং), জিণ (৪০ নং), যাইসো, জাসি (১০ নং)।

ধ্বনি-বিজ্ঞান হইতে আমরা ত কোন সাহায্য পাইলাম না। দেখা যাউক ব্যাকরণ হইতে আমরা কিছু সন্ধান পাইতে পারি কি না।

ব্যাকরণ।

কর্তৃকারকে এঁ—অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা (৭নং)। প্রাচীন বাঙ্গালায় এঁ—

পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৪২পৃঃ
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপনেরি দিআঁ দান। ঐ ১৭৩ পৃঃ
কর্ত্তৃকারকে এ—ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা! (১৯ নং)।
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী। (১৮ নং)।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় এ। সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে। তেকারণে থীর নহে মনে॥ কৃ, কী, ১৩ পৃঃ।

রামে মারুক বা রাবণে মারুক।
পূর্ব্ববঙ্গের বুলিতে এই একারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।
কর্ত্তৃকারকে বিভক্তি লোপ। সাধারণ প্রয়োগ।
ভাগতরঙ্গকি সোষই সাঅর। (৪২ নং)
মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা। (৪৫) নং ইত্যাদি
বাঙ্গালা ভাষায়ও এইরূপ।

কর্ম্মকারকে বিভক্তি লোপ। সাধারণ প্রয়োগ।
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ। (১০ নং)
বাঙ্গালা ভাষায়ও এই নিয়ম।
কর্ম্মকারকে রেঁ, রে বিভক্তি—
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ। (৯নং)
কেহো কেহো তোহোরেঁ বিরুআ বোলই
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ। (১৮নং)
প্রাচীন বাঙ্গালায় রেঁ, রে, আধুনিকে রে—

অনন্ত স্বরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা ধন ভারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩৮ পৃঃ
সকল লোকেরেঁ করসি পার। ঐ ১৫৪ পৃঃ
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস। ঐ ৭৮ পৃঃ
তারে বল। রামেরে দেও। ইত্যাদি

কর্ম্মকারকে ক—মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা। ১২নং
তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী। ১৩নং

প্রাচীন বাঙ্গালায় ক—

প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
স্তন পান ছলে কাহ্ন তাক সংহারল॥
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, ৫ পৃঃ
বনর মিগীক পরভু হুঁকার পাড়িল।
শূন্য পুরাণ, ১১০ পৃঃ।
নৃপতিক রক্ষিয়া থাকিব সকল! শ্রীকরনন্দী।

কর্ম্মকারকে এ—

রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে। ১১নং

প্রাচীন বাঙ্গালায় এ—

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে। কৃ, কী, ৯ পৃঃ
কথাঁ গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে। ঐ ১০পৃঃ

আধুনিক বাঙ্গালায় আমায় বল ইত্যাদি প্রয়োগে কর্ম্মে এ।

কর্ম্মকারকে এঁ—

কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। ৪০নং

প্রাচীন বাঙ্গালায় এঁ—

বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী। কৃ, কী, ১৫২পৃঃ

করণে এঁ—

সদ্ গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল! ১২নং
দেহ নঅরী বিহরএ একাবেঁ। ১১নং
বর গুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ। ৪৫নং

প্রাচীন বাঙ্গালায় এঁ—

ভাতের ভোখ কাহ্নাঞি ফলেঁ না পালাএ।
কৃ, কী, ১২৮ পৃঃ
গুড়ীএঁ তুলিল হাবি জলের ভিতরে। ঐ ১ পৃঃ

করণে এ—

সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা। ৩৬নং

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না। ৪২নং

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় এ'র বহুল প্রয়োগ।

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। কৃ, কী, ১ পৃঃ

হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারা ভাল। ইত্যাদি।

তাদর্থ্যে এ——কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ। ১৯ নং

আধুনিক বাঙ্গালায়ও এইরূপ, যেমন, সে ভিক্ষায় গিয়াছে, ইত্যাদি।

ষষ্ঠীতে এর—ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো। ১৯নং

বাঙ্গালায়ও এইরূপ।

অধিকরণে ই—

হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই। ৭নং

মধ্য যুগের বাঙ্গালায় ই—

গৌরবে না আয়ে যদি ধরি আন চুলি।

রামায়ণ, উত্তর, ১৩৫ পৃঃ

রাখিল কূর্ম্মর পিঠি। শূন্য পুরাণ ১০০পৃঃ

অধিকরণে বিভক্তি লোপ—

নিঅ দেহ করুণা সুন মে হেরি। ১৩নং

অধিকরণে এ—আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে। ১১নং

বাঙ্গালায় সাধারণ প্রয়োগ।

অধিকরণে এঁ—অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী। (১৮নং)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ঐরূপ—করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ।

৩৩৯ পৃঃ।

অধিকরণে হি—ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই। ৭নং

এই সকল বিভক্তির মধ্যে কর্ত্তার এঁ, কর্ম্মের রেঁ, রে, ষষ্ঠীর এর বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব। কর্ত্তার এ এবং কর্ম্মের ক প্রাচীন বাঙ্গালা, মৈথিলী ও আসামী ভাষায় পাওয়া যায়। করণের এঁ মারাঠী, গুজরাটী, প্রাচীন বাঙ্গালা ও প্রাচীন মৈথিলীর মধ্যে দেখা যায়। করণে এ বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামীতে দৃষ্ট হয়। সপ্তমীর একার বাঙ্গালা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষায় সাধারণ।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি এই :—

উত্তম পুরুষ।

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—	হাউঁ, হাঁউ, মই, ম, মোএ, মে	আহ্মে
কর্ম্ম —	মোরি	
ষষ্ঠী—	মো	

তুঃ প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ত্তার একবচনে মোএঁ মোঁই, মোয়ে, মো, মোঁ ; বহুবচনে আহ্মে, আহ্মি, আহ্মারা (কৃ, কী) আহ্মি (শূন্য পুরাণ, গোরক্ষ বিজয়, সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী, প্রভৃতি)।

মধ্যম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—	তুই, তু	
কর্ম্ম—	তো, তোহোরে, তোরেঁ	
ষষ্ঠী—	তোহোর, তোহোরি (স্ত্রী), তোএ, তআরি	

তুঃ প্রাচীন বাঙ্গালায়—কর্ত্তার একবচনে তো, তোঁ তোএঁ তোঁএ, ষষ্ঠীতে তোহোর, তোর (কৃ, কী)।

অন্যান্য সর্ব্বনাম—'তৎ' শব্দের কর্ত্তৃকারকের পুংলিঙ্গের একবচনে সো, বহুবচনে তে, কর্ম্মকারকে তা, সম্বন্ধে তসু, অধিকরণে তহিঁ।

তুঃ বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। চৈতন্য ভাগবত

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।

তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান।

ঐ আদি। ২ অঃ

যমুনার তীরে কদম তরুতলে

তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে। কৃ, কী, ৩০৬ পৃঃ

যৎ শব্দের কর্ত্তার একবচনে জো, বহুবচনে জে, অধিকরণে জসু।

কিম্ শব্দের কর্ত্তার প্রথমার একবচনে কেহো, কোই ষষ্ঠীতে কাহরি (স্ত্রী), করণে কীস, কইসেঁ কইসে, অধিকরণে কহিঁ।

তুঃ যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় সেহো নাহি জানে॥
চৈ, চ, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১২১৫ পৃঃ
খাটের খাটিআল কহি গেল সে।
কৃ, কী, ১৫৫ পৃঃ।
ডাকিয়া রাবণ বলে বরুণ গেল কহি।
রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৮৪ পৃঃ

সর্ব্বনামের অন্যান্য রূপ :—*

জিম, জইসোঁ, জইসো, জইসা, তিম, তইসোঁ, কইসনি (স্ত্রী), আইসোঁ।

জিম, তিম হইতে আধুনিক যেমন, তেমন হইয়াছে।

ক্রিয়াপদ।

বর্ত্তমান কাল

প্রথম পুরুষ একবচন
পইসই (৭নং)
বট্টই, ভণই, বিলসঅ, রিসঅ, বরিসঅ (৯নং)
নাচঅ, খাঅ, বিকণঅ (১০নং)
বাজএ, বিহরএ, লবএ (১১নং)
বাহঅ (১৩নং)
বোলই, মেলঈ, গাই (১৮নং)
ছাড়অ, জাঅ, পগাঅ (১৯নং)
ঘুমই, চেবই, রাহঅ (৩৬)
জায়, সমায়, উএসই, ভণই, বিকসই (৪০নং)
ফরই, সোসঈ, পেখই, দেখই, জাই, আবই, বিলসই (৪২নং)
ছিজঅ, উইজঅ, বাটই, ছেবই জাণই, মাণই (৪৫নং)

একবচন বহুবচন
মধ্যম পুরুষ। অইসসি, জাসি (১০নং)
উত্তম পুরুষ। পুচ্ছমি, নাবমি,...খেলহুঁ দেহুঁ, লেহুঁ (১২নং)
লেমি (১০নং)

প্রথম পুরুষের একবচনে এ বিভক্তি (যেমন করএ) প্রাচীন বাঙ্গালায় ভূরি ভূরি দেখা যায়। বৌদ্ধগানের অ বিভক্তি (যেমন বরিসঅ, খাঅ ইত্যাদি) আধুনিক বাঙ্গালায় য় বিভক্তিরই পূর্ব্বরূপ। মধ্যমপুরুষের একবচনে সি বিভক্তি মধ্যযুগের বাঙ্গালায় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সি ভিন্ন অন্য বিভক্তি মধ্যম পুরুষের একবচনে নাই। বৌদ্ধ গানের উত্তম পুরুষের মি বিভক্তি হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন করম, দেখম প্রভৃতি বর্ত্তমান্ কালের রূপ আসিয়াছে।

কথা না যাসি বড়ায়ি। কৃ, কী, ৩২
কাহ্নাঞিঁ করসি তোঁ বল। ঐ

বর্ত্তমান্ অনুজ্ঞা।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ	কাটউ (১২নং)	
মধ্যম পুরুষ	হোহি, ভণ (৪২নং)	ছেবহ
	হেরি ((৭নং)	

মধ্যযুগের বাঙ্গালায় মধ্যম পুরুষের ইকার ভিন্ন সমস্ত রূপই পাওয়া যায়।

জঘনে নাদ করউ রসনে। কৃ, কী, ২১৮ পৃঃ
ছাড়হ আন্ধার থান। ঐ, ৬৫ পৃঃ

অতীত কাল।

ইল, এল, ইউ, ইঅ

	একবচন	বহুবচন
১ম পুরুষ।	চলিল (১৩নং) কিউ, ভইঅ, (১১নং), মরাড়িউ ঘলিউ (১২নং), চলিআ	রুন্ধেলা, ভইলা (গৌরবে) আইলা, গেলা, ভইঈলা (গৌরবে, ৭নং) মুতেলা (গৌরবে, ৩৬নং)
	আহারিউ, কিঅ (১৯নং)	
	অহারি, সংবোহিঅ (৪০নং)	
মধ্যম পুরুষ।	বিটলিউ, টালিউ (১৮নং)	
উত্তম পুরুষ।	ঘালিলি (কক্ষ শ্রীঃ ১০নং) মুতেলি (১৮নং), দেখিল (৩৬নং)	ক্রিয়েল

মারি, হেরি, মুনিয়া (১৩নং)

বাহিঅ (১৮নং)

ইল দিয়া অতীতকাল আধুনিক বাঙ্গালায় সাধারণ।

ইয়া দিয়া অতীতের প্রযোগেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উল্লুকের মাথএ পয়ন্তু আসীস করিআ।

নঅদীব পৃথিবীর ভাল নাম থুইআ।

শূন্য পুরাণ ১২ পৃঃ।

ভবিষ্যৎ কাল।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ।	কাহিব (৪০নং)	
উত্তম পুরুষ।	করিবে (১০নং)	করিব (৭নং)
	করিব (৩৬নং)	

অসমাপিকা ক্রিয়া।

দেখি, গই, (৭নং); মোড্ডিউ, তোড়িউ, হরিঅ, পইসি (৯নং); ধরিঅ, মারিআ পাইঅ (১১নং); পিহাড়ি, তোড়িআ, তোলিআ, করিআ, গুণিয়া (১২নং); কিঅ, করি (১৩নং); বিবাহিআ (১৯নং); ধরিঅ (৩৬নং); পমাই, দেখি (৪২নং); পড়িআঁ (৪৫নং)।

আধুনিক বাঙ্গালায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ইয়া সাধারণ; ই কবিতায় প্রযুক্ত হয়।

বাগ্‌ধারা Syntax।

এখানে গানগুলির কয়েকটি বিশেষ বাগ্‌ধারা আলোচনা করিতেছি :—

(১) বাক্য মধ্যে বর্ত্তমানে 'হওয়া' ক্রিয়া উহ্য থাকে—যেমন

জো মন-গোঅর সো-উআস। (৭নং)

ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।

ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥ (৯নং)

তু লো ডোম্বী হাউঁ কাপালী। (১০নং)

মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা। (৪৫নং)

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা। (১৯নং)

মণ-পবণ বেণি করণ্ড কশালা। (১৯নং)

ইত্যাদি।

(২) কার্য্যের একান্ত সমাপ্তি বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত পড়া ক্রিয়ার প্রয়োগ, যেমন

সড়ি পড়িআঁরে মূঢ় তা ভব মাণই (৪৫ নং)

আধুনিক বাঙ্গলায় হইবে—ওরে, পচিয়া পড়িয়া, মূঢ় তাহাতে ভব (জন্ম) স্বীকার করে। 'পড়া' ধাতুর এইরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালার বিশেষত্ব।

(৩) তাদর্থ্যে 'অন্তরে' প্রয়োগ, যেমন

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এট্টা। (১০নং)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

দানের আন্তরে কাহ্নাঞি বুলুক বচন। কৃ, কী, ৫২

এই 'অন্তরে' হইতে আধুনিক বাঙ্গালায়—'তরে' হইয়াছে।

কাহ্নুপাদের গানে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যাহা বাঙ্গালার বিশেষ শব্দ বলা যাইতে পারে। (১) তের ধাতু দেখা অর্থে। আধুনিক বাঙ্গালায় কবিতায় ব্যবহৃত হয়। (২) বাথোড়—আলান অর্থে। বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ বাথোড় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) ঈর্ষ্যা অর্থে রিস ধাতু। এখন আমরা বলি রিস করে। (৪) স্ত্রীলোকের সম্বোধনে আলো, হালো, লো (১০নং)। আলো এক্ষণে ওলো। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আলো। (৫) মোলাণ (১০নং) মৃণাল অর্থে। এখনও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে মোলাম। (৬) আলি কালি (১১নং, ৭নং) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অর্থে। তিব্বতী ভাষায় এইরূপ। তিব্বতের অক্ষর যখন বাঙ্গালা দেশ হইতে লওয়া হইয়াছিল তখন সম্ভবতঃ এই দুইটি শব্দ ঐ ভাষায় গৃহীত হয়। (৭) ছার (১১ নং) ছাই অর্থে, এখনও আমরা ছারকপাল, ছারপোকা, ছারখার ইত্যাদি শব্দে ইহার প্রয়োগ করি। (৮) গুণ ধাতু গণা অর্থে। যদিও আমরা লিখি 'গণিয়া', 'গণি' ইত্যাদি, কিন্তু বলি 'গুণিয়া' 'গুণি' হিন্দী গিন্‌না। (৯) কেড়ুয়াল—নৌকার দাঁড় অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার বহুল প্রয়োগ ছিল। (১০) মেল ধাতু ছাড়া অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার প্রয়োগ ছিল। এখনও চোখ মেলা, কাপড় মেলা ইত্যাদি প্রয়োগ

আছে। (১১) পোহায় (১৯নং) প্রভাত করে এই অর্থে। এখনও ইহার প্রয়োগ আছে। (১২) ঘুম (৩৬নং) ধাতু নিদ্রা যাওয়া অর্থে। (১৩) আলজ্জালা (৪০ নং) জঞ্জাল অর্থে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আলজ্জাল। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও 'আলা-জালা'। (১৪) কাল (৪০নং) বধির অর্থে। গোরক্ষ বিজয়ে ঐ। অধুনা কালা। (১৫) বোব (৪০নং) এখন বোবা। (১৬) ডাল (৪৫নং) শাখা অর্থে।

আর একটী কথা। কাহ্নুপা ১৯নং গানে বিবাহ যাত্রা প্রসঙ্গে পড়হ, মাদলা, করণ্ড, কশালা, দুন্দুহি এই চারিটি বাজনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি প্রাচীন বঙ্গসমাজে সুপরিচিত ছিল—যেমন—

যতেক মহাপাত্র চারিভিতে সাজে
শঙ্খ, দুন্দুভি, সিঙ্গা চারিপাশে বাজে ॥
শিঙ্গা ডম্বুর বাজে, কাংস্য করতাল
পাড়া মাদল ভেরু দোসলি কাহাল ॥

* * * * *

করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী।
বেণু বাঁশী সরমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী ॥

কৃত্তিবাস, উঃ কাণ্ড, ৮৯ কলম।

কৃত্তিবাসের দুন্দুভি, পাড়া, মাদল, কাহাল, করড়া বৌদ্ধগানের দুন্দুহি, পড়হ, মাদলা, কশালা, করণ্ড একই।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমরা কাহ্নুপার গানকে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার গান ছাড়া আর কিছু বলিতে পারিনা। সেই সময়ে অবশ্য মৈথিলী, উড়িয়া ও আসামীর সহিত বাঙ্গালার ভেদ অতি সামান্য ছিল কিংবা ছিলই না। এইজন্য ঐ সকল ভাষার সহিত হয় ত কিছু পরিমাণে এই গানগুলির ভাষার মিল থাকিতে পারে। কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ না বলিয়া গতি নাই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

—*—

প্রথম দর্শনে প্রেম।

সকল দেশের কবিদের গ্রন্থেই 'প্রথম দর্শনে প্রেম' এর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় নাটক, উপন্যাস ও গল্প লেখক হইতে সুরু করিয়া বটতলায় লেখনেওয়ালা পর্য্যন্ত কেহই এ বিষয়টার উপর অল্প বিস্তর কৃপা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। কোন না কোন আকারের প্রেম ছাড়া গল্প-উপন্যাসাদি একেবারেই লিখিত হয় না। বিয়োগান্তক, মিলনান্তক, হাস্যরসাত্মক বা অন্য যে কোন প্রকারের নাটক, নভেলই হউক না কেন, লেখক তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই দুইটী অদ্ভুত রকমের সুন্দর যুবক-যুবতীর অবতারণা করিয়া বসেন এবং ফুল বাগানেই হউক বা উপাসনা গৃহেই হউক, শূন্য ঘাটেই হউক বা পুরাণা শিব-মন্দিরেই হউক—যেইমাত্র তাহাদের পরস্পর চোখো চোখি হওয়া, আর কোন কথা নাই, একেবারে প্রেমের অগাধ জলধি তলে নিমজ্জিত হওয়া ও পরস্পরের অদর্শনে বিরহের তপ্ত আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা। এই-ই উপন্যাসাদি লেখার একরকম সনাতন প্রথা। কোন কোন লেখক অবশ্য এই চিরন্তন প্রথাকে একটু বদলাইয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারা হয়ত 'প্রথম দর্শনে প্রেম' এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান হইয়া, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ নায়ক নায়িকাকে পূর্ব্ব হইতেই কিছুদিনের জন্য পরস্পরের সাহচর্য্য লাভের সুযোগ দিয়া শেষে প্রেমে ফেলিয়া থাকেন।

'প্রথম দর্শনে প্রেম' ভূরি ভূরি গল্প-উপন্যাসে সত্যকার জিনিষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, মনস্তত্ত্ববিদের বিচারে তাহা কতটা সত্য এবং প্রেমের মত একটা মধুর পবিত্র ভাব মুহূর্ত্তের দর্শনে হৃদয়ে স্থায়ী গভীর রেখা অঙ্কিত করিতে পারে বলিয়া মানিয়া নিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের গুরুত্বকে খর্ব্ব করা হয় কিনা, ইহা বিচার সাপেক্ষ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতনামা দুইটী যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রাথমিক মুহূর্ত্তের দর্শনের পরে পরস্পরকে আরও একটু

বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য একটা কৌতূহল জন্মে। হঠাৎ দৃষ্টবস্তু ক্ষণিকের অবসরে দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া যায় হৃদয়ে জাগরিত কৌতূহলটাকে চরিতার্থ করিবার এক প্রবল পিপাসা। অজ্ঞাত চিরকালই রহস্যাবৃত এবং রহস্য চিরকালই কৌতূহলোদ্দীপক। অজ্ঞাতের রহস্যাবরণ যখন ঈষন্মুক্ত হয়, তখন কৌতূহলের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথম দর্শনে অজ্ঞাতের আবরণ কিছুটা উন্মোচিত হইলে, মানুষের মনে অজ্ঞাতের মধ্যে লুক্কায়িত রহস্যটাকে জানিবার জন্য একটা ব্যাকুল আগ্রহ আপনা হইতেই উদিত হয়। "এখনও যারে চোখে দেখেনি, শুধু বাঁশী শুনেছি"—সেই অদৃষ্ট, অজ্ঞাত জন কিরূপে মন ও প্রাণ হরণ করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, অজ্ঞাতের আড়ালে লুকায়িত রহস্যের প্রতি মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুহূর্ত্তের দর্শনে যুবক যুবতীর হৃদয়ে ভাবের একটা অস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়া যায়; একের রূপ-বিলাসাদি বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত অপরের নয়ন ক্ষণেকের জন্য ধাঁধিয়া যায়; পরস্পরের মনের উপর একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ বিস্তার করিয়া, একটা মধুর উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া তোলে। ঐ ভাবের ঘোরে, ঐ মোহময় উন্মাদনার প্রভাবে, উভয়ে উভয়ের নিকট অপ্সরা অপ্সরীর ন্যায়—এমন কি একেবারে অপার্থিব, আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। সকলেই জানেন, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনের উপর তাঁহার স্ত্রী মেরী হাচীন্‌সন্ পেন্‌রিথের স্কুলে প্রথম দর্শনের পর ঠিক এমনই একটা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"She was a Phantom of delight,
When first she gleamed upon my sight;
A lovely apparition, sent
To be a moment's ornament;
... ...
A dancing shape, an image gay,
To waylay, to startle and haunt." *

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চোখে যখন মেরী প্রথম পতিত হন, তখন তিনি তাঁহার নিকট বস্তুতঃই একটা আনন্দময়ী, নৃত্যকারিণী ও অপার্থিব অপ্সরী বলিয়া মনে হইয়াছিল—আর স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিত, চকিত কবির চোখ আলোকিত ও মন পুলকিত হইয়াছিল। প্রথম দর্শনের পর সকলেরই হৃদয়ে এমনই মধুর ভাবের সৃষ্টি হয়। পরে মানুষ নিজ কল্পনা শক্তির সাহায্যে এই মধুর ভাবটাকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়া আনন্দ-রস উপভোগ করে। কিন্তু এই আনন্দ ভালবাসার আনন্দ নয়; যেহেতু কোন সাময়িক আবেগময় ভাবের মোহ আর মানুষের হৃদয়ের ভালবাসা এক পদার্থ নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজেও প্রথম দর্শনের ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়াই মেরীর প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খান নাই। একই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের যে সুযোগ দিয়া ছিল তাহাতে উভয়ের মনে প্রথম দর্শনের জাগ্রত কৌতূহল পুনর্দর্শনে পরস্পরকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার আগ্রহে এবং পরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে ও দীর্ঘ দিনের সাহচর্য্যের ফলে ভালবাসায় পরিণত হইয়াছিল।

মানুষ তাহার মতই আর একজন মানুষকে ভালবাসিতে চায়—স্বর্গীয় দেবী বা অপ্সরীকে চায় না। অর্থাৎ যে মানুষ তাহারই মত রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট এবং যে "human nature's daily food"-এর গণ্ডীর বাহিরে নয়, তাহাকেই মানুষ ভালবাসিতে পারে—তাহার সঙ্গে প্রাণের মিল হয় বলিয়া স্বর্গীয় অপ্সরী তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিত, চকিত ও আনন্দিত করিতে পারে বটে কিন্তু তাহার প্রাণে ভালবাসার উদ্রেক করিতে পারে না। তাই ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ মেরীকে যখন "upon nearer view" দেখিলেন এবং দেখিলেন মেরী কেবল "spirit" নয়, "yet a woman too"

* শেষ লাইনের phrase তিনটীর স্থান বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তখনই তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চার সম্ভব হইয়াছিল।

মানুষ সব সময় কল্পনার মোহমদিরায় মস্‌গুল হইয়া সুখ পায় না বলিয়া, প্রথম দর্শনের অবসরে স্বল্পমাত্র অনুভূত এবং আব্‌ছায়া গোছ দৃষ্ট কৌতুহলময় বস্তুটাকে দূরত্ব ঘুচাইয়া আরও কাছাকাছি পাইবার জন্য, বাস্তবভাবে বিশেষ আপনার করিয়া অনুভব করিয়া অতৃপ্তির আস্বস্তিটাকে দূর করিবার জন্য, অস্পষ্টকে স্পষ্টতর করিয়া, কাল্পনিককে বাস্তব করিয়া, চক্ষুর ও মনের অপূর্ণ বাসনাকে তৃপ্তির পূর্ণ সার্থকতা দান করিবার জন্য, প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে পোষণ করিয়া থাকে। সেইজন্য প্রথম দৃষ্ট যুবক যুবতী পরস্পরের পুনর্দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র ও লালায়িত হয়। যেখানে এই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইয়া প্রথম দর্শনের আব্‌ছায়া ছবিটা পুনর্দর্শনের আলোকে স্পষ্টতর হইয়া উঠে সেখানে অনেকস্থলে পরস্পরের প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক "আকর্ষণ" জন্মে। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি মনের এই আকর্ষণকেই কবিরা 'পূর্ব্বরাগ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে পুনর্দর্শনের সুযোগের অভাবে এই 'আকর্ষনটা' চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না, সেখানে প্রথম দর্শনে হৃদয়ে অঙ্কিত অস্পষ্ট ছবিটা ক্রমশঃ অস্পষ্টতর হইতে অস্পষ্টতম হইয়া শেষে একদম ধুইয়া মুছিয়া যায়। কবিবর ব্রাউনিং-এর নায়ক ডিউক ফার্‌ডিনাণ্ড এবং নায়িকা রিকার্ডির সদ্য পরিণীতা স্ত্রী মুহূর্ত্তের দর্শনেই আত্মহারা হইয়া পরস্পরের পানে উধাও ছুটিয়া যাইবার ও পরস্পরের কোলে ঝাপাইয়া পড়িবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে ও নিজেদের "গাফিলির" দরুণ তাহারা তাহাদের বাসনা-বহ্নিতে আহুতি দিতে পারে নাই। ফলে, কিছুদিন বাদেই,—

"——as love's brief morning wove,
With a gentle start, half smile, half sigh,
They found love not as it seemed before."

'The states and the Bust'

তাহারা স্পষ্ট অনুভব করিল যে তাহাদের উদ্দাম ভালবাসার স্রোতে ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু আসল ভালবাসার "অমিয়া সাগরে" এরূপ জোয়ার ভাটা নাই। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন "পুরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়। সুজনক পীরিতি কবহুঁ দূর নয়।" খাঁটী প্রেমিকের ভালবাসার লাঘব হয় না। স্কচ কবি বার্ণস্‌ও লিখিয়াছেন—

"Till a' the gang dry, my dear,
And the rocks melt in' the sun :
I will love thee still, my dear,
While the sands o' life shall run."

সাগর শুকাইয়া গেলে, পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িলেও আমার ভালবাসা অটুট থাকিবে। কিন্তু ফার্‌ডিনাণ্ড ও রিফাডির স্ত্রীর ভালবাসা বন্যার মত উভয়কেই এক মুহূর্ত্তে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। যদিও মুহূর্ত্ত পরেই আবার বিপরীত স্রোত আসিয়া উভয়কেই অন্যত্র লইয়া গেল। যদি প্রথম দর্শনের মোহটা পুনর্দর্শনে ঘনীভূত হইয়া পরস্পরের আকর্ষণে ও ভালবাসায় পরিণত হইতে পারিত, তবে তাহাদের প্রণয়ের স্রোত কখনই মন্দীভূত হইত না।

প্রণয় ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমনতর দুই একটা ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু উপন্যাসের নর-নারীর জীবনের মত ইহাতে মানুষের জীবন নিরাশ প্রেমের তপ্ত মরুভূমিতে পর্য্যবসিত হয় না। তাহা যদি হইত, তবে সংসারের বেশীর ভাগ লোককেই নিজেদের ঘরকন্না গুটাইয়া, "পোঁটলা-পুঁটলী" বাঁধিয়া, নির্জ্জন পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়া, পোড়া প্রাণের হাহাকার মিটাইতে হইত।

ভালবাসা কখনও আগমন সূচক বংশী ধ্বনি করিয়া, সিগ্‌ন্যাল দিয়া মনের প্ল্যাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হয় না। আবার বিনা মেঘে বর্ষণের মত একবারে হঠাৎও ভালবাসা মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে বলিয়া মনে হয় না। ভালবাসা অহৈতুকী নয়। রূপ; গুণ, বিদ্যা, জ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতির কোন না কোনটাকে আশ্রয় করিয়া মনের নিতান্ত অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে কখন যে ইহার জন্ম হয়,

তাহার কিনারা করা বিচক্ষণ মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষেও সহজ নহে। ভালবাসার জন্ম ও পুষ্টি কাহারও নিজের আয়ত্তাধীন নয়। মানুষের মনে যে সমস্ত ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবাহিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটাই বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে একযোগে ভালবাসার জন্ম ও পুষ্টির সহায়তা করে। ইংরেজ কবি Cobridge বলিয়াছেন :—

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of love,
And feed his sacred flame."

ভালবাসার জন্ম ও পরিপুষ্টিতে কয়েকটী স্তর আছে। সকল প্রকার জ্ঞানের ন্যায় ভালবাসারও প্রথম প্রারম্ভ বহিরিন্দ্রিয়ে। আর প্রণয় ব্যাপারে আঁখিই মনসিজের প্রধান সহায়। নাট্যসম্রাট শেক্ষপীয়ার তাঁর Merchant of Venice নামক নাটকে ভালবাসার জন্ম কোথায় ও কিরূপে হয় তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

"Tell me where is *fancy* bred ?
Or in the heart or in the head ?
How begot, how nourished ?
Reply, Reply.
It is engendered in the eyes,
With gazing fed ;"

অর্থাৎ ভালবাসার (fancyর) জন্ম হয় চোখে। রূপের মোহে মানুষ যত শীঘ্র ও সহজে ভুলিতে পারে তত আর কিছুতেই নয়। প্রথম দর্শনের মুহূর্ত্তের অবসরেই মানুষ রূপের ছটায় আকৃষ্ট হইতে পারে। পতঙ্গের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া রূপ বহ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িতে বাসনাময় তরুণ যৌবনের যাত্রীরা মুহূর্ত্ত মাত্রও দ্বিধা করে না।

শেক্ষপীয়ার 'fancy' র জন্ম আঁখিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'fancy' প্রকৃত ভালবাসা নয়—ভালবাসার একটা "খেয়াল" মাত্র। তিনি নিজেই এই 'fancy' বা ভালবাসার খেয়ালের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর Twelfth Night নামক নাটকে। Twelfth Night এর নায়ক Orsino বলিয়াছেন—"So full of shapes is fancy, That it alone is high fantastical প্রকৃত ভালবাসা যে কখনই আঁখিতে জন্মিতে পারে না, একথা শেক্ষপীয়ার নিজেই তাঁর 'A mid summer Nights Dream'-এ বলিয়াছেন—"Love looks not with the eyes but with the mind." ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে fancy বা ভালবাসার "খেয়াল" আঁখিতে অর্থাৎ রূপের মোহে জন্মিতে পারে কিন্তু খাঁটী ভালবাসায় মুকুল মানুষের হৃদয় কাননেই মুঞ্জরিত হয়। "আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনো মিলন ?" "যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পার, তবে সে পীরিতে দড়" ইত্যাদি কবিদের কথাগুলিও এই সত্যেরই পোষকতা করে। মনে মনে মিলন না হইলে আঁখিতে রূপের নেশায় মুগ্ধ হইয়া যে ভালবাসা জন্মে তাহার স্থায়িত্ব খুবই অল্প। আর এই রূপজ ভালবাসার মৌতাতে আচ্ছন্ন হৃদয়ের নিভৃততম স্থান খুঁজিয়া দেখিলে তাহাতে প্রায়ই লালসার একটা অস্পষ্ট রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যেই মাত্র রূপের নেশা ছুটিয়া যায়, ঘনিষ্টতায় রোমান্সটুকু ভাঙ্গিয়া যায় ও বাসনার পিপাসা চরিতার্থ হয়, অমনি রূপজ ভালবাসার স্রোতেও ভাটা পড়িয়া আসে। রূপজ ভালবাসার জন্ম, পুষ্টি ও পরিণতি কিরূপভাবে সংঘটিত হয় তাহার একটা উজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মহামতি টলষ্টয় তাঁহার জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কেরেলিনাডে'। নায়িকা 'আনা' ও তাহার প্রণয়ী 'ভ্রন্‌স্‌কী'র প্রণয় ব্যাপার যেরূপ অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মুহূর্ত্তের দর্শনে মানুষ কিরূপে রূপের নেশায় মত্ত হইতে পারে এবং ঐ সাময়িক মত্ততা মানুষকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায়। 'আনা' ও ভ্রন্‌স্‌কী উভয়েরই গর্ব্ব করিবার মত রূপ ও যৌবনের বাহার আছে এবং মুহূর্ত্তের দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহাদের আকর্ষণের প্রচণ্ড তেজের

মুখে কুল, মান, স্নেহ, বাৎসল্য, অর্থ পরিবার কিছুরই বাঁধ টিকিল না। সকল বিসর্জন দিয়া পরস্পর পরস্পরের মদির প্রণয়সাগরে ডুবিয়া আকণ্ঠ পান করিল। কিন্তু কয়দিন? অল্পদিন পরেই তাহাদের কাছে এরূপ জীবন নিতান্ত বিসদৃশ ও বিষময় ঠেকিল। 'আনা' নিজেই তাহার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া তখন যাহা বলিয়াছে, তাহাই সকল রূপজ, কামজ ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি—"My *love* is growing more passionate and selfish and his is cooling off more & more. That is why we are drifting in different directions. And it can't be helped. He is all in all to me, while he wants to get farther & farther from me. That is it ; at the beginning we were irresistibly drawn to each other ; and now we are irresistibly drawn apart. And it can't be changed. He tells me that I am absurdly jealous and I keep on telling myself that I am, but it is not true. I am not jealous ; I am dissatisfied..........To be treated kindly & gently out of a sense of duty & not love, is worse than unpleasant, it is hell. And that is precisely what has happened He has ceased loving me." ইত্যাদি। তার পরে তাহার প্রণয়ীর প্রতি ভালবাসা ও স্বামী পুত্রের প্রতি ভালবাসার তুলনা করিতে যাইয়া "She (Anna) shuddered in disgust at what she had called *love.*" অর্থাৎ 'আনা' তখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে যাহাকে সে এতদিন বিশুদ্ধ ভালবাসা মনে করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক পক্ষে ঘৃণিত রূপজ, কামজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং অচিরেই তাহার সে মোহ টুটিয়া গেল। সকল রূপজ কামজ ভালবাসার ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু যেখানে ভালবাসা রূপ অপেক্ষা গুণের উপর বেশী ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে, সেখানে ভালবাসার স্থায়িত্বও দীর্ঘ হয়। কিন্তু ইহা সময়সাপেক্ষ। মুহূর্ত্তের দর্শনে মানুষ বাহ্যিক রূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে; কিন্তু ভিতরকার গুণাবলীর খোঁজ পাইতে হইলে, দূর হইতে শুধু বিদ্যুদ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে চলে না; ঘনিষ্টতা চাই। আর এই ঘনিষ্টতাটা কেবলমাত্র আঁখির নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের; অর্থাৎ সাহচর্য্যদ্বারাই দুইটি মানুষ পরস্পরের হৃদয়বৃত্তিগুলি জানিতে পারে এবং যেখানে উভয়ের হৃদয়বৃত্তিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, সেখানে উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই ঘনীভূত হইতে থাকে, উভয়ের প্রাণে আসঙ্গলিপ্সা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের নিকট একেবারে অপরিহার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থা দ্বারাই সাধারণতঃ ভালবাসার প্রারম্ভ সূচিত হয়। কিন্তু কোনরূপ সামঞ্জস্য না থাকিলে একে অন্যকে আকর্ষণ করেনা। যেমন তৈল ও জলের কখনও একীকরণ সম্ভব হয় না।

প্রেমিক কবি বা দার্শনিকেরা খাঁটী প্রেমের যে সংজ্ঞা সূচিত করিয়াছেন তাহাতে প্রেমে এক প্রাণ অন্য প্রাণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যায়। যেমন দুই বর্ণের মিলনে এক হয়, তেমনই দুইটী বিভিন্ন প্রাণ ভালবাসার অদ্ভুত প্রভাবে সম্পূর্ণ অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়—একের সত্বা অন্যের সত্বার মধ্যে ডুবিয়া যায়। ইহাই যদি ভালবাসার স্বরূপ হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের "লাজ নয়নের চকিত চাহনি" নর-নারীকে এই অভিন্নাবস্থায় নিয়া যাইতে পারে না।

মহামতি ষ্ট্রীনড্‌বার্গ তাহার একখানা পুস্তকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে আদবে ভালবাসা জন্মিতে পারে কিনা এই প্রশ্নটী উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন যে ইলেক্‌ট্রিসিটির পজেটিভ্‌ ও নিগেটিভ্‌ স্রোতের মত নর ও নারী পরস্পরের পরিপূরক হইলেও বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাহাদের স্বার্থ বিভিন্ন। সুতরাং যখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বার্থের

বিভিন্নতা ঘুচিয়া যায়, তখনই তাহাদের মধ্যে ভালবাসার আবির্ভাব হইতে পারে। একমাত্র বিবাহবন্ধন দ্বারাই বিভিন্ন "ধর্ম্মাবলম্বী" নর ও নারীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে অর্থাৎ তাহাদের স্বার্থের একীকরণ সম্ভব হইতে পারে এবং যতদিন তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ একীকৃত থাকে ততদিনই তাহাদের মধ্যে মিল ও ভালবাসা থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নর ও নারীর যে স্বার্থের একীকরণের দ্বারা মনের মিল ও ভালবাসার সম্ভব হয়, তাহা এক মুহূর্তের দৃষ্টিতে এখন সেটা সাক্ষাৎকারেই হউক বা অমৃতযোগেই হউক কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। অধিকন্তু বিভিন্ন "ধর্ম্মাবলম্বী" দুইটী পদার্থের একীকরণে সময়ের প্রয়োজন। অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বিষয় বিশেষে স্বার্থের সমতা থাকা চাই। কিন্তু এই বিষয়-বিশেষটা গুণগতই হউক, রূপগতই বা অন্য যা কিছু-গতই হউক ইহার স্বার্থের সমতার আবিষ্কার ও একীকরণ একমুহূর্তের কার্য্য নয়।

এখানে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে ভালবাসা রূপ গুণের বিশেষ ধার ধারে না। ইহা সময়ে Egypt's brow-তে Helen's beauty দেখিয়া থাকে; আবার সময়ে লিটনের কাণা ফুলওয়ালী নিডিয়া অথবা বঙ্কিম বাবুর "রজনীর" মত রূপের অনুভূতি ছাড়াই সম্ভব হইতে পারে! রূপগুণ বিচার করিয়া সব সময়ে মানুষের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হয় কিনা তাহার বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে বিনা বাতাসে প্রেমের গাঙ্গে কদাপি ঢেউ উঠে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রথম দর্শনে মানুষের হৃদয়ে রূপজ ভালবাসার লালসাময় যে বীজ উপ্ত হয়, তাহা পরিণামে স্থানবিশেষে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পবিত্র প্রেমের বিরাট মহীরুহে পরিণত হইতে পারে। যেমন বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণিতে হইয়াছিল। এই অর্থে প্রথম দর্শনে প্রেম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যদি বাস্তব জীবনে এরূপ ব্যাপার সত্য হয়, তবে শুধু এই হিসাবে প্রথম দর্শনে প্রেম সত্য বলিয়া নিতে অবশ্যই কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ঘোষ।

দেশবন্ধুর সাগর সঙ্গীত।

সারা বাংলার অঙ্গে অঙ্গে তোমার সঙ্গীত জড়িয়ে দিয়ে, ওহে সার্থকজন্মা! আজ তুমি কোন্ সাগর পারে তোমার বাঁশী বাজাতে চলে গেলে? মন-ব্রজবাসে বনমালীকে বসিয়ে "বাসনাহীন উদাসী সন্ধ্যায়" ওহে ভক্তচূড়ামণি! কোন্ শব্দহীন ভুবন গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিয়ে দিতে মহাপ্রয়াণ করেছ? সোণায় তোমার হৃদয় ভরে গেছে, পূজারী তোমার "পরাণ প্রদীপ ঊর্দ্ধে তুলে ধরে' তোমার প্রার্থনা সফল করেছেন।"

"দীক্ষা দাও ওগো গুরু, মন্ত্র দাও মোরে
পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভ'রে"

দীক্ষা পেয়েছ বীর! মন্ত্র পেয়েছ! পূজার সঙ্গীতে গুরু তোমার প্রাণ ভরে দিয়েছেন।

তাই আজ

"আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপধুনা দিয়া
পুণ্যধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির।"

"সাগরসঙ্গীতে" কবি আত্মহারা হইয়াছেন—তাঁহার জীবন যেন এক "মহান মুহূর্ত্ত" প্রবেশ করিয়া "সব ভাসাইয়া" লইয়া গিয়াছে যে "একটি প্রভাতের লাগিয়া" তিনি "এতকাল জাগিয়া" ছিলেন, সিন্ধু সমীপে তাঁহার সেই প্রভাত মিলিল; বুঝি চণ্ডীদাসের মতো তিনি কাঁদিয়াছিলেন

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা"

তাই তাঁহার পিয়াসা মিটিল—হৃদয় ভরিয়া উঠিল, নয়নে বান ডাকিল—তিনি মিলনকে দৃঢ় করিতে চাহিলেন। বিরহের আতঙ্কে কম্পিত হইয়া গাহিলেন।

"যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুইজনে মিলিব হে! গাব দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার বহিবে প্রহরী"

সমুদ্রের "অন্তর হ'তে অমৃতের ধার" কবির চিত্তকে ডুবাইয়া দিল, তাঁহার 'অনিবার তৃষ্ণা কাঁদিয়া উঠিল' শ্রান্তি-হীন অনিবার ব্যথার তরঙ্গ গর্জ্জন, "গীতরাজ" সিন্ধুর অনন্ত শব্দকল্লোলের সুরে মিশিয়া গেল, তিনি জানিতে চাহিলেন,

"ওগো, কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনা রাশি হৃদয় ভরিয়া
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর !"

তখন মনে পড়িয়া গেল সিন্ধু যে তাঁহার "অভিশপ্ত বন্ধু"! অমনি তাঁহার মুক্তির ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়া সমবেদনায় বুক ভরিয়া উঠিল—

"আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকলি ত্যাগি
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর !"

তবু তিনি ওপারে যাইবার আকাঙ্খা ছাড়িতে পারিলেন না,

"(আমি) দেখিব ওপারে গিয়ে
শুনিব পরাণ দিয়ে
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার !
এ পারের গীতগুলি
পরাণে লয়েছি তুলি
মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার ।"

এই ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও বৈরাগ্য তাঁহার কবিতাকে প্রাণময়ী করিয়াছে। কাব্যের পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়; ভালমন্দ কবিতা প্রাণের কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়া থাকে। আজ কর্ম্মবীর দেশবন্ধুর জগৎজোড়া নামের উপর তাঁহার কবিতা প্রশংসার দাবী রাখেনা—বরং বলিতে পারে, মনখানি তাঁহার এত ভক্তি-ঢলঢল, বৈরাগ্যময় ও কাব্যপ্রবণ বলিয়া এই বিপুল ত্যাগ ও চৈতন্য সেখানে অধিষ্ঠান করিয়াছিল। তাঁহার কবিতার বৈরাগ্য ও আবেগ অপ্রতিহতভাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। যে অপূর্ব্ব সংযমের সাহায্যে তিনি চিত্ত জয় করিয়াছিলেন, রাজশ্রীমণ্ডিত হইয়াও যে ব্যাকুলতার সহিত শ্রীভগবানকে আঁকড়াইয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। বিলাস তাঁহার চিত্তবিভ্রম আনে নাই শুধু এই জন্য, যে তিনি হৃদয় রাজ্য হইতে জগদী-শ্বরকে নির্বাসিত করেন নাই। তাই বিলাত যাইবার পথে, "সোনার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে" তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে বিচিত্র গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন—তাঁহার সকল সুখের রাশি পুষ্প হইয়া ফুটিল ও সব দুঃখ সঙ্গীত হইয়া উঠিল।

সেই নীলনর্ত্তন নবঘন বিথার, অরুণোদয়ের লীলায়িত সৌন্দর্য্য, তাঁহাকে সব ভুলাইল, তিনি বিহ্বলচিত্তে গাহিলেন—

"কি মোরে করেছ আজ ! মনখানি মম
শত শত তন্ত্রীভরা গীত যন্ত্র সম
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
গরবে গৌরবে আজি উঠেছে বাজিয়া।"

ভাবসুষমায়, ছন্দ সৌন্দর্য্যে, কাব্যগৌরবে ইহা অতুল-নীয়। "বিশ্বের নিশ্বাস জীবন কুহরে" লাগিয়া এইরূপেই বুঝি মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠে। সাগর সঙ্গীতের এই কয়টী ছত্র কবিকে অমর করিয়াছে, ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, পণ্ডিতের গবেষণার ফল নয়, এ যে জীবনের এক চরম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়। বহু জন্মের পুণ্যফলে এমন পরশ পাওয়া যায়—পাইলেই ত ধন্য ! সব কামনা সব বাসনার শেষ ! পুনঃ পুনঃ গতাগতির অবসান।

কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস, গানের সুর তান লয় মান জানিবার অবসর নাই, শুধু কবির অন্তর তলে চিদাকাশ মুক্ত হইয়া গেল—অন্তরের ছায়ায় পরাণ ভরিয়া উঠিল— "প্রভাতের আলো মাঝে সাঁঝের আঁধারে" তিনি সাগর সঙ্গীতে অনন্তের সাড়া পাইলেন।

সারা দিনখান এই গীত শুনিয়া তাঁহার মনের গাঁথ খুলিয়া গেল, তাঁহার "কুঁড়ির মতো" পরাণ ফুটিয়া উঠিল তিনি অপূর্ব্ব আলোকে, অতুল ঐশ্বর্য্যে নিসর্গ শোভায়

ডুবিতে চাহিলেন না—তিনি শব্দ তরঙ্গে প্রাণ ভাসাইতে চাহিলেন

"চাহিনা কুসুম কুঞ্জ চাহি শুধু গান
শব্দ-তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ।
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া
আমার নয়ন-পাট। আমি অন্ধ হব
শব্দ-সাগর মাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না—ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।"

কবির কি আনন্দ! নয়নচক্ষুর অগোচর বিশ্বপ্রাণের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার মানস চক্ষে দেখিবার জন্য কি দুর্দমনীয় আবেগ!

Milton এর মতো "wisdom at one entrance quite shut out" করিয়া কবি কি Celestial Lightকে তাঁহার চিত্তগগন আলোকিত করিতে আহ্বান করিতেছেন? এই অপূর্ব্ব তন্ময়তা শুধু অনুভূতির বিষয়, সমালোচনার বহু উর্দ্ধে। বুঝি এই তাঁহার প্রার্থনার শুভ লগ্ন!

বিরাটের সামীপ্যে তাঁহার হৃদয় বৈরাগ্যে ভরিয়া উঠিল—তিনি অন্ধ হইয়া শব্দ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে চাহিলেন, আর কিছু তাঁহার চাই না—শুধু এই সুর এই গান বিশ্বের চিত্তবংশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হউক।

"এষা"র কবি সমুদ্রোপকূলে ঠিক এই বৈরাগ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—

"ঐ দূর চক্রবালে
রহস্যের অন্তরালে
আভাসে প্রকাশ পায় সে আদি কিরণ!
কোথা তুমি বিশ্বস্বামি!
কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি
কত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ জীবন মরণ।

'রৈবতকে'র ঐন্দ্রজালিক কবি সিন্ধু সৈকতে দাঁড়াইয়া সত্ব রজঃ তমঃ গুণের মিলন সমারোহ দেখিয়াছেন

"সত্ব ব্যোম, রজঃ বেলা, তমঃ পারাবার
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে—বিরাট মুরতি!

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নিজের চিত্তকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছেন

"তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ-পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
আমি অশান্ত বিরাম-বিহীন
চঞ্চল অনিবার
যতদূর হেরি দিগ্ দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

কি অপূর্ব্ব আনন্দ সৃষ্টি! কি পবিত্র সৌন্দর্য্য প্লাবন! তারপর যবনিকা সরিয়া গেল, কবি দেখিলেন "মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার।"

সোনার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে আর গীত বাজিতেছে না, এখন

"তরঙ্গ তরঙ্গ পরে কাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার!"

কবির বক্ষের মাঝে অমনি "মহা হাহাকার" উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর তরঙ্গ তুলিল—বাহিরে ঘোর ঘনঘটা, "বিদ্যুৎবিহীন নিশা" রবীন্দ্রের ভাষায় তখন

"আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির"

কবির চিত্ত শোকে, হতাশায় আঁধারে ছাইয়া গেল তিনি বলিলেন।

"তবে এস, ভেসে এস উন্মান আমার
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে
মরণ আঁধারে ভরা আকাশে বাতাসে।"

ঝড় বাড়িয়া চলিল, সিন্ধুর ছিন্নভিন্ন বক্ষে মরণ গর্জ্জিল, "ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু আঁধার পরশে" ভীষণ ভৈরব প্রলয় বর্ষণ করিল।

"লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিল মরণ গীতি অনন্ত আঁধারে।"

কবির হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল। অন্ধকার নীলাম্বুধির উন্মাদগর্জ্জনে "প্রকাণ্ড মরণ" তখন নাচিয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রের ভাষায় তখন

"বাল বাষ্প বজ্র বায়ু, লভিয়াছে অন্ধ আয়ু
নুতন জীবন স্নায়ু টানিছে হতাশে"

সেই ভীষণ প্রলয়ের দৃশ্য কবির চিত্ত হতাশায় ভরিয়া গেল, তিনি গাহিলেন।

"অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মন তরী
প্রলয় পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে।
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ
অবারিত বক্ষ মাঝে রবে তুমি আজ।"

পর মুহূর্ত্তেই বিধাতার সৃষ্টির প্রতি পরম করুণাতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি মরণ দেব রুদ্রকে ডাকিয়া বলিলেন

"হে রুদ্র মরণ দেব! জটী জটাধর!
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে
আপন হৃদয়-কুঞ্জে আপনারি গীতে!"

কবি নিজে মরিতে ভীত নহেন—

"আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হতে দিতেছিনু ধরা"

কিন্তু তিনি ভীষণ প্রলয়-দৃশ্যে ব্যথিত হন, বিশ্বসৃষ্টির প্রতি করুণায় সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

রুদ্র তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন—প্রলয় সঙ্গীত থামিয়া গেল, সিন্ধুর প্রতি অঙ্গে তরুণ উষার আলো আবার সোণার ঢেউয়ের মত বহিয়া গেল, নব নব স্বপ্ন উজ্জলিয়া উছলিয়া উঠিল, সিন্ধু আবার মনোজ্ঞ রাজ বেশে সাজিল।

কবির চিত্তের দ্বারে অনেক পুরাণো স্মৃতি আঘাত করিতে লাগিল—তিনি শান্ত সিন্ধুর মৌন মহিমায় ডুবিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন,—

"এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়
এখনো ওঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়"

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই আরাধনার প্রকৃষ্ট সময়, উষাস্নাত চিত্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়, তাই প্রসিদ্ধ মহিলা কবি শ্রীমতি কামিনী রায় এই প্রার্থনার সুরেই গাহিয়াছেন :—

"কাল, সেই সে যমুনা হেরিবে দু'আঁখি
তাই তারা নিশি জাগে
আমি কেহ না উঠিতে ত্যজিব শয়ন
জাগিবে না উষা আগে;
ধীরে উষাকর ধরি সেই পুণ্যজলে
নামিয়া করিব স্নান,
আমি সেই বারি পানে বিশ্বের পীরিতি
অমিয় করিব পান।
কাল প্রভাত মারুতে তরুণ কিরণে
কালিন্দীর শ্যাম কূলে
বুঝি ধরার বাঁধন আঁখি হতে মোর
সহসা যাইবে খুলে"

চিত্তরঞ্জন সিন্ধুর প্রাণমহিমায় উষা স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছেন—বাহিরের গীত, বাহিরের সৌন্দর্য্য কি তাঁহাকে ভুলাইতে পারে? সমুদ্রের অন্তর "দিবানিশি যে গীত করিতেছে" তিনি সেই গীত মাগিলেন, হৃদয় ভরিয়া দেশে দেশে সেই সঙ্গীত বিলাইবেন।

"শূন্য হাতে" তিনি সিন্ধুর নিকট আসিয়াছেন।

"আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পারে! হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালিদেও অন্তহীন অমৃতের ধার
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজল করি অন্তর আমার!

"গীতরাজ" সে প্রার্থনা শুনিলেন, কবির জীবনের "নিদ্রাহীন নিশি" সিন্ধুর সঙ্গীত তরঙ্গে মুখরিত হইল—হতাশার অন্ধকার মাঝে অপূর্ব্ব শব্দকল্লোল "তরঙ্গ হিল্লোলের" মতে— তাঁহার বক্ষে চক্ষে ঝাপিয়া পড়িল, তাহার পুলকরোমাঞ্চ হইল, তিনি এক অনির্ব্বচনীয় বিপুলতার পরশনে ধন্য হইলেন! সকল শব্দের মাঝে এক "শব্দাতীত বাণী" তাহার চিত্তনিকুঞ্জ ধ্বনিত করিল, তিনি প্রাণ ভরিয়া মিলন-সুখ ভোগ করিলেন।

এই মিলন শুধু অনুভূতির বিষয়, বিশ্লেষণের অতীত। বিশ্লেষণ ভাঙিতে পারে, গড়িতে পারে না। শুধু প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র। কবি অতলস্পর্শ রূপ সাগরে ডুবিয়া করুণার অমৃত পরশ লাভ করিয়াছেন। এই শুভমিলন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে বিচিত্র কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে তাঁহার প্রতিনিয়ত সজীব রাখিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইব সুধা"

সুধা খাইবার অধিকারী কে? অবসর কোথায়? সারাজীবন ত অমৃত ত্যজিয়া হলাহল পান করিয়া চলিয়াছি—মাস মাস করিয়া কত বর্ষ কাটিয়া গেল, তৃষ্ণা মিটল কৈ? ইন্দ্রিয়ের সুধমধু চয়ন করিতে করিতে বিশ্বনিকুঞ্জের কুসুমদাম টানিয়া ছিড়িয়া পিষিয়া ফেলিলাম তৃপ্তি মিলিল কৈ?

কবি তাই রূপ-করুণাতে মিলাইয়া মনের ধান্দা ঘুচাইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন; সিন্ধুর স্ব-রূপ তাঁহার মানস-নয়নে ভাস্কর হইয়া ফুটিয়াছে—

"সকল প্রকৃতি আজি পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে
× × × ×
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার!"

সকল সাধন ভজন আজ সফল হইয়া কবির চিত্তনিকুঞ্জ ফুলে ফুলে ছাইয়া দিল। এমন শুভমুহূর্ত্ত আর আসিবে কি?

"বিগলিত করুণায়" তরঙ্গ দল নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, "স্বনগম্ভীর বোলে" গগন ভরিয়া গিয়াছে, মধুর কীর্ত্তন রোলে চরাচর মুখরিত, প্রভাতের মুক্তবায়ু "আনন্দকীর্ত্তন ভারে" অন্তরের চারিদিকে পাগল হইয়া নাচিতেছে, কবি ভক্তিতে আত্মহারা, অন্তরে বাহিরে একাকার—

"হরিবোল! হরিবোল! করতাল বাজে যেন—
হৃদয়ে বাজোন কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন
× × × ×
দেবতার তরে আজ আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি! কি মধু বিরহ দিয়া"

তখন আর কিছু চাহিনা, শুধু একমুহূর্ত্ত এই ধ্বনির না বিরাম হয়, এই কল্পনা না থামিয়া যায়—শুধু প্রার্থনা,

"প্রাণারাম! প্রাণারাম! তোমা পাই কি না পাই
—সঙ্গে রেখো চিরকাল"

কোথায় গেল ছন্দ, কোথায় গেল শব্দবিন্যাস!
ঐ প্রেমে বিভোর হইয়া কান্তকবি রজনীকান্ত গাহিয়াছেন—

"সখা! তোমারে পাইলে আর
এ জনমে আর কিছু চাহিনা চাহিনা"

কি সুন্দর উপাসনা! কি গভীর প্রেম! হৃদয়ের কূলে কূলে ভক্তির এই মঙ্গলময় প্লাবন যে ধরিয়া রাখিতে পারি না!

পরমানন্দের আস্বাদ পাইয়া কবি অমিয়সাগরে ভাসিতে চাহিলেন—

"ওপারে কি ব'সে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল
পরাণ পরশ তরে আমারি মতন?

× × × ×

আমি যে তৃষিত বড় ওগো মহাপ্রাণ
আমি যে তৃষার্ত্ত অতি পরাণ-মাঝারে!
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ
আমারে ভাষায়ে দাও, তোমার ওপারে!"

তার পরেই ভক্তের চরম কামনা—"তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত সাগরলহরী সমানা"—এই লীলার অবসানের জন্য ক্লান্ত পথিকের শেষ নিবেদন বড় মর্ম্মস্পর্শী,

"এপার ওপার করি পারিনা আর
পার কোরে দাও মোরে ওগো পারাবার"

তখন তাঁহার হৃদয় মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, বিশ্বের রূপ রস গন্ধ তাঁহার নিস্পন্দ ইন্দ্রিয় গ্রামের অনুভূতির অতীত, তখন

"সাড়া নাই শব্দ নাই পরাণ মাঝারে"

তখন তাঁহার প্রাণ কবীন্দ্রের ভাষায়

"শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য সম করিয়া পান"

নীরব নীথর হইয়া রহিয়াছে।

Tennyson এই অনুভূতির জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন :—

"And the ear of man cannot hear and
the eye of man cannot see;
But if we could see & hear, this vis ion
—were it not he?

এই মহামিলনের আনন্দে বিশ্বপিতার "নিরূপম চরণতরে" তাঁর হৃদয় "প্রভাত কমল-সম" ফুটিয়া উঠিল। "কাঙ্গালপরাণ রাজার মত উজল" হইল—তখন তিনি নীরব ক্রন্দনে ভরা, তাঁর "চোখে নাহি জল"—শুধু উন্মত্ত আবেগে গাহিতেছেন :—

"খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে!
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও ওপারে তোমার!"

সাগরসঙ্গীত সমাপ্ত হইল; কিন্তু ইহার আবেগ, ইহার মূর্চ্ছনা, ইহার ধ্বনি অনন্তকাল বাঙ্গালীর হৃদয় তন্ত্রীতে ভগবৎপ্রেমের ঝঙ্কার তুলিবে। ইহার আধ স্বপ্ন আধ জাগরণের সুর, ইহার বিচিত্র রাগিনী, ইহার সাবলীল রচনাভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে প্রাণসুন্দরের বিমল রূপমাধুরী ফুটাইয়াছে। কবির এই ভক্তি-নীহারিকা রূপ গ্রহণ করিয়া কাব্যগগণ এক অপূর্ব্ব মৌন মহিমায় উজলিয়া রাখিবে

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্ম শ্লাঘী।

মায়ের কোমল বক্ষঃ ক্ষীর বিতরণে
সন্তান পালিছে; মার শ্লাঘা নাহি তায়;
মেঘের অমৃতময় বারি বরষণে
জগৎ বাঁচিছে; মেঘ যশঃ নাহি চায়।

রবি শশী. সুরু হ'তে পরম যতনে
আঁধার নাশিছে; কই, উচ্চ বাচ্য নাই।
অনল অনিল, যথানিয়ম পালনে
জীবের জীবন রক্ষা করিছে সদাই।

জননী, জলদ, বায়ু, শশাঙ্ক তপন
সৃজন যাহার তাঁরে দেখা নাহি যায়,
যোগী ঋষি হদ্দ হ'ল খুঁজে অণুক্ষণ,
জগৎ কারণ আহা, লুকিয়ে কোথায়?

বাহাদুরী যাঁর, তাঁরি আত্ম সম্বরণ,
অর্ব্বাচীন করে শুধু স্বগুণ কীর্ত্তন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার লোধ।

ভক্তি সাহিত্য।

রসময়ী রচনার নাম সাহিত্য। রসের পুষ্টি, প্রাচুর্য্য ও বিশুদ্ধিতেই সাহিত্যের উৎকর্ষ। সাধারণতঃ রস বলিতে আমরা রসনা-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে মধুর, অম্ল প্রভৃতি গুণ বুঝিয়া থাকি, সাহিত্যরস ঐ জাতীয় গুণ পদার্থ নহে। ঘটপটাদির প্রত্যক্ষের ন্যায় কোনও বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই সাহিত্য-রসের বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়না। দীর্ঘকালীন শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে অজ্ঞানের ক্ষয়ে যেমন জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে, সেইরূপ বহুকাল সাহিত্যের অনুশীলন (culture) করিতে করিতে মন হইতে রজ ও তমগুণ নিঃশেষিত হইলে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব চিত্তে সাহিত্যানুশীলন জনিত যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্বলিত চমৎকারের প্রতিফলন হয়, উহাই রস নামে পরিভাবিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ মনদ্বারাই এতাদৃশ চিদানন্দঘন চমৎকারের স্বরূপটি উপলব্ধ হয়। রতি (অনুরাগ) শোক, ক্রোধ, হাস, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা প্রভৃতি ভাবপ্রধান মানবের কতিপয় মনোবৃত্তি আছে। তদ্ তদ্ ভাবঘটিত সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনে ঐ নিস্ক্রিয় সুপ্ত বৃত্তিগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পেশী ও অপরাপর যন্ত্রে যে পরিবর্ত্তন হয়, এবং ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি যে সকল বাহ্য বিকার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ঐগুলি রসের ব্যঞ্জক। রস স্বপ্রকাশ; সূর্য্যের ন্যায় ইহার প্রকাশে অপর কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই। তিলে তৈল, দুগ্ধে ঘৃত, গুড়ে মাধুর্য্যের ন্যায় জগতের সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় পরমাণু হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্য্যন্ত এই রসও ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, ভিক্ষুক, শ্রমিক, বণিক, জ্ঞানী অজ্ঞানী, রাজা প্রজা, কর্ম্মী তত্ত্বজ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেই সমভাবে রসের কাঙাল। ইহার নিগূঢ় কারণ আনন্দ বা রস হইতেই এ বিশ্বের উৎপত্তি, রসেই স্থিতি এবং অন্তে রসেই ইহার নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ভগবতী শ্রুতির উক্তি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি"। "রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি," সেই পরমাত্মা শ্রীভগবান, রসস্বরূপ। ঐ রসময়ের স্বরূপানুভূতি হইলেই জীব, অকুতোভয়, সিদ্ধ, তৃপ্ত ও অমৃত হইয়া থাকে। শ্রুতির উপদেশ, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। ব্রহ্ম লাভ করিলে জীবের সর্ব্বভয় নিবৃত্তি ঘটে।

প্রবন্ধের আলোচ্য ভক্তি সাহিত্য। রস সাহিত্যের প্রাণ হইলেও ভক্তিসাহিত্যের প্রাণের প্রাণ ভক্তি। আমি কাব্য রসের একটু আভাস দিয়া আমার বক্তব্য ভক্তি সাহিত্যের রস তত্ত্বেরই বিবরণ করিতেছি। সুতরাং আমার বক্তব্যগুলি প্রধানভাবে ভক্তি রস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। নিবিষ্ট চিত্তে অনুভূতির পথে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কি মানব জগৎ, পশু জগৎ, পক্ষি জগৎ, এমন কি অতি তামস উদ্ভিদ জগতেও যেখানে যতটুকু রসের বিকাশ, সেখানেই জীবন, সুখ, ও আনন্দের নিত্যলীলার প্রচুর আয়োজন। স্বজাতীয় বস্তুর প্রতি স্বজাতীয় বস্তুর নৈসর্গিক আকর্ষণ, একটি বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক সত্য। ক্ষুদ্রতম অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেমন মহত্তম অগ্নিরই স্বল্প প্রকাশ, গবাক্ষ রন্ধ্র প্রবিষ্ট সৌরকর রেণুপুঞ্জ যেমন বৃহদায়তন সূর্য্যেরই প্রকাশভেদ, সচ্চিদানন্দ রসমূরতি শ্রীভগবানের অংশভূত জীবও তেমনি সেই রসার্ণবের এক একটি রসবিন্দু। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সমর্থনের জন্য প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বিজ্ঞ সাহিত্যিক মণ্ডলীর স্মরনার্থ প্রাচীন বৈদিক ও স্মার্ত্ত গ্রন্থের ২।১টি প্রমাণ উদ্ধার আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ বিখ্যাত মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩য় খণ্ডের ১ম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে; "যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নির অবয়ব স্বরূপ ও অগ্নি সমান রূপ সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ রাশি নির্গত হয়, তেমন অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে নানা প্রকার দেহোপাধিবিশিষ্ট জীব সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জীব সমস্তই তাঁহার অংশস্বরূপ।" এই শ্রুতি মূলেই শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় ১৫।৭ম শ্লোকে "মমৈবাংশোজীবলোকে

জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব জগতের অন্যতম প্রধান সাধক কবি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার ৭ম পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন ;—

"ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।
+ + + +
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।
+ + + +
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমান্॥" ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে, রসময় ভগবান্, রসময়ী প্রকৃতি ও রসকণ জীব লইয়াই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। এই প্রবন্ধ—সঙ্কলনকালে "আমি আছি কি নাই" এই প্রশ্ন যেমন নিরর্থক ও অজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি "রস কি, জগতে রস বলিয়া কিছু নাই" এইরূপ প্রশ্ন বা তর্কের কোন স্থান নাই। তবে পূর্ব্ব প্রশ্নে স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য প্রত্যক্ষ "আমি"র স্বরূপ সম্পর্কে যেমন বিবিধ সংশয়, বিপর্য্যয় ও তদ্গত সিদ্ধান্ত প্রচলিত, রসের পরিচয় জ্ঞান পথেও ঐ সকল বাদ বিতণ্ডা বন্ধুরতার সৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়মান। সতত অনুভূয়মান আত্মার মত "জীবন যোনি-যন্ত্রে"র মূল রস পদার্থের অপলাপ বুদ্ধির প্রশংসার কাজ নহে। প্রত্যুত উহার অপলাপে অথবা স্বদুর্ব্বোধ বোধে আলোচনার বিবর্তিতে আমরা মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম আনন্দের আস্বাদ হইতে চিরবঞ্চিত থাকিব। কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই এই মধুর রসতত্ত্বের বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগের মধ্যে কেহ সৌন্দর্য্যানুভূতি জন্য আনন্দ, কেহ দৈহিক সংবেদন বিশেষ (organic sensation) কেহ বিশ্বাস ও অনুরাগকে, কেহ ধর্ম্ম বিশ্বাসকে, কেহ বা কামনা, আনন্দ ও বিমর্ষ এই কয়টি ব্যাপারকে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে রসের ব্যঞ্জক বা ব্যঞ্জনারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর, সাহিত্যদর্পণ, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে রসের বিভাগ, বিচার, বিশ্লেষণ যে ভাবে হইয়াছে, অন্যত্র ততটা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণবদিগের রসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণির মতের অনুবর্ত্তী হইয়া এ প্রবন্ধের রসতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। নিরাকার আকাশ বুঝিতে হইলে যেমন স্বরূপ লক্ষণ (আকার প্রকারের দ্বারা বস্তু বোধ) অপেক্ষা তটস্থ লক্ষণের (লক্ষ্য পদার্থের বহিরঙ্গ গুণ দ্বারা উহার জ্ঞান) সাহায্যে উহা কতকটা সহজসাধ্য হয় ; এই রস পদার্থ বুঝিতে হইলে তেমন পূর্ব্বাচার্য্য প্রদর্শিত ইহার তটস্থ লক্ষণের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, এই রস সর্ব্বজনবেদ্য হইলেও এটি বস্তুনিষ্ঠ বা objective নহে, পরন্তু ভাবনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ (subjective)। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির ন্যায় ইহার বহিরিন্দ্রিয় সাধ্য প্রত্যক্ষ হয় না ; সুখ দুঃখাদির মত কেবল মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রসশাস্ত্রে এই মানস প্রত্যক্ষের উপায়রূপে তটস্থ লক্ষণ ঘটক "অখণ্ড, স্বপ্রকাশ চিন্ময়, বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য, লোকোত্তর, চমৎকার প্রাণ, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর (ব্রহ্মজ্ঞান সদৃশ)" এই বিশেষণ গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান রসব্যঞ্জনার সহিত উপমিত দেখাযায়। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ "মেঘাপায়ে অংশুমানিব" মেঘের আড়াল সরিলে যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্য প্রকাশ পায়, সাধনায় দ্বারা অবিদ্যার ঘোর কাটিলে তেমনি ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রাক্তন ও আধুনাতন সাধনা (অনুশীলন culture) সহজাত বাসনার উদয়ে সহৃদয় সাহিত্যিক (ভক্ত) এর হৃদয়ে এই "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" রসের উদ্বোধ হইয়া থাকে। জীব আনন্দের কাঙ্গাল। সে মধুমক্ষিকার ন্যায় নিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আনন্দের আহরণে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু সংসারের বিষয়ানন্দে তাহার আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হয়না। কারণ বিষয় অনিত্য, বিষয় সম্পর্কজনিত আনন্দ আসমাপায়ী এবং বিষয় ভোক্তাজীব ও অনিত্য স্বয়ং অনিত্য অনিত্য বিষয়ের মধ্য দিয়া নিত্যানন্দের আস্বাদ পাইবে কেমন করিয়া ? বিষয় ছাড়িয়া জ্ঞানের রাজ্যে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকা আজ কালকার দিনে জড়তাস

ও সম্ভব তাহা এই ভুক্তভোগী জ্ঞানযোগী সাহিত্যিক মণ্ডলীর পুণ্যতীর্থে সমাগত ব্যক্তিদের কণামাত্রও অবিদিত নহে। বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান কবি মধুসূদনের জীবনের কথা বোধহয় সকলেরই কিছু না কিছু মনে আছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালে জ্ঞানানন্দের দুন্দুভি যতই মধুর ও উদ্দীপ্ত হউক, কার্য্যক্ষেত্রে হাতেকলমে উহার সাধনা ও ফলভোগ করা কঠিন ব্যাপার। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, শ্রীচৈতন্যযুগে ধর্ম্মজগতে গাঙ্গুরের ন্যায় সাহিত্য জগতে যে সুবর্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছে, পূজ্যপাদ ভক্তসাহিত্যিকগণ উহার মূল প্রবর্ত্তক। ঐ সকল বিশ্বপ্রেমিকের পরমকৃপায় আজ পাপমলিন কলির জীব সংসারের মধ্য দিয়াই ভুবনসুন্দর শ্রীভগবানের সুমধুর ভজনারস উপভোগের অধিকারী হইয়াছেন। যুগ হিসাবে কলি কনিষ্ঠ হইলেও আজ সাত্ত্বিক গুণ পরিমায় কলি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। উদরায় সংস্থানে চিন্তান্বিত, পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, কন্যাদায়ে জীবন্মৃত, রোগশোকে জর্জ্জরিত মানব এই মহাতমযুগে ভক্তিসাহিত্য রসপানের মধ্যদিয়া নিত্যানন্দধামে যাইবার পথ চিনিয়া লইতেছে। প্রাকৃত জগতে মানব মাতাপিতার অহেতুক স্নেহ, পত্নীর নিঃস্বার্থ প্রেম, বন্ধু বান্ধবের নিরুপাধিক প্রীতি, সেবকের অকপট পরিচর্য্যার আনন্দ অহরহ উপভোগ করিতেছেন। এই প্রেম অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী। দেবগণ প্রাকৃত অমৃতপানে "অমর" নহেন। কল্পান্তে তাঁহাদের মরণ আছে। প্রেমরস পানমত্ত ভক্তের জরা নাই, মৃত্যু নাই, সে অজর অক্ষর অমৃতধামের শাশ্বত অধিবাসী: তাই ভক্তি সাহিত্যের যাঁহারা সাধনাসিদ্ধ কবি, তাঁহারা নিখিল রসসার সর্ব্বস্ব মূরতি, অপূর্ব্ব লীলা-কল্লোলবারিধি, অতুল্য মধুর প্রেম প্রিয়মণ্ডলমণ্ডিত, মুরলীকলকূজনমোহিতমুনিমানস, অনুপম রূপলাবণ্য চমৎকৃত চরাচর, কুটিল চঞ্চলকুন্তলকমনীয়, গোলোকবিহারী শ্রীহরিকে বৃন্দাবন বিহারী নায়ক শিরোমণিরূপে তাঁহাদের সাধনার ধন সাহিত্যের নায়ক, আর নবীনা কিশোরী, খঞ্জন-গঞ্জননয়না, সঙ্গীতনৃত্যকলাকুশলিনী, রম্যনর্ম্মালাপ চতুরা, মঞ্জুলকুন্তলধারিনী, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী, শালী-নতাময়ী, নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে এই ভক্তি-সাহিত্যের আলম্বনবিভাবরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই আলম্বনবিভাব নির্ব্বাচনে তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব। নামের গুণে আকৃষ্ট হইয়া কেবল দেবতাকে নায়ক করিলেই সেই সাহিত্য শ্রেষ্ঠ হয় না। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সাহিত্যিককে শ্রীভাগবতরস আস্বাদন করান। দেবচরিত্র নিখুঁত হইলেও অনুচিকীর্ষু মানবের পক্ষে উহা সর্ব্বথা অনুকরণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মানবের আদর্শ যতই উচ্চ হউক, মানব কখনও মানব সুলভ ভ্রম প্রমাদাদি দোষের কবল হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দিব্যাদিব্য নায়ক অর্থাৎ যিনি দেব হইয়াও লীলাবশে আত্মবিস্মৃত এবং জন্ম-গ্রহণে মনুষ্য সম্পর্কযুক্ত তিনি যে কাব্যের নায়ক আর তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নায়িকা যে কাব্যের আলম্বন, ঐ কাব্যই জগতে চিরস্থায়ী ও কাল বিজয়ী হইয়া থাকে। দেবচরিত্র যদি সবিশেষ ভাবে মনুষ্য চরিত্রানুকৃত না হয়, তাহা হইলে ঐ চিত্র পড়িয়া, শুনিয়া কিম্বা উহার অভিনয়াদি দর্শন করিয়া পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকের হৃদয়ে ঐ সকল ক্রিয়ার ফললাভ সুদুর্ঘট। কুলিশকঠোর পুষ্পপেলব লোকোত্তর চরিত্র এই দিব্যাদিব্য নায়কেই সম্ভবে। তুচ্ছ লোকাপবাদ শ্রবণে অযোনিসম্ভবা অগ্নিপরীক্ষিতা বনবাসসহচারিনী অনবদ্যাসুন্দরী সহধর্ম্মিনীর নির্ব্বাসন, আবার পঞ্চবটী বনে তাঁহার সখীর সমক্ষে পূর্ব্বস্মৃতির উন্মেষে পলকে পলকে মূর্চ্ছা, সোণার সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন, এভাব কেবল রামায়নের নায়কেই সম্ভবে; অন্য কোন যুগের, অন্যকোন দেশের অন্যকোনজাতির ও অন্যকোনভাষার কাব্যে আছে কিনা ষোলআনা সন্দেহ। রস বা আনন্দ অনাদিকাল সিদ্ধ নিত্যপদার্থ। কিন্তু আশ্রয়ভেদেও গ্রহীতার গ্রহণ শক্তির তারতম্যে উহার প্রতীতির ভেদ হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

—*—



প্রতিভা

১৫শ বর্ষ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩২ ৩য় সংখ্যা

মধুসূদনের মেঘনাদ বধ।

সমালোচন।

(প্রথম প্রস্তাব)

অমর কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের মুকুটমণি। আজ কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী গত হইতে চলিল ইহা বিরচিত হইয়াছে, তৎপর এই অর্দ্ধশতাব্দী কাল যাবৎ নানারূপ প্রতিকূল সমালোচনার ঝড় ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, নানারূপ অনুকূল সমালোচনায় এই কাব্য যে সময় সময় অভিনন্দিত না হইয়াছে এমন নহে। তবে ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে এমন অপূর্ব্ব কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে আর একখানি নাই, এবং দিন দিন ইহার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বই হ্রাস হইতেছে না; এবং বাঙ্গলা ভাষার শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ব্যতীত আর কোন গ্রন্থেরই পাঠক সংখ্যা ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারেনা, বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

মেঘনাদ বধ রচনায় কবি বিজাতীয় বিদেশের কবিগণ কর্ত্তৃক বিশেষতঃ হোমারদ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, ইহার ভাষা বাঙ্গলাভাষার প্রচলিত কোনও প্রকার সুললিত ছন্দোবন্ধে গ্রথিত নহে, আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যতপ্রকার দোষ নির্দ্দেশ করেন, তাহার অধিকাংশ দোষই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, স্থানে স্থানে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ প্রয়োগে, স্বকপোলকল্পিত স্বেচ্ছাচার সৃষ্ট শব্দ যোজনায় এবং একত্র বহু উপমান ব্যবহারে দুরারোহ গিরি অথবা দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধুর ন্যায় ইহা সর্ব্বসাধারণের সুখ-সেব্য হওয়ার পথে বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ অসংখ্য ত্রুটী বিচ্যুতিতে ইহার কলেবর অনবদ্য হইতে পারে নাই। এই সকল প্রতিকূল কারণ পরম্পরা সত্ত্বেও এই কাব্য কিরূপে বাঙ্গলাভাষায় ও বঙ্গ সমাজে একটি শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রথম প্রচারের সময় ইহার বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রধান প্রধান মনীষি-বৃন্দের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও কি কি কারণে বঙ্গ

সমাজে ইহার পাঠক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং

"তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা, কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

কবির এই বিনয়পূর্ণ সাহঙ্কার উক্তিটি যে সার্থক হইয়াছে অর্থাৎ এই কাব্যটি বঙ্গসমাজে কি কি কারণে কবির আশার স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ইহার প্রথম ও একটী প্রধান কারণ কবির আখ্যান বস্তু নির্ব্বাচন। এই বিষয়ে কবি যে সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশের অসাধারণ ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। [illegible] বলিয়া এ বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মহত্ত্বের বৃথা গর্ব্ব করা অশোভনীয় হইলেও একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে আমরা একটী প্রাচীন সভ্য [illegible] বর্ত্তমান বংশধর। বর্ত্তমানে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইলেও [illegible] আমাদের একটী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, গৌরব-[illegible] ছিল, যাহার উত্তরাধিকারী-সূত্রে আমরা অন্ততঃ [illegible] অস্পষ্ট [illegible] সহিত অল্পাধিক [illegible] পাচ্ছি। এই [illegible] প্রাচীন সমাজে সম্পূর্ণ নূতন [illegible] করিয়া সমাজের সকল [illegible] সঞ্চারিত করত স্থায়ী আসন [illegible] পক্ষান্তরে প্রাচীন আখ্যান [illegible] রচনায় যে গুণপনা প্রদর্শিত হইতে [illegible] সহজ স্তরে অনায়াসে তাহার প্রভাব [illegible] যোগ্যতা লাভ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন আখ্যান অবলম্বনে নবীন কাব্য রচনায় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইতে পারে সেক্সপীয়ার, কালিদাস, মিল্টন, মাঘ ও ভারবী প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত কবিগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সেক্সপিয়রের অধিকাংশ নাটকের উপাখ্যান ভাগ প্রাচীন ইতিহাস ও প্রচলিত কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মূল আখ্যানই মিল্টনের প্রধান কাব্যের ভিত্তিভূমি। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ ও ভারবি সকলেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আখ্যান অবলম্বনে তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন

এস্থলে একথা স্বীকার্য্য যে প্রাচীন আখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থ রচনায় সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে কবির নিজের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গত আশঙ্কা বর্ত্তমান। কিন্তু তাহাতে যে সুবিধা আছে, তাহাও উপেক্ষার যোগ্য নহে। প্রধান সুবিধা এই যে গ্রন্থগত মূল পাত্র ও পাত্রীগণ সমাজের সুপরিচিত, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনশ্চক্ষে আপনা-আপনিই ভাসিয়া উঠে, তৎপাঠে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ অথবা মনঃসংযোগ রাখার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, বিশেষতঃ সাধারণ ভাবে সকলেরই চিত্তে ঐ সব পাত্র পাত্রীগণের চরিত্রের বিশেষত্বের কতকটা ছায়াপাত হইয়াই আছে, এমতাবস্থায় তদবলম্বনে নূতন কাব্য রচনায় নিপুণতা ও কলা কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিলে, অনায়াসেই তাহা সমাজে হৃদয়গ্রাহী হইয়া, পুরাতনের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিও সমাজে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

আমরা এস্থলে বঙ্গ সমাজ ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যদিয়া আমাদের বক্তব্য [illegible] পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব। বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন যুগ অবধি বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাব্য গ্রন্থ প্রাচীন আখ্যান, প্রাচীন কিম্বদন্তী অথবা পুরাণের ছায়া অবলম্বন ব্যতীত বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিকঙ্কনের চণ্ডী ও মনসার ভাসান এই দুইখানা গ্রন্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গ্রন্থ ইতিমধ্যেই বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু এই দুই খানি গ্রন্থের মধ্যেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীর আখ্যানও লোকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে শুধু মনসার ভাসানোক্ত বেহুলার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী সমাজের উপর স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। যে

কারণে এই কাব্যটি সমাজে এইরূপ অভাবনীয় গৌরবের আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ীভূত না হইলেও, ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে সীতা সাবিত্রীর দেশে সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণে যিনি তাঁহাদের অনুরূপ হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পতি-ভক্তি, অপরিসীম ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জন ইহকালের চরম বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সুমধুর অথচ চিত্তদ্রবকর কাহিনী যে ভক্তি-রস-প্রবণ সহৃদয় বঙ্গসমাজ সাদরে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এ দেশে পুরাণ উপপুরাণের পদাঙ্ক অনুসরণেই প্রথম প্রথম কাব্য গ্রন্থের সৃষ্টি হয়; এবং পুরাণ উপপুরাণের দৃষ্টান্ত অনুসরণেই নানা সময়ে নানাবিধ দেব দেবীগণের পূজা প্রচারের গৌণ উদ্দেশ্যে প্রাচীন যুগে বহু কাব্য বিরচিত হইয়া থাকিলেও একমাত্র বেহুলার আখ্যানই সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

মৌলিক আখ্যান কল্পনায় বা রচনায় বেহুলার কবি বা কবিগণ যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না ; তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সেই উপাখ্যান কল্পনায় সেই কবি বা কবিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বগামী মনীষিবৃন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন ; এমন কি এই বেহুলার আখ্যানটিকেও মৌলিক কল্পনার লীলা না বলিয়া সতীত্বের চরম উৎকর্ষ প্রদর্শনে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় অপর আর একটি উজ্জ্বল চিত্র ব্যতীত আর কিছু না বলিলে অসঙ্গত হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে একেবারে সম্পূর্ণ মৌলিক আখ্যান রচনা করিয়া সমাজে স্থায়ী আসন লাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

এই গড্ডলিকাগতিক বাঙ্গালীজাতির মধ্যে মধুসূদনের নামের সহিত এই অপবাদের কোনরূপ সংস্রব নাই বলিয়া যাহারা এতকাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট অপ্রীতিকর হইলেও সত্যের অনুরোধে একথা বলিতে হইতেছে যে, মধুসূদনের সর্ব্বপ্রধান কাব্য, এমন কি যাহার উপর তাঁহার অমরত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত, সেই কাব্যের মূল উপাদান দেশের আপামর সাধারণের সুপরিচিত ও দেশীয় সমাজের সকল স্তরের উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগাবধি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া আজ পর্যান্ত যে আদিকবির বর্ণিত চির মনোহর, চির নূতন রাম সীতার অপূর্ব্ব আখ্যান অক্ষুণ্ণ ভাবে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, সেই রামায়ণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রথমতঃ তজ্জন্যই তদীয় কাব্য সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের কবি এই আখ্যান বস্তু নির্ব্বাচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, [illegible] হৃদয়তন্ত্রীর স্পন্দনের ইতিহাস [illegible] সহিত আবদ্ধ করিয়া সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

কোন্ মহেন্দ্রক্ষণে যে আদি কবির অমর তুলি হইতে রামসীতার মনোহর কাহিনী [illegible] চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই ; কিন্তু এই বিশাল ভারতে তদবধি দেশের উপর কত প্রকার ঝঞ্ঝা, কত প্রকার রাজ-নৈতিক, সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহার ফলে অবিরত যে কত প্রকার পরিবর্ত্তনের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; অপর দিকে সেই সুবর্ণযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে [illegible] ভাবের কত শত শত পুরাণ, উপপুরাণ তন্ত্র শাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থাদির স্তূপ বিরচিত হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা নাই। কিন্তু এই যুগ [illegible] ব্যাপিয়া এই সব অসংখ্য প্রকার প্রলয় বা বিপ্লব সমূহের মধ্যে এই যুগে যুগে বিভিন্নমুখী অনন্ত পরিবর্ত্তনের [illegible] সমূহের মধ্যে এই বিশাল দেশের সংখ্যাতীত নরনারীর [illegible] উপর কোন্ গ্রন্থ চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে এক কথায় বলিতে হয় তাহা রামায়ণ। রামায়ণ বর্ণিত রামসীতার কাহিনীর মত আর কোন গ্রন্থের আখ্যান এই অনন্যসাধারণ গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। মেঘনাদ বধের কবির বিশেষত্ব এই, তিনি স্বাভাবিক অসাধারণ ক্ষমতাবলে সেই গ্রন্থের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ আপন প্রধান

কাব্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজের উপর স্থায়ী ভাবে তাহার আসন সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আবার বলি, আখ্যান-বস্তু নির্ব্বাচনে এই উপাদান গ্রহণ করিতে সমাজের উপর তাঁহার যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও সুগভীর নিপুণতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতুলনীয়, অগ্রাহ্য, স্মরণীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ—নিজ কাব্যে রামায়ণের সম্পূর্ণ আখ্যানের সার-সংগ্রহ। কিন্তু কবির কৃতিত্ব শুধু এই আখ্যান বস্তু নির্ব্বাচনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় রামায়ণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সামান্য সার্দ্ধ দুই দিবসের ঘটনা উপলক্ষে নয়টী মাত্র সর্গের অতি ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে অসাধারণ কৌশলে পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে ও স্বগত উক্তির মধ্য দিয়া রামায়ণের প্রায় সমগ্র কাহিনীটি অতি মার্জ্জিতভাবে সংক্ষেপে বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। [illegible] আস্বাদনে [illegible] অনধি[illegible] দিলু। [illegible] সংস্কৃত অভিজ্ঞ[illegible] বাঙ্গালীকে [illegible] মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম [illegible] যে কিরূপ গুরুতর [illegible] দেশের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত [illegible] চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কবিজননীর [illegible] গানে সে [illegible] গিয়াছেন [illegible] মধুসূদন বিজাতীয় [illegible] একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা যে কিরূপ ভিত্তিহীন, বাস্তবিক মধুসূদন প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এবং 'খ্রীষ্টধর্ম্মে সভ্যতার প্রভাব বর্ত্তমান' * এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকিলেও তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় যে জাতীয় ভাব ও ধারার প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় চির প্রবহমান ছিল, তদীয় চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর 'কৃত্তিবাস' নামক একটি মাত্র কবিতা হইতেই তাহার অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারা যায়;—যথা :

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা, কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নাম সুবঙ্গ ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়ন রঞ্জন রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে। আপনি ভারতী
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
[illegible]
[illegible] জন-নন্দন [illegible]
[illegible] লিলা যথা [illegible]
[illegible] সঙ্গীত [illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] মর নাম সুমধুর [illegible]
[illegible] বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।

[illegible] সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র [illegible] নব নব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির [illegible] যেরূপ নব নব আকাঙ্ক্ষা ও ভাবের সঞ্চার হইতেছে, [illegible] কৃত্তিবাসে আর তাঁহার মনের সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাইতেছে না। সে অভিনব ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে সেই প্রাচীন গাঁথা শুনিতে উৎসুক হইয়াছে। মেঘনাদ বধ তাঁহার সেই নবীন উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে; তাই আজ বাঙ্গালীর নিকট মেঘনাদবধ

* মধুসূদন বলিতেন—"Christianity has a civilising influence."—

চির আদরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কবি কৃত্তিবাসের তর্পণোদ্দেশে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার ন্যায় আজ গভীর আনন্দের সহিত মুক্তকণ্ঠে সেই সুন্দর কবিতার পুনরাবৃত্তি করিয়া এস আমরা মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হই ;—

"জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
শ্রীমধুসূদন-নাম, যেন বাণীপতি
শ্রীমধুসূদন তুমি এ বঙ্গ ভবনে
ঝঙ্কারে তোমার কণ্ঠে নিজে বিনাপাণী
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়ন রঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে,
রশ্মি মানিকের দেহে ;—আপনি ভারতী
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে
পূর্ব্ব জনমের তব স্মরিহে সুকৃতী !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা রূপ সঙ্গীত লহরী,
তেমতি যশস্বী তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম অভিনব তানে
সবাল্মীকি কবিগণে তপে তুষ্ট করি।"

তৃতীয়তঃ—নানাবিধ প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যানের অপূর্ব্ব সমাবেশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মধুসূদনের পূর্ব্বে যে সমস্ত কাব্য প্রণীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কাব্যই পুরাণ ও উপপুরাণের আদর্শে বিরচিত। সুতরাং সেই আদর্শের অনুসরণে কবিগণ গ্রন্থারম্ভে অর্থাৎ উপক্রমণিকায় নিজ নিজ রুচি অনুসারে দেব দেবীর স্তুতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পৌরাণিক প্রচলিত বিবিধ আখ্যান সমূহের অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ অথবা শ্রীকৃষ্ণের মাথুর বা বৃন্দাবন লীলাপূর্ণ পুরাণ-প্রসিদ্ধ বিষয়াদির অবতারণা করতঃ তাহাদের অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়া তৎপরে মূল কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। ইহাই এদেশের সুষ্ঠু প্রাচীন রীতি। মধুসূদনের বিশেষত্ব এই যে তিনি ঐ সব আখ্যানের কোনটিই যথাযথ বর্ণন করেন নাই ; অথচ ঐ সব আখ্যানের অধিকাংশ নানাস্থানে নানারূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কোন কোন আখ্যানের অনুরূপ ঘটনা স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ মনোজ্ঞ কল্পনার সাহায্যে নিজ কাব্যের মূল ঘটনার অঙ্গীভূত করতঃ অনুপম ভাব ও ভাষায় বর্ণনে তাহা অভিনব রঙ্গের তুলিকায় চিত্রিত অতি প্রাচীন সুপরিচিত চিত্র যেন আবার নূতন বেশে পাঠকের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়া তাঁহার মনে কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে নবীন আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপে আমরা কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পৌরাণিক আখ্যান-সুলভ দানব ভয়ে উৎপীড়িত ইন্দ্রানীসহ দেবেন্দ্রকে কৈলাস-ধামে মহেশ্বরীর নিকট শরণাপন্ন হইতে দেখিতে পাই, যোগাসন পর্ব্বতে মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পার্ব্বতীসহ মন্মথের দর্শনলাভে কৌতুকাবিষ্ট হই, সপ্তম সর্গে বসুন্ধরা দানবের ভার লাঘবের জন্য বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন ও স্তবে প্রবৃত্তা দেখিয়া কবি অন্যত্র যে সুন্দর উপমায় গীতার সর্ব্বজন পরিচিত

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মনা সৃজাম্যহং।

এই শ্লোকটীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যথা "বিপজ্জাল

বেড়ে যবে কারে, মহত যে সেই তার গতি
কি হেতু মৈনাকগিরি ডুবিলা অর্ণবে
দ্বৈপায়ণ হ্রদে কুরুকুল মহামতি
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে"

ঠিক তাহার প্রতিবিম্ব নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইন্দ্রজিৎ বধে জগদম্বার সহায়তা লাভের জন্য অকালে সিন্দুরাঙ্কিত ঘটে দেবী পূজায় দাশরথিকে ব্রতী দেখিয়া বঙ্গ গৃহাঙ্গনের অতুলনীয় আনন্দ সঞ্চারকারী শারদীয় দুর্গোৎসবের চিত্র ফুটিয়া উঠে। এইরূপ নানাবিধ দেশীয় প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যান সমূহ মনোজ্ঞভাবে মধুসূদনের কাব্যে মূল ঘটনার পারিপার্শ্বিকরূপে সংযোজিত হওয়ায় দেশীয় প্রাচীন রীতি অনুসরণেই যেন ইহা উত্তম ভাবে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া

বঙ্গবাসীর ভ্রম জন্মে এবং ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় কবি নাই ও জাতীয় ভাব আর কাব্য রচিত হইতেছে না, এই যে একটি প্রধান অভিযোগ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে উক্ত উক্তি সম্যক প্রযোজ্য হইতে পারে না। মেঘনাদ বধের কবি বিদেশীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে যে সকল ত্রুটী বিচ্যুতিতে কাব্যটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই বলিয়া সুধী সমালোচকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও এইরূপ নানাবিধ পৌরাণিক, চির পরিচিত আখ্যান সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশে মেঘনাদ বধ যে আমাদেরই স্বজাতীয় কাব্য ও ইহা যে স্বজাতীয় ভাবে ও রীতিতে বিরচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই পাঠকের মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। তাই কবির উপর্য্যুক্ত ভ্রম বা [illegible] সত্ত্বেও এই কাব্যটী জাতীয় কাব্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চতুর্থতঃ—মূল আখ্যান কল্পনায় পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের একনিষ্ঠ সনাতন দেশীয় আদর্শ গ্রহণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কবি হোমার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, এই একটি গুরুতর অভিযোগে সুধী সমাজ তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু কাব্যের মূল আখ্যান কল্পনায় কবি যে স্বদেশীয় সমাজের সতীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন সে কথা সকলেই বিস্মৃত হইয়া যান। বস্তুতঃ কবি বহুবিধ বিদেশীয় ভাষার কবিগণের সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাবলে তদীয় কাব্যে তৎসমূহের ছায়াপাত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সর্ব্বোপরি তিনি মূল আখ্যান কল্পনায় ভারতের গৌরব স্থল পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ আদর্শ গ্রহণ করিয়া পতির সহিত বীরাঙ্গনা প্রমীলার সহমরণ কল্পনা করায় কাব্যটি ভারতবাসীর হৃদয়ে হোমারের অন্ধ অনুকরণ স্বরূপ প্রতিভাত না হইয়া সীতা, সাবিত্রী, বেহুলারই অপর আর একখানা মনোমদ চিত্রের ন্যায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লঙ্কাধিপ রাক্ষসরাজ ও তাঁহার পরিবার এবং সৈন্য সামন্তের বর্ণনায় কবি শুধু হোমারের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা বলা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আদি কবি বাল্মিকী রাক্ষসগণকে বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, ভক্তিপরায়ণ ও বীরাগ্রগণ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণে রাবণ সম্বন্ধে বিভীষণ রামের নিকট বলিতেছেন, "দশানন বেদবেদাঙ্গ পারগ, মহাতপা ও অগ্নি হোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা।" হনুমান রাক্ষসগণের সম্বন্ধে লঙ্কা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের মূলানুগত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহার কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"অতি গৌর অতি কৃষ্ণ বর্ণ নহে কার
সবার মূরতি মহা শকতি আধার।
সে সব চরের মধ্যে কেহ বহুরূপ,
সুরূপ সুতেজ আর কেহ বা বিরূপ।
দেখিলেন, তিনি যত নিশাচরগণ
বিশেষ আস্তিক, মিষ্টভাষী বিচক্ষণ,
মধুর সুশ্রাব্য নাম তাদের সবার
প্রধান তাহারা সবে জগত মাঝার।
তারা সবে গুণবান গুণ অনুসারে
কার্য্য অনুষ্ঠান করে বিবিধ প্রকারে।
তাহাদের পরিণীতা বনিতা সকল,
বিশুদ্ধ স্বভাবা পতিপ্রাণা অবিরল।
সে রমণীগণ চারু বসন ভূষণে।
তারকার মত দীপ্তি পায় অনুক্ষণে।

এইরূপে আর্ষ রামায়ণে রাক্ষসগণের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও অনুমান হয় যে তাহারা বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরাগ্রগণ্য, তাহাদের রমণীগণও পতিব্রতা। তবে তৎসত্ত্বেও তাহারা রজঃ ও তমোগুণে প্রভাবান্বিত ছিল। কৃত্তিবাসে রাক্ষসগণের বর্ণনা এইরূপই দেখিতে পাই। সুতরাং রাক্ষসগণের বর্ণনায় মধুসূদনকে সমধিক প্রীতিসম্পন্ন দেখিয়া তাহা একমাত্র হোমারের অন্ধ অনুকরণ প্রসূত না বলিলে বিশেষ দোষ নাই। পক্ষান্তরে হোমারের

প্রভাবের ফলেই স্বত্ত্ব গুণের আধার হিন্দুর আরাধ্য বিষ্ণুর অবতার রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র কোন কোন স্থলে অযথা ভীরুতা কলঙ্কে কলঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাও বা কি করিয়া বলি? কবি যে এ বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত তাহা আমরা বলিতেছি না, তবে ঐসব অসঙ্গত স্থল সমূহ ব্যতীত অন্যত্র আবার রামকে দয়ার সাগর, শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহারে রত, অতিথি পরায়ণ ও নির্ভীক অথচ জিঘাংসায় বিরত ও দেবারাধনায় তৎপর প্রভৃতি আর্য্যোচিত গুণ গ্রামে বিমণ্ডিত করিয়া বর্ণন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। মেঘনাদ দেববরে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া যুদ্ধার্থী হইলে অজেয় হওয়ায় কৌশলক্রমেই তাঁহার নিধন সম্পাদন করিতে হইয়াছে; এইরূপ কৌশল ছলনারই নামান্তর, ইহাতে স্থল বিশেষে প্রতিনায়কের চরিত্রে ভীরুতা প্রদর্শন অনিবার্য্য। বিশেষতঃ পুরাণ কারগণের চরিত্র সৃষ্টিতেও যে সকল স্থলে ছলনা অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে, তথায় নায়কের প্রকৃত বীরোচিত গুণগ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; ইহাই স্বাভাবিক; এমন কি মূল রামায়ণেও তাহার অসদ্ভাব নাই। মূল রামায়ণে মেঘনাদবধের পূর্ব্বে মেঘনাদের সহিত লক্ষ্মণের তিন দিবসব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতেও মেঘনাদকে বটবৃক্ষের মূলে আসিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিতে অবসর দেওয়া হয় নাই; প্রকৃত প্রস্তাবে শত্রুকে যথোচিত রূপে সুসজ্জিত হইয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অবসর না দিয়া ছলনা ক্রমেই তাঁহার নিধন সম্পাদন করিতে হইয়াছে। কবিগণ নিরঙ্কুশ, মধুসূদন ছলনা কল্পনায় না আনিয়া উভয় পক্ষকেই তুল্যরূপে সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত করিতে পারিতেন। সপ্তম সর্গে দশাননের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে যেখানে দেববৃন্দ মুহুর্মুহু পশ্চাৎ-পদ হইয়াছেন, সেখানেও লক্ষ্মণকে বীরের মত অস্ত্রক্ষেপে দশাননকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছেন, দেখিতে পাই। মধুসূদন কাব্যের সূচনায় মেঘনাদবধে কৌশলের অবতারনা করিয়া ঐ কৌশলের সহিত বীরত্বের একটা অকপট সন্ধি করিয়া বসেন নাই, অথচ নিজ স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বীতায়ও Byron এর ন্যায় অতীব সহৃদয়তার বশে বঙ্গ বাল্মীকির ছটি পংক্তি ধরে রাম ও রামের বাহিনী তাঁহার প্রীতির পাত্র নহে এবং তিনি যে রাক্ষসগণের প্রতি সমধিক প্রীতি-সম্পন্ন এ কথার উল্লেখ করিতে ত্রুটী করেন নাই†। কাব্যের মধ্যে রাম লক্ষ্মণের চরিত্রে এইরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের চরিত্র হিন্দুর আরাধ্য দেবোচিত সদগুণে বিযুক্ত করিয়া আদৌ চিত্রিত করা হইয়াছে এরূপ মত প্রকাশ করা যায় না। বিশেষতঃ সকল স্থানে তাঁহার যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কাব্যোচিত অনুসারে। আমরা যথা স্থানে এই সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এস্থলে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐ [illegible] কবি প্রমীলার চিত্র অঙ্কনে হিন্দুর একান্ত দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শের সহিত হিন্দুগণের সতীদাহ প্রথা এবং রাজপুত মহিলাগণের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জ্বলন্ত অনলে নিজ দেহ আহুত দেওয়ার আখ্যান ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের বীরত্বের সংমিশ্রণে তান্ত্রিক মহাশক্তি যুগপৎ অসুর নাশিনী ও বরাভয়-দায়িনী জগজ্জননী ভগবতীর আদর্শে তদীয় জগৎসংহারকর্ত্রী কালী ও বিশ্বপালিনী অন্নদাত্রী এই উভয় চরিত্রের রাসায়নিক সংযোগে যে মনঃপ্রাণ মুগ্ধকারিণী প্রমীলার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা হোমারের অন্ধ অনুকরণ অপেক্ষা দেশীয় ভাব ও ধারার সুস্পষ্ট চিহ্নই দেখিতে পাই। এইরূপে তদীয় কাব্যের মূল আখ্যানের পরিণতি-কল্পনা পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণ প্রসূত না হইয়া কবির অজ্ঞাতসারে তদীয় স্বদেশীয় প্রাচীন কালাগত পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভাব নিচয়ের সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাই তদীয় কাব্য দেশবাসীর হৃদয়ে চিরকাল গভীর ভাবে চিরস্থায়ী আসন লাভের যোগ্য হইয়াছে।

† "I hate Ram and his troops." People here grumble and say that the heart of the poet in Meghnada is with the Rakshasas. And this is the real truth.'

পঞ্চমতঃ—অখ্যান কল্পনায় উপন্যাসের মনোহারিত্ব ও ঘটনার সলীল দ্রুতগতি।

বর্ত্তমান যুগ উপন্যাস প্রধান যুগ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এক কাদম্বরী ব্যতীত উপন্যাস গ্রন্থ নাই বলিলেই চলে। পাশ্চাত্য সাহিত্য উপন্যাসে পরিপ্লাবিত। পাশ্চাত্য দেশীয় কাব্য, উপন্যাস ও প্রাচ্য কাব্য, উপন্যাস রচনার রীতি স্বতন্ত্র। প্রাচ্য রামায়ণ, মহাভারতে উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া ধীরে ধীরে প্রথম হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত পুনরায় সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কবির অসাধারণ ক্ষমতার দরকার, শ্রোতারও বিশেষ অবসরের প্রয়োজন। শ্রোতাকে শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, কবিও অসাধারণ নিপুণতা সহকারে প্রাগবর্ণিত সংক্ষিপ্তসারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ রসময়ী ভাব-বহুলা ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং শ্রোতাকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় প্রণালী অন্যরূপ। তাহাতে ঘটনার মধ্য হইতে প্রসঙ্গটি আরম্ভ করিয়া কৌশলক্রমে সমস্ত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনায়াসে শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শ্রোতা কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অপ্রকাশিত আনুসঙ্গিক পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনা জানিতে উদ্বুদ্ধ হয়। মেঘনাদ বধ কাব্যে এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে এবং সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ডের প্র উপসংহার ভাগের একটি মাত্র ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কবি মধ্যস্থানে যবনিকা উত্তোলন করিয়াছেন, এবং উপন্যাসের ন্যায় মনোহারী ঘটনা পুঞ্জের সমাবেশে তাহাতে সমগ্র রামায়ণ ও প্রাচীন পুরাণের বহু বিষয় তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তদুপরি এক একটি সর্গে প্রাচীন কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে একটী মাত্র বিষয় বর্ণন না করিয়া লীলাঙ্কিত গতি ভঙ্গীতে উদ্দাম হরিণ শিশুর চাঞ্চল্য ও ক্ষণপ্রভার আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাবকে অতিক্রম করিয়া এক একটি সর্গ মধ্যে একবার স্বর্গে, একবার মর্ত্ত্যে একবার রামের শিবিরে কখনও লঙ্কার অভ্যন্তরে রক্ষোরাজের অন্তঃপুরে কখনও বা সমুদ্রের অতল গহ্বরে গমনাগমন করিয়া, বর্ণন ভঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। গতি ভঙ্গীর এরূপ সলীল দ্রুত সঞ্চরণ দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অপূর্ব্ব পুলকসঞ্চারে আত্মহারা হইতে বাধ্য হন। এইরূপে এই কাব্যটি একটি মনোজ্ঞ উপন্যাস কাহিনীর ন্যায় ঐন্দ্র-জালিক শক্তিতে সর্ব্বত্র সমৃদ্ধ থাকায় এবং বঙ্গভাষার পূর্ব্ব-গামী কোন কবির কাব্যে এইরূপ নূতন অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ না থাকায় ইহা অচির কালমধ্যে গৌড়জনের বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং ইহার এই বিশেষত্ব কিছুতেই অপনীত হইবার নহে।

ষষ্ঠতঃ—এ দেশীয় প্রাচীন রাজপুরীর সমৃদ্ধি ও চিরকালাগত অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির সন্নিবেশ।

এই ক্ষুদ্রকায় কাব্যে গাম্ভীর্য্য ও রাজন্যবর্গের চিরাগত অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রভৃতি এমন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে যে বঙ্গভাষায় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। এ দেশে পুরাণই হউক কি মহাকাব্যই হউক কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে তৎসমস্ত সাধারণতঃ বিরচিত হওয়ার রীতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবর্ত্তিত। রামায়ণ রাজরাজরার ঘরেরই কথা। কিন্তু ইহাতে শুধু সাধারণ পারিবারিক জীবনের কথাগুলিই এমন স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তৎসমস্ত যেন সর্ব্বসাধারণের ঘরের কথার ন্যায়ই বোধ হয়; ইহাতে কুটিল রাষ্ট্রনীতি অথবা রাজত্ব সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যার অবতারণা করা হয় নাই। এমতাবস্থায় এই গ্রন্থে অঙ্কিত চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তার উপর কাব্যের গাম্ভীর্য্য ও উৎকর্ষের নির্ভর করে। মূল রামায়ণে তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় বিরচিত মেঘনাদ বধের মত ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থে, নয়টি মাত্র সর্গে, কিঞ্চিন্ন্যূন ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে, দুই দিনের ঘটনা উপলক্ষে আদ্যোপান্ত মূল রামায়ণের মূল ঘটনার বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পুরাণেতিহাসকীর্ত্তিত বহু কথার অবতারণা করিয়া রাজভবনো-চিত রীতি, নীতি, আচার, অনুষ্ঠানাদির যথাযথ বর্ণন করতঃ

গাম্ভীর্য্য ও উন্নতভাব রক্ষা করা যে অতিশয় দুরূহ কার্য্য তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মধুসূদন নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে মধুসূদনের দশাননের রাজসভাবর্ণনা প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজসভার ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়। প্রাচীরের উপর হইতে সমগ্র লঙ্কার যে মনোমদ ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, আর্ষ রামায়ণের বর্ণনা ব্যতীত অন্যত্র তাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। সমুদ্রের উপকূলে [illegible] বেষ্টনকারী রামের শিবির বর্ণনায়, হরগৌরীর প্রিয় নিকেতন কৈলাসধাম, বিষ্ণুর লোকাতীত রম্য বৈকুণ্ঠ নিকেতন, ইন্দ্রের অমরাবতী, ধর্ম্মরাজের যমপুরী প্রভৃতির বর্ণনায় কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দুই এক কথায় বুঝান অসাধ্য। পরন্তু এই সব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই রাজপুরীর চিরাগত প্রথা ও অনুষ্ঠানাদি দুই চারিটী পংক্তির সাহায্যে এমনি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে ইহাতে তদীয় কাব্যে প্রাচীন রীতি নীতির সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এতদ্বারা উক্তজন অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত এদেশের লোকের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই সব বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা মেঘনাদের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হওয়ার পরে বন্দীগণের সুন্দর বন্দনাগীতির বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। এই বন্দনা গীতিতে সংক্ষেপে কবিত্বপূর্ণ উক্তিতে স্বর্ণলঙ্কার [illegible] যেরূপে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সোনার ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধঃপতনের একটি হৃদয়দ্রাবকর চিত্রই পাঠকের নেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। মন্দোদরী রাণীর আলয়ে প্রমীলার সহিত মেঘনাদের আগমনে পুনরায় এইরূপ বন্দিনীগণের গান শুনিতে পাই। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই সব বন্দনাগীতিতে রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য ও রাজজনোচিত আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার অনেক কবিতায় বন্দীর বন্দনাগীতি বর্ণিত আছে। রাজপুতনায় প্রচলিত চারণের গীতিও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এদেশেও বহুকাল যাবৎ তৎতৎস্থলে ভাটের গান প্রচলিত আছে। কিন্তু মেঘনাদ বধের এই গীতগুলির রচনা সময়োপযোগী ও স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হওয়ায় ইহাদের উপাদেয়ত্ব ও মাধুর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাব্যটিকে এমন গাম্ভীর্য্য প্রদান করিয়াছে যে তাহার তুলনা বাঙ্গলা ভাষায় আর কোন কাব্যে নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষের সম্ভাবনা নাই।

সপ্তমতঃ কাব্যের উপযোগী ইন্দ্রজালময় মায়িক জগৎ কল্পনা এবং দেশীয় প্রচলিত পবিত্র ও সুন্দর সুন্দর উপমার সমাবেশ।

অনেকেই কাব্য সমালোচনা করিতে বসিয়া ভুলিয়া যান যে ইহা কাব্য, ইহার জগৎ স্বপ্নাবেশময় কাল্পনিক মায়িক জগৎ; ইহা মনীষিগণের সুচিন্তিত কোনও দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ নহে। যদিও নীতিশাস্ত্র বা দার্শনিক গ্রন্থের ন্যায় কাব্যের শেষ বা চরম উদ্দেশ্য সমাজের শিক্ষাবিধান ও চিত্ত-শোধন, তথাপি কাব্য নীতিশাস্ত্র বা দার্শনিক গ্রন্থ নহে সুতরাং দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ বা নীতিশাস্ত্রের ন্যায় পদে পদে যুক্তি তর্ক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা কাব্যের বর্ণিত ঘটনা নিচয় বা কোন অংশের সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা, তাহার বিচার করিতে বসিলে কবির প্রতি যে কেবল অবিচার করা হয় তাহা নহে, পরন্তু কবির মানসী প্রতিমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া পড়িতে পারে, ইহা বিচিত্র নহে। তথাপি কবির ঐ স্থানেই বিশেষত্ব যে তিনি স্বপ্নাবেশময়ী মোহময়ী পুরী রচনা করিয়া দুর্দ্দান্ত মানবকে ভুলাইয়া "কান্তা সম্মিততয়া উপদেশযুজে" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই মোহময়ী পুরী কল্পনায় মহাকবি কালিদাস স্থানে স্থানে প্রচলিত নানা উপাখ্যানের আশ্রয় নিয়া নিজ কাব্য সুন্দর ও পাঠকের মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যেও আমরা স্থানে স্থানে এইরূপ মায়িক জগতের দর্শন লাভ করিয়া বিমোহিত হই। কৈলাসধামে মহেশ্বরীর শ্রীচরণে দেবেন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিধন প্রার্থী

হইয়া যখন স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে ছিলেন, তখন দেবীর আসন টলিয়া উঠিল, দেবী প্রিয়সখী বিজয়াকে তৎকারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বিজয়া খড়ি পাতিয়া গণিয়া দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় সমুদ্রতীরে সিন্দুররঞ্জিত ঘটে দেবীর আরাধনা করিতেছেন। প্রমীলা যুদ্ধে পতির মঙ্গলার্থ মহাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিলে শব্দবহ বায়ু তাহা দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে অপর দিকে উড়াইয়া নিলেন, মহাদেবীর নিকট সেই প্রার্থনা বহন করিলেন না। সীতার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী সুধানিধি গগনপথে থাকিয়া হাসিমুখে শ্রবণ করিতেছেন। এইরূপ ঘটনাপুঞ্জ স্বপ্নময় কাল্পনিক জগৎ রচনার সুন্দর নিদর্শন; ইহাদ্বারা মহাদেবীর সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণাবলী ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলেও কাব্যের উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে ও সাধারণের নিকট কাব্যটি অতি মনোমদ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মধুসূদন যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন, দেশীয় পবিত্র ও সুন্দর ভাব ও উপমা প্রয়োগ করিতে সযত্ন হইয়াছেন, তাই দশাননের রাজসভার বর্ণনায় মণিমুক্তার ঝালরের সহিত ব্রতালয়ের ফুলের ঝালরের উপমার সাক্ষাৎ লাভ করি, সীতার নিকট সরমার উপবেশনে সরীলতুলসীতলে দেউটীর শোভা দেখিয়া মোহিত হই, মেঘনাদ প্রমীলার সংক্রিয়া সম্পাদনান্তর রাক্ষসগণের লঙ্কায় প্রত্যাগমনে 'বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে' এইরূপ আপামর সাধারণ বাঙ্গালীর চির অনুভূত মর্ম্মস্পর্শী উপমার দর্শন লাভ করি। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ মধুসূদনের কাব্যটী এই সমস্ত কারণে আরও অধিকতর উপাদেয় এবং সহৃদয় সামাজিকগণের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অষ্টমতঃ—নায়ক নায়িকাগণের অলৌকিকত্ব প্রদর্শন।

এ দেশীয় কবিগণ কাব্যের নায়ক নায়িকাগণ যে সাধারণ মর্ত্ত লোকবাসী হইতে মহত্তর ও অলৌকিক গুণাবলি সম্পন্ন তাহার পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া শুধু তাহাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহারা যেন স্বর্গবাসী অমর, কোন না কোন প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত কিয়ৎকালের জন্য লীলা প্রকটন করিতে ধরাধামে অবতরণ করিয়াছেন, ইহা প্রদর্শন করিয়া তবে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ইহা কাব্যের নায়ক নায়িকাগণের লোকাতীত গুণাবলির জন্য প্রচ্ছন্ন একটি কারণ প্রদর্শন মাত্র। কালিদাসের ভাষায় যেন তাঁহারা বলিতে চান, 'ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ' অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে বিদ্যুতের লোকাতীত জ্যোতির স্ফুরণ অসম্ভব। দেবযোনি ব্যতীত কাব্যের মহনীয় আদর্শের উপযোগী গুণগ্রাম সম্পন্ন নায়ক নায়িকার আবির্ভাব যেন তাঁহাদের কল্পনায় অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। আমরা রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদিতে এই তত্ত্বের পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জয় বিজয় ভগবান বিষ্ণুরই দ্বারী ছিলেন, কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ায় ক্রমে দৈত্য ও রাক্ষসরূপে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে কোন প্রাচীন কাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, সর্ব্বত্রই এই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। মনসার ভাষাণে অনিরুদ্ধ এবং উষা দেবীকে লক্ষীন্দর ও বেহুলারূপে মনসার পূজা প্রবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যে, অন্নদা মঙ্গলে নলকুবেরের পুত্রকে ভবানন্দ মজুমদাররূপে অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্ত্যে আগমন করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য সাধনের পর আবার তাঁহাদের স্বীয়ধামে প্রত্যাবর্ত্তন প্রত্যেক কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন এই প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রমীলাকে মহেশ্বরীর অংশরূপে অবতীর্ণ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং সহমরণের পর পতি মেঘনাদ সহ দেবদেবের নির্দ্দেশ ক্রমে আগ্নেয় রথে কৈলাসধামে নীত হইয়াছেন দেখিতে পাই। মধুসূদন যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াও কাব্যটি এইরূপে স্বদেশীয় প্রাচীন সংস্কারের খাতে যথাসম্ভব প্রবাহিত করিয়া দেশের প্রাচীন ধারার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ নূতন ভাবের উদ্দীপনাময় এই মেঘনাদ বধ কাব্যে প্রাচীন সংস্কারের ছায়াপাতের প্রভাবে আমরা অভিভূত না হইয়া পারি না এবং মুগ্ধচিত্তে কবির বিশাল হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পাইয়া অজ্ঞাত পুলক সঞ্চারে আত্মবিস্মৃত হইয়া

পড়ি এবং বহু ত্রুটী বিচ্যুতি সত্বেও কাব্যটি আমাদের প্রাচীন কাব্যের রীতির অনুসরণে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের পার্শ্বে স্থায়ী আসন প্রদান করিতে স্বতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

নবমতঃ—মধুসূদনের স্বদেশ-প্রীতি।

মধুসূদনের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তীকাল হইতে নূতন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে নিদারুণ যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছিল, দেশের প্রচলিত রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির উপর নব্যশিক্ষালোকপ্রাপ্ত তরুণ বাঙ্গালীর মনে যে সুগভীর অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রে তাঁহারাই আবার হতভাগিনী জননী জন্মভূমি ও হতাদৃতা মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি সম্পন্ন হইয়া তদুন্নতি সাধনে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সেই সাধনার ফলেই জননী জন্মভূমিও মাতৃভাষার প্রতি দিন দিন ক্রমে আপামর সাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পরিপুষ্ট হইয়া আজ সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মহামনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন,

"পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে আমরা কোন উপকারই পাই নাই, একথা পুরা দমে বলিতে পারিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহাও ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।" তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জ্জন করিয়া ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিম-চন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্য নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়া ছিলেন, ও মাতৃমন্দিরে আনন্দ মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।" মধুসূদনের সম্বন্ধে ততদূর না বলিতে পারিলেও তিনি স্বদেশ প্রীতি ও স্বজাতি বাৎসল্যের ভাব রক্ষোগণের চরিত্রের মধ্যদিয়া এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে তাঁহার নিজের মনের ভাবটাই যেন পাঠকের মনে মুদ্রিত হইয়া পড়ে। প্রথমসর্গে রণস্থলে ভূপতিত নিহত আত্মজ বীরচূড়ামণি বীরবাহুকে দর্শন করিয়া,

"মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার।
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে,
সদা রিপুদল দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।"

প্রমোদ উদ্যানে প্রমদাকুল সহ কেলিরত মেঘনাদের নিকট ছদ্মবেশধারিনী প্রভাষা ধাত্রীরূপিনী কমলা লঙ্কার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বিষয় বর্ণন করিলে

ছিঁড়িলা কুসুম দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়; "ধিক মোরে", কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে বৈরি দল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ, আন রথ ত্বরা করি
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদ সেনাপতি পদে বৃত হইলে বন্দীগণ যে সমুচিত সঙ্গীতে তাঁহার অভিষেক অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বর্ণ লঙ্কার যে শোচনীয় দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে

তাহা ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রতিবিম্ব বলিয়াই আমাদের মনে সুগভীররূপে রেখাপাত করে ; যথা

নয়নে তব হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তবেণী শোকাবেশে তুমি
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার, উঠ গো শোক পরিহরি সতি।
রক্ষকুল রবি ওই উদয় অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ বিভাবরী।
উঠ রাণি, দেখ ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যায় বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল। দেখ তূণ যাহে
পশুপতি ত্রাস অস্ত্র পশুপত সম!
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী
কামিনী রঞ্জনরূপে দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপাত
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীর ধাত্রী তুমি!
আকাশ দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্ত কণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ রক্ষঃকুল কালি
দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।

শেষ কয় পংক্তিতে যে উচ্ছাসপূর্ণ বাক্যাবলী গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় উদগীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে দেশের দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য যেন ইঙ্গিতে দেশবাসিগণকে পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি ও দেশের প্রাচীন গৌরব স্মৃতিপথে উদ্দীপিত করিয়া সতেজে আহ্বান করা হইতেছে, অনুমিত হয়।

সোণার লঙ্কার দুর্দ্দশা বর্ণনায় যে কয়টী পংক্তি দশাননের উক্তিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা আমাদের জন্মভূমির অতীত গৌরবের এবং তৎসঙ্গে বর্ত্তমান হীনাবস্থার সুস্পষ্ট আভাষ প্রাপ্ত হই।

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলীতেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সমরে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী, হায় একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি,
তবে কেন আর আমি থাকিরে এখানে
কার রে বাসনা বলি করিতে আঁধারে!

বঙ্গের বর্ত্তমান রমণীকুলশিরোমণি মূর্ত্তিমতী বিনাপাণি স্বর্ণকুমারী দেবী তদীয় 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাসে ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের সূচনায় আখ্যানটি অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থারম্ভে মধুসূদনের এই কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কবির মনের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অধিকন্ত একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে ভারতের মর্ম্ম বেদনার সেই করুণ কাহিনীর শিরোভাগে এতদপেক্ষা অধিকতর উপযোগী কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইতে পারে এমন কবিতা বঙ্গভাষায় আর নাই।

কবিগণ কুহকিনী কল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন পাত্র পাত্রীগণের চরিত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহাদের অঙ্কিত কোন কোন চরিত্র তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রতিবিম্ব বলিয়া সমালোচকগণ নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাকবি মিল্টনের প্রণীত Samson Agonistes তদীয় শেষ জীবনের একখানা উজ্জল ফটোগ্রাফ মাত্র, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সাহিত্যজগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দশাননের চরিত্র অঙ্কনেও মধুসূদনের নিজ অসংযত হৃদয়ের ছায়াপাত হইয়াছে, ইহাও তেমনি স্বীকার্য্য কবির আত্মবিলাপ ও দশাননের বিলাপ প্রায় একই ভাবাত্মক, এবং তজ্জনাই দশাননের আত্মবিলাপ এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে আমরা তদ্রূপ ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কবির স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ বাৎসল্যের ভাবটি তিনি পাত্র পাত্রীগণের কথায় অভিব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। লঙ্কার শোচনীয় অধঃপতন বর্ণন করিতে গিয়া সর্ব্বস্বাপন্ন

জননী জন্মভূমি ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বিষয় তাঁহার মানস নেত্রে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দশ পদাবলীর বহু কবিতায় আমরা কবির এই ভাব আরও সুস্পষ্ট পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আমাদের উক্তির সমর্থনের জন্য দুইটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। সে কবিতা দুইটী এই—

বঙ্গভাষা।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর দেশে ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায় অনাহারে সপি কায়মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল কানন
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা মাতৃকোলে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে।
পালিলাম আজ্ঞাসুখে! পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে॥

আমরা।

আকাশপরশী গিরি দমিগুণ বলে
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে!
তাঁদের সন্তান কিহে আমরা সকলে
আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে?
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে?
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধ? কে কবে মোরে? জানিব কিমতে
বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে
রে কাল, পুরিবি কিরে পুনঃ নব রসে
রসশূন্য দেহ তুই? অমৃত আসরে
চেতাইবি মৃতকল্পে? পুনঃ কি হৃদয়ে
শুক্লকে ভারতশশী ভাতিবে সংসারে॥

সুতরাং আমরা অনায়াসে বলিতে পারি রঙ্গলালে "যে স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পড়িবে পায় হে" ইত্যাদি কবিতায় যে স্বদেশ হিতৈষীণার মূল প্রেরণার অঙ্কুর প্রাপ্ত হইয়া থাকি, মধুসূদনের কাব্যে তাহা আরও গভীরতর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; পরে তাহা ক্রমশঃ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শাখা প্রশাখা পত্র পল্লব ফুল ফলে পরিশোভিত মহাদ্রুমে পরিণত হইয়াছে এবং দেশে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই দেশাত্মবোধটী মধুসূদনের মেঘনাদ বধের স্থানে স্থানে যে ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যিনি একটু চক্ষু দিয়া পড়িবেন তাঁহারই দেখিতে বিলম্ব হইবে না। বলা বাহুল্য মধুসূদনের কাব্যে স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা এইরূপে ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত থাকায় দেশপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয়ে এই কাব্য দিন দিন অতিশয় আদরের বস্তু হইতেছে। ক্রমশঃ—

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

পরিচয়।

কে আমি? কি বলে আজি দিই পরিচয়,
এ বিশাল সৃষ্টি মাঝে কোথা মোর স্থান।
জগতের সুখে দুঃখে আমার হৃদয়,
কি সঙ্গীত ধরিত্রীরে করিয়াছে দান।
এতদিন? নিজে কি তা' পেরেছি বুঝিতে।
কে বলিবে! অন্বেষিয়া নিজ পরিচয়
হিয়ার গহন তলে ডুবিতে ডুবিতে
পেয়েছি মুকুতা কিম্বা শুকুতা নিচয়,
নিজেই তো বুঝি নাই, আজও খুঁজি তাই,
কত জন্ম জন্মান্তর যেতেছে বহিয়া
এইরূপে;—কতকাল; তবু নাহি পাই
জীবনের চিরন্তন রহস্য খুঁজিয়া।
কে মোরে কহিবে, কবে ঘুচিবে সংশয়,
আপনার মাঝে পাব নিজ পরিচয়।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

বাঙ্গালা ভাষার শিশুপাঠ্য পুস্তকের অভাব।

(ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে নির্ব্বাচিত)

সুসভ্য দেশ মাত্রেই মাতৃভাষার বড় আদর। ছোট বড় সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সকল প্রকার শিক্ষাই সভ্যদেশে মাতৃভাষার যোগে দেওয়া হইয়া থাকে। য়ুরোপে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম,—এসিয়ার নূতন সভ্য জাতি জাপানীও এই রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা, আফরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া (নিউজীলণ্ড সমেত) প্রভৃতি মহাদেশগুলি বৃহত্তর য়ুরোপ মাত্র, সুতরাং তথায়ও য়ুরোপের শিক্ষানীতিই অনুসৃত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই, পূর্ব্বে, সংস্কৃতভাষার সাহায্যে যাবতীয় উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান সভ্যতার চাপে সেই প্রাচীন শিক্ষানীতি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলেও প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলিতে সেই প্রাচীন ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। ইংরেজ আমাদের দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার পর, তাঁহাদের সভ্যতা এবং ভাষার স্রোতে আমাদের পুরাতন অনেকগুলি রীতিনীতির সহিত প্রাচীন শিক্ষানীতিও ভাসিয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগেই, আমাদের ভাগ্যবিধাতারা স্থির করিয়া দিলেন যে এদেশের উচ্চশিক্ষার্থিগণ ইংরেজিভাষার সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিবে। তবে যাঁহারা একেবারেই সেকেলে ভট্টাচার্য্য কিংবা মৌলবী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সংস্কৃত কিংবা আরবী পারসী ভাষার সাহায্যে পুরাতন পুথি পড়িতে পারিবেন।

এই ব্যবস্থার ফলে, এদেশের ছাত্রেরা ইংরেজীভাষার সহায়তায় বিদেশী বিদ্যা মুখস্থ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা উপেক্ষিত হইয়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত কোন গতিকে রহিয়া গেল। পাঠশালায়, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যে বিদ্যা ছাত্রগণকে শিখান আরম্ভ হইল,—তাহাও এদেশী বিদ্যা নহে,—পরন্তু একেবারে বিদেশী বিদ্যা। এদেশের যখন সুদিন ছিল, তখন এদেশের পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক পহ্লবী, গ্রীক, আরবী প্রভৃতি ভাষার যোগে রূপান্তরিত হইয়া এসিয়া এবং য়ুরোপের সর্ব্বত্র বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জন এবং শিক্ষাপ্রদান করিত; বৃহৎকথার কথাগুলি আরবীভাষার সাহায্যে চমৎকার চটকদার বেশে আরব, পারস্য হইতে য়ুরোপের শেষ সীমাপর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বাদশা বেগম হইতে কৃষক ও কৃষক-গৃহিণীর চিত্তরঞ্জন করিত। ইংরেজী সভ্যতার তীব্র আলোকে উনবিংশশতাব্দের পরাধীন বাঙ্গালী পণ্ডিত মহাশয়গণের মানস-নয়নে এমন ধাঁধা বা চকাচৌঁধ লাগিল যে তাঁহারা বাঙ্গালী শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তকের উপাদান এদেশে খুজিয়া পাইলেন না। বিষ্ণুশর্ম্মার দমনক-করটকের যে গল্পগুলি এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া য়ুরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথাকার খোকাখুকীদের মন ভুলাইতেছিল, সেই গল্পগুলিই আবার ফিরিয়া আসিয়া "কথামালার" আকারে আমাদের খোকাখুকিদের কণ্ঠে ছুলিল। Murray's Spelling Book, Rudiments of Knowledge এবং Moral-class Book প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তক ভাষান্তরিত অথবা রূপান্তরিত হইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করিল। রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ এবং মহাকাব্য ও নাটকগুলিতে যে কত শত আদর্শ চরিত্রের নরনারীর জীবনবৃত্ত না হউক উপাখ্যান রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি গ্রন্থকর্ত্তৃগণের দৃষ্টি পড়িল না; পরন্তু য়ুরোপ হইতে "ডুবাল" প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের চরিতাখ্যান চয়ন করিয়া আমাদের শিশুদিগকে শুনাইবার আবশ্যকতা হইল। Geography ভূগোল, Arithmetic পাটীগণিত, Geometry ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি, History ইতিহাস ইত্যাদি নূতন নামরূপ পরিগ্রহ করিয়া পাঠশালার পড়ুয়াদিগের বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিল। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, আমাদের উচ্চাবচ সমুদয় শ্রেণীর শিক্ষালয় হইতে স্বদেশী শিক্ষা একেবারে দূরীকৃত হইয়া তাহার স্থলে

ইংরেজী বিদ্যার নকল সর্ব্বত্রই আধিপত্য করিতে লাগিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে, উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে, বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি একেবারে হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় পড়িবার মত কিছুই নাই" এই ধারণা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গেল এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু নকল ইংরেজে পরিণত হইয়া গেলেন।

পিতৃ-পুরুষের পুণ্যফলে শীঘ্রই কিন্তু এই গতি ফিরিল। সেই শুভ প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাসের আলোচনার স্থল ইহা নহে। ক্রমশঃ অনেকগুলি সাহিত্যসাধকের সাধনার ফলে বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্য দেশে সুপ্রতিষ্ঠ হইল,—বাঙ্গালা ভাষার দুর্নাম এবং দারিদ্র্য অনেকটা দূর হইল। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকটা চলিয়া গেল এবং সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখায় নব নব পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী মহাপুরুষ স্বর্গগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিবৃন্দের অদম্য চেষ্টার ফলে বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন,—লোকে বলিল "বিমাতার ঘরে মার একটু ঠাঁই মিলিল।" বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং বি, এস সি, পর্য্যন্ত যাবতীয় পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং এম, এ, পরীক্ষায়ও বাঙ্গালা ভাষার স্থান স্থিরীকৃত হইল। বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সম্মান অনেকটা রক্ষিত হইল। বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর মলিন মুখ উজ্জ্বল হইল।

সম্প্রতি প্রবেশিকা এবং মধ্যপরীক্ষায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন বলিয়া শুনিতেছি। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা যে শুভসংবাদ, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ; অথচ, এই সংবাদে ছাত্রগণ যে খুব আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা বোধহয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন যে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ এবং পরীক্ষা প্রদানের ফলে তাঁহাদের মধ্যে "পাশের" সংখ্যা কমিয়া যাইবে। ইংরাজী ভাষার কতকগুলি ছত্র "ঝাড়া মুখস্থ করিয়া" অনেকেই "পাশ" করিতে পারিতেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বেলায় তাহা করা কঠিন হইবে। তাঁহারা বলেন যে ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই "বেঙ্গলী" ভাল জানেন না,—সুতরাং এই ব্যবস্থায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

এই সহজ ব্যবস্থায় বিপরীত ফলের আশঙ্কা কেন হইতেছে ? ইহার আসল কথা এই যে, অনেক স্কুলেই বাঙ্গালা পড়ানর সুব্যবস্থা নাই। খুব বড় বড় নামজাদা স্কুলেও বাঙ্গালা পড়ানর ভার যে সকল "পণ্ডিতের" উপর ন্যস্ত আছে,—তাঁহাদের দ্বারা পড়ান ভাল হয় না। Bengali—Teacher এর বেতন সামান্য, তাঁহার মর্য্যাদাও কম। "পণ্ডিত" মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের জ্ঞান-গবেষণা যাহাই হউক, অধ্যাপনায় উৎসাহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকগণের বেতন এবং মর্য্যাদা ইংরেজী ভাষার মাষ্টার মহাশয়দিগের বেতন ও মর্য্যাদার সমান না হইলে স্কুলে বাঙ্গালা ভাষা পড়ানর আদর হইবে না। এই ব্যবস্থা অবশ্যই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের অধীন, এবং আশা হয়, ক্রমশঃ তাঁহারা এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবেন।

নিম্ন শ্রেণীর বালকবালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের নিতান্ত অভাব। এদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার এক প্রবল অন্তরায় বলিয়া বোধহয়। ইংরাজী ভাষার শিশুপাঠ্যপুস্তকগুলির তুলনায় বাঙ্গালা ভাষার সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তকের বড়ই অভাব লক্ষিত হয়। ৺মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পুস্তক খানির আদর্শ লইয়া ঐ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত হইয়া থাকে। ইংরাজী স্কুলের নবম হইতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য সাহিত্য পুস্তক গুলির ভাষা এত কঠোর যে উহাদের যথাযথ উচ্চারণ করাই কঠিন হইয়া পড়ে,—অর্থ বা মর্ম্মগ্রহণের ত কথাই নাই। কতকগুলি বিদ্যালয়ে নবম হইতে সপ্তম শ্রেণীতে যে বাঙ্গালা বহি পড়ান হয়, তাহাদের পাঠের অর্থ বা মানি করান হয় না। দাঁড়

ভাঙ্গা কঠোর সন্ধি সমাস-সমন্বিত সংস্কৃতভাষার শব্দসম্ভার সমুচ্চয়ে সৃষ্ট এই ভাষার আড়ম্বর দেখিয়াই সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। অথচ ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলেই তাঁহাকে ৮ তারা শঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ পড়ান এবং তাঁহার পদ পদার্থ সন্ধি সমাসাদি লইয়া বিব্রত করা হয়। এইরূপ প্রথায় কোন ভাষায়ই অধিকার লাভ করা আদৌ সম্ভব কিনা, তাহা এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনের শিক্ষাব্যবসায়ী সভামহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমি শিক্ষা ব্যবসায়ী নহি,—সুতরাং শিক্ষা-দানের গূঢ় রহস্য অবগত নহি; তবে, ফল দেখিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন-প্রণালীর বিশেষ দোষ আছে।

ইংরাজী শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির অধিকাংশই যেরূপ ছোট ছোট শব্দ বাছিয়া বাছিয়া রচিত হইয়া থাকে, আমাদের শিশুপাঠ্য পুস্তকে সেরূপ হয় না। ক্রমশঃ ছোট হইতে বড় শব্দ এবং সরল হইতে জটিল রচনা প্রণালী ইংরাজী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। একই রূপ স্বরবর্ণের উচ্চারণ অভ্যাস করাইবার জন্য নানারূপ কৌশল তাঁহারা করিয়াছেন জটিলতর সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ শিখাইবার ব্যবস্থাও তাঁহাদের বেশ সুন্দর। ভাষার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য (Idiom) গুলি প্রথম হইতেই শিখাইবার চেষ্টা আছে। আমাদের দেশে, বাঙ্গালা ভাষার শিশুপাঠ্য পুস্তক গুলিতে ঐরূপ মূল-তত্ত্বের প্রয়োগ কি চলেনা ? এদেশে এখনও সেই সনাতন নিয়মে বড় বড় তেতালা চৌতালা সংযুক্তবর্ণের অতিব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

সরল এবং সহজ ভাষায় বাঙ্গালা শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনার প্রতিকূলে এক বাধা আছে। পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় প্রাদেশিক পৃথক্ পৃথক্ ছোট ছোট ঘরুয়া কথা আছে। কলিকাতার ককনী ভাষায় বই লিখিলেই ঢাকার শিশুরা বুঝিতে পারিবে না এবং পক্ষান্তরে কোচবিহার রঙ্গপুরের চলিত কথায় পুস্তক রচনা করিলে কলিকাতা এবং ঢাকা উভয় স্থলেই অচল হইবে। এই সমস্যা সামাধানের উপায় কি ?

এই সাহিত্য সম্মেলনে বাঙ্গালার সকল প্রদেশেরই সুশিক্ষিত সজ্জন বৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। এরূপ সুযোগ বৎসরের মধ্যে একবারই পাওয়া যায় বলিয়া আমি আপনাদের দরবারে একটি নিবেদন করিতে চাই। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বিভাগের অধিবাসী এবং এ সম্বন্ধে উৎসাহ-শীল ১০।১২ জন মহাশয় ব্যক্তি একত্র হইয়া যদি একটি সাবকমিটি করিয়া বঙ্গের সর্ব্বদেশে প্রচলিত, সহজ বোধ্য, সরল অথচ সাধু শব্দকোষ একটি সংগ্রহ করেন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই শব্দকোষে দুই কি আড়াই হাজার নিত্য ব্যবহার্য্য (গৃহস্থালী, চাষ বাস, জন্তু জানোয়ার, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সম্বন্ধে) শব্দ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। আমার প্রস্তাবমত একবৎসরের মধ্যে যদি এরূপ একটি ছোট শব্দকোষ সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দকোষের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করা অনায়াস সাধ্য হইবে। ম্যাকেমিলানের King Primer এ সর্ব্বশুদ্ধ ২০০ দুইশতের অধিক শব্দ নাই আমার মনে হয়, দুই হাজার সহজ সহজ Standard শব্দ সংকলন করিতে পারিলে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতভাবের তিন চারিখানি পুস্তক রচিত হইতে পারিবে। আপনাদের এই বিশাল সম্মেলনে শাব্দিক, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক বহু বিশেষজ্ঞ সজ্জন আছেন। আপনারা কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রস্তাবটির সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ভক্তি সাহিত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একই বস্তুর দৃষ্টিভূমি (stand oint) ভেদে প্রত্যয়ভেদে যুক্তি ও বিচার সিদ্ধ। সূর্য্যমণ্ডলবাসী, অন্তরীক্ষবাসী ও ভূলোকবাসী একই সূর্য্যকে বিভিন্নরূপে দেখেন। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কংশরাজের রঙ্গালয়ে এইরূপ পিতামাতার নিকট শিশু, প্রেয়সীগণের চক্ষে প্রিয়তম, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের নিকট সাক্ষাৎ যমদণ্ড, গোপবালকদিগের নিকট রাখাল এবং মহারাজ কংশের দৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। বিষয়টা কল্পনার ফল নহে, বাস্তব সত্য। বাস্তবজগতে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীকে রাজমহিষী তাঁহার প্রিয়তম, রাজকুমার স্নেহময় পিতা, বন্ধুবান্ধবগণ স্নিগ্ধ মিত্র, সেবকমণ্ডলী মহামহিম প্রভুরূপে দর্শন করিয়া থাকে। পায়স, ক্ষীর ও ক্ষীরমোহনে একই দুগ্ধের যেমন রূপ ও স্বাদ ভেদ হয়, সাধক ভক্তের সাধনার ক্রমভেদে তেমনি একই ভগবান্ বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম সগুণ উপাসনা। ভক্তের সহিত ভগবানের এই রসময়ী লীলার মূলে সৃষ্টি রহস্য, বাল গোপাল, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, লীলা বিগ্রহ এ সকলে ভারতবাসীর মজ্জাগত বিশ্বাস। বিদেশী সম্রাটের নাম মাত্র শ্রবণের ন্যায় নির্গুণ ভগবান জগতের সহিত অসহোযোগ করিয়া সুখ পান আপত্তি নাই, কিন্তু রাজভক্ত প্রজা ঐরূপ অসহোযোগী রাজা লইয়া সুখী হইতে পারে না। সে স্বহস্তে রাজকর দিয়া, ফুলের মালা পরাইয়া, প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া রাজসেবার আনন্দের ভাগী হইতে ভালবাসে। অবশ্য এ একটা বড় সমস্যা। আমি কেবল আমার কথাগুলি যে উন্মত্তের প্রলাপ নহে, তাহার প্রমাণার্থ অদ্বৈতবাদীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য্যপাদের ভাষ্যের (বেদান্ত দর্শন ১ম অঃ, ১ম পাদ ২০ সূত্র) "স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্" এই কয়টি কথার প্রতি এবং উদ্ধৃত চূর্ণক অংশে "পরমেশ্বরস্য,ইচ্ছাবশাৎ, সাধকানুগ্রহার্থম" এই কয়টি শব্দের অর্থের দিকে পাঠকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভগবান্ সময়ে সময়ে ভক্তের আহ্বানে পারিষদবর্গসহ এই মর্ত্ত্য ভূমিতে অবতরণ করিয়া প্রিয়তম ভক্তবৃন্দ লইয়া লীলা (খেলা) করেন, এই আর্য্য শাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত ও আন্তরিক বিশ্বাস লইয়া ভক্তসাধক কবিগণ ভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ রসের মধ্যে মধুর রসের মাধুরী সর্ব্বাধিক বলিয়া মধুর মূরতি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহারই স্বরূপ শক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা এই সাহিত্যের মূল বীজ। উঁহাদের লীলার সহায় মাতা পিতা, ভ্রাতা বন্ধু সখা সেবক এমন কি ধেনু বৎস, তরুলতা, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই লীলার অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, বৃক্ষ ও ফল ফুলে রমণীয় হইয়া ঐ লীলারস পানে আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এই লীলার বাহিরে স্ত্রী পুরুষ ভাব প্রকটিত হইলেও তত্ত্বত দ্বন্দ্বভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। এই রসমাধুর্য্যের প্রচারক জনৈক মহাজনের উপদেশ ;—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সোর মম না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।
... ...
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন
... ...
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি"

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ, "হে দূতি প্রথমতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে মিলনে (অনুরাগের) সূত্রপাত, ক্রমশঃ ঐ অনুরাগ তিল তিল বাড়িয়া আর বাড়িবার স্থান পাইতেছে না। আমি পত্নী কিংবা তিনি পতি নহেন। আমাদের প্রেম সম্মিলনে দূতী বা অন্য কোনও ঘটকের প্রয়োজন হয় নাই। মনোজ মধ্যস্থ হইয়া এই প্রেম সঙ্ঘটন করিয়াছেন। এই কথাগুলি মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা নিগূঢ় ভজন তত্ত্ব বিজড়িত। আমার উহা উদ্ঘাটন করিবার শক্তি, যোগ্যতা ও ইচ্ছা নাই ;

বিশেষতঃ এ স্থানও উহার অনুকূল নহে। তবে এইমাত্র ইঙ্গিত করিতেছি যে, ঘটকের সাহায্যে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচিত হইলে পর সামাজিক শাসন মত বৈধ পদ্ধতিতে যে পতি পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং সমাজ ও শাস্ত্র শাসন যে প্রীতির গ্রন্থি বন্ধন করে প্রেমের রাজ্যে ঐ আইন ও উহার শাসন চলে না। সেখানে পরস্পরের হার্দ্দ প্রেমই পরস্পরের হৃদয়কে এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য প্রীতির ডোরে বাঁধিয়া রাখে। ইহারই নাম রাগমার্গীয় ভজন। এই ভজন সর্ব্বস্ব কবিরাই এই ভক্তি সাহিত্যের নির্ম্মাতা। ভক্তিসূত্র প্রণেতা ঋষি শাণ্ডিল্য তাঁহার সূত্রে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে, বলিয়া এই স্বভাব লব্ধ প্রেমকে ঈশ্বর মুখী করিতে পারিলেই ভক্তি হয় বলিয়াছেন। এখন এই পার্থিব প্রেম কেমন করিয়া পয়ঃ-প্রণালীর জল গঙ্গার জলে মিশিয়া পবিত্র গঙ্গার জলরূপে দেবপূজায় লাগে এবং উহার স্পর্শে পাপ মলিন মানব পবিত্র ও অমৃত হইয়া যায়, জ্ঞানি ভক্ত শাণ্ডিল্য তাঁহারই আভাস দিয়াছেন। এই শক্তি ও শক্তিমানের সম্মিলিত লীলায় সম্ভোগ লোলুপ পশুর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথ উদ্ঘাটিত হয় নাই বরং ইহার মূল মহাজন যোগীবন্দ্য ব্যাসদেব ইহার নিয়ত শ্রবণে, কীর্ত্তনে ও অনুধ্যানে জীবের হৃদ্‌রোগ "কাম" তৎক্ষণাৎ সংশোধিত হইয়া স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের হেম-ভাব প্রাপ্তির ন্যায় জীব প্রেমের অধিকারী হয়, ইহাই বলিয়াছেন।

"হৃদ্রোগ মাশ্বতঃ হিনোত্য চিরেন ধীরঃ"।

শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম, ৩৩,৩৯।

অপর পক্ষে পশু প্রবৃত্তির চরিতার্থতার বাসনায় এই লীলার অনুকরণ কি অনুগমন করিলে তৎক্ষণাৎ ধ্বংশ হইবে বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি, কাম কলুষিত চিত্তে এ পবিত্র লীলা কথা স্মরণ করিলেও অনিষ্ট হইবে বলিয়াছেন।

"নৈতৎ সমাচরেৎ জাতু মনসাপি হ্যনিশ্বরঃ।
নশ্যত্যা চরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।

শ্রীমদ্ভাঃ দশম ৩৩,৩০।

অনধিকারী ব্যক্তি মহাদেবের কালকূট বিষ পান ক্রিয়ার অনুকরণ করিলে যে পরিণাম কাম কিঙ্করের কুভাবে এই লীলা স্মরণাদিতে ঠিক সেই ফল হয়। তুমি উদরাময় রোগে ভুগিতেছ। সংবৈদ্যের উপদেশমত ঔষধ পথ্য গ্রহণ কর, তখন রোগ সারিলে ঘৃতআদি পুষ্টিকর দ্রব্য আহারে শরীর সুস্থ, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে। কিন্তু রোগের প্রতীকার না করিয়া লোভে গব্য ভোজন করিলে ঐ উদরাময় রোগ বৃদ্ধি পাইয়া দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর করাইবে। সাধু জ্ঞানী ভক্তের উপদেশে হৃদয় নির্ম্মল করিয়া এই ভক্তি সাহিত্যের রসামৃত পানের অধিকার লাভ কর, তখন হাতে হাতে ফল পাইবে।

অন্যথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর আদেশ ;—

"অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥" চৈঃ, চঃ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্ত শিক্ষাপ্রসঙ্গে প্রসন্ন গম্ভীর উপদেশ ;—

"বৈষ্ণব হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
স্বপ্নেও না হেরি আমি তাহার বদন॥" ঐ চৈঃ, চঃ।

মনে রাখিবেন, বাঙ্গালা ভাষার এই অমূল্য গ্রন্থ খানি বৈরাগী সাধকের সাধনার ফল এখানি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। শ্রীল গ্রন্থকার সনাতন শিক্ষা প্রস্তাবে বর্ত্তমান যুগে প্রেম ধর্ম্মে জাতি, দেশ, কাল, পাত্র অভেদে অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন।

"সর্ব্বজন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥" চৈঃ, চঃ।

ফলতঃ বিপরীত রতাতুরা দিগম্বরা জগন্মাতার আরাধনা-কালে শাক্তের, জ্ঞানি শিরোরত্ন শঙ্কর ও সন্ন্যাসিনী পার্ব্বতীর মিলিত যুগল মূর্ত্তি হর গৌরীর পূজায় শৈবের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেবক বৈষ্ণবের অর্চ্চনাকালে যদি কোনরূপ মনোভাবের বিকার না হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের মধুর ভজনে নিষ্কাম ভক্তের মনে কুভাবের উদ্রেক হইবে কেন তাহাত বুঝা যায় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ আত্ম বিস্মৃত মানব

অনুক্ষণ নব নবায়মান অদৃষ্ট পূর্ব্ব রস নির্ঝরিণী শ্রীভগবৎ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট ও পার্থিব দম্পভাব বিস্মৃত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্য কবিকুল রত্ন সেক্সপীর বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্য সুবর্ণ অপেক্ষা অধিক লোভনীয়।

"Beauty provoke thieves sooner than gold."
As you like it, Act first. scene 3

শ্রীভগবানের স্থাবর জঙ্গম মোহন রূপের ছটায় মর্ম্মীভক্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদ ভুলিয়া, অরফিউসের "বাঁশীর তানে মুগ্ধ বর্ব্বর জাতির স্তায়" এইরূপে আত্মসমর্পণ করেন এই সুসমাচার আমরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ধ্যান রসিক সুফী সম্প্রদায়ের ভজন গীতেও শুনিতে পাই। প্রয়োজন মত দুই একটা উদাহরণ দিলাম।

"Love is that flame which, when it is kindled,
Devours every thing except the Beloved."
—Zelaluddin Rumi.

ভাবার্থ,—"প্রেমিকের দৃষ্টি যখন প্রেম অঞ্জনে বিচ্ছুরিত হয়, তখন ঐ দৃষ্টিতে প্রিয়তম ভিন্ন আর কিছুই প্রতিভাত হয় না।" এই উক্তি ভক্তি সাহিত্যের (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের) প্রতিধ্বনি;—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

"O thou, who art exempt from 'us' and 'we'
When man and woman become one,
Thou art that one."

"হে ভগবান, প্রেমের প্রগাঢ়তায় যখন স্ত্রী পুরুষ ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন কেবল তোমারই মধুর মূরতি বিরাজিত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় 'আমাদিগকে' কিম্বা 'আমরা' এরূপ কোনও কর্ত্তা কর্ম্ম ঘটিত কারক চিহ্ন থাকে না। শ্রদ্ধেয় পাঠক দেখিবেন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তদের মধুর ভজনের সঙ্গীতেও কেবল ভাষার ভেদমাত্র। ভাব, ভঙ্গী, সুর, তান, লয়, মাত্রায়, ছন্দে একচুল তফাৎ নাই। যে ভুবন ভুলানো রূপের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভগবান স্বয়ং মুগ্ধ, লুব্ধ ও চমৎকৃত হইয়া ভক্তভাবে এই ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া ভাগ্যবান কলির জীবকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; সেই রূপের পাগল চিন্তামণির প্রণয়ী ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের রূপদর্শনের ভঙ্গীটি কেমন শুনুন;—

(১) "ও দুটি লোচন তারা
পিরীতি মুরতি শোভার আধার,
পদে পদে নানা মাধুরী বিথার,
দিনে দিনে নব নূতন আকার,
নিমেষে নিমেষে অধিক যাহার,
উছলে অমিয় ধারা।

(২) এমন কবে বা হবে
শিখিপাখা শিরে কিশোর মূরতি
হৃদয়ে লাগিয়া রবে?
শিশুশশী ঐ মুখ ঢল ঢল
ঢালি হাসিরাশি অমৃত তরল
তৃষিত নয়ন চকোর যুগল
শীতল করিবে কবে?

(৩) কুসুম শর মরমে পশি বিদ্ধ করে গোপীর মন।
বক্ষ কিবা কুঙ্কুমিত বঁধুরে করে আলিঙ্গন॥
নেহারি লাজে মুদিয়া আসে নয়ন ব্রজ অঙ্গনার।
উছলে পড়ে হাসির সুধা কৃষ্ণমুখ চন্দ্রমার॥
মুহুর্মুহু মাধুরী নব বিকশে মুখপদ্ম যার।
ভৃঙ্গসম রহিব লীন কবে সে রস সম্ভ সার॥

—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী কৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের ১৩,২৪।৪৩ শ্লোকের আংশিক পদ্যানুবাদ।

এখন একটু বিজন প্রান্তরে নদীতীরে কুটীর বাসী কৌপীন সর্ব্বস্ব উদাসী ভক্ত জয়দেবের মধুর "গীত গোবিন্দের" সুমধুর গীতের রসাস্বাদন করুন;—

"অধর অমৃত সঞ্চারে মধুর
মোহন মুরলী বাজিছে সঘনে,
নয়ন অঞ্চল চূড়া সুচঞ্চল,

কপোলে বিলোল শ্রবণ ভূষণে ;
পরিহাস কারী   সে রাস বিহারী
এবে সখি, মোর জাগিতেছে মনে।
মণ্ডল আকারে   শোভিত কুন্তল
চন্দ্রকরঞ্জিত শিখি পুচ্ছগণে ;
শোভয়ে যেমন   জলদ চিকণ
ইন্দ্রধনুকের বিচিত্র বরণে।

—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় কৃত গীতগোবিন্দের ২য় সর্গের প্রথম শ্লোকের আংশিক পদ্যানুবাদ।

কৃপাময় শ্রোতৃবৃন্দ, আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছি, ক্ষমা করিবেন. ভক্তি সাহিত্যের পারিজাত কাননের ভিতরে ঢুকিয়া আমি বিচার বিবেচনা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহার কোন্‌টি রাখিয়া কোন্ ফুলের রূপ রস গন্ধের পরিচয় দিব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কিঞ্চিৎ রসপানে পরিতৃপ্তি লাভ করুন। আমি যে পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি উহা সংস্কৃতে গ্রথিত। অনন্তরত্নাকর সংস্কৃত সাহিত্যের দু' একটি রত্ন লইয়া ভক্ত মণিকার যে বক্ষহার গাঁথিয়াছেন, বঙ্গভাষায় উহার কত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তাহা নিরীক্ষণ ও উপভোগ করতঃ ঐ রত্নাকর হইতে প্রচুর পরিমাণে রত্নাহরণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় রত্নহার প্রস্তুত করাইয়া বঙ্গজননীর কণ্ঠে দিয়া কৃতার্থ হউন্।

(১) "কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর   মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর   তাহা হইতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
*   *   *   *   *
আপনার এক কণে   ব্যাপে যত ত্রিভুবনে
দশ দিক ব্যাপে যার পুর।"

—চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের অনুবাদ।

(২) "কৃষ্ণের যতেক খেলা   সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর   নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যে রূপের এক কণ   ডুবায় সব ত্রিভুবণ,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।
*   *   *   *   *
রূপ দেখি আপনায়   কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম   সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ নিত্য তাঁর ধাম॥"

—চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ।

এই সকল কবিতা সম্ভোগ বর্ণনার কালিমায় কলঙ্কিত নহে ; পক্ষান্তরে এতাদৃশ বর্ণনায় ভক্ত কবির প্রকৃষ্ট সংযমের পরিচয়ই সুপরিস্ফুট। আদিরসের আবিলতায় যদি এই রসময়ী কবিতাবলী বিকৃত হইত, তাহা হইলে অগাধ পাণ্ডিত্য, অতুলা সৌন্দর্য্য, নবীন যৌবন, কিশোরী ভার্য্যাত্যাগী সন্ন্যাসী শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অন্তরঙ্গসঙ্গী স্বরূপের মুখে এই সকল পদাবলী শুনিয়া অহর্নিশ অঝোর নয়নে অশ্রুপাত করিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতেন না। তাঁহার শেষ লীলায়,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গান, শুনে পরম আনন্দ॥

ফলতঃ যে ভাগ্যবতী ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আত্মা হইতে কোটিগুণ ভালবাসিয়াও সুখী হইতে পারিতেন না, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য নিজ দেহের মার্জ্জনা ও বেশ-ভূষা দ ধারণ করিতেন, পলকমাত্র চক্ষের অন্তরাল হইলে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় ছটফট্ করিতেন, যাঁহাদের অন্তর বাহির কৃষ্ণময় হওয়ায় বিক্রয় কালে বিক্রের দধি দুগ্ধের নাম ভুলিয়া হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মাধব বলিয়া শ্রোতাদের আহ্বান করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্য প্রেয়সী গোপী-মণ্ডলীর অনুগতি ও তৎপ্রদর্শিত ভজন পথের অনুবর্ত্তী না

হইলে এই অপূর্ব্ব পবিত্র ভক্তি সাহিত্যের রসাস্বাদনের অধিকার হয় না। অভক্তের আস্বাদন পিত্তদূষিত রসনায় শর্করার অপব্যবহার মাত্র। এ বিষয়ে কাশীবাসী অসংখ্য সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, রাগ প্রতিষ্ঠার আদিম আচার্য্য শ্রীগৌর চরণে শরণ লইয়া, এই দুর্লভ ব্রজরস সম্পত্তির অধিকারী হইতে হইলে কলিতে কিরূপ ভজন সাধনের প্রয়োজন, উহার পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার গৌরভক্তি রসকদম্ব "শ্রীরাধা রস সুধানিধি" ও "শ্রীচন্দ্রামৃতে" যে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ গ্রন্থদ্বয়ের দুইটি শ্লোকের স্বকৃত পদ্যানুবাদ দিয়া সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

গোলকে নরকে কিম্বা যথায় তথায়।
করমফলেতে জন্ম লভি বা ধরায়॥
শ্রীরাধিকা কুঞ্জ রতি রস কেলি কথা।
হৃদয় মাঝারে মম থাকে যেন গাঁথা॥

(২)

অযতনে অষ্টসিদ্ধি পড়ে করতলে,
দেবগণ সবে যদি দাস হবে বলে;
দ্বিভুজ শরীর মম চতুর্ভুজ হয়,
গৌর পদ ক্ষণতরে না ত্যজে হৃদয়॥

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান পরিবর্দ্ধনশীল উন্নতির যুগে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান কোথায় নির্ণীত হইতে পারে, তাহার বিচারের সময় হয়ত এখনো উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শে বাঙ্গালার এই শিল্পাচার্য্য কবি কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার রেখা তুলিকায় বাঙ্গালার সাহিত্যপাতে উহা কিভাবে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের সাহিত্যানুশীলনবৃত্তির চরিতার্থ সম্পাদন করিতে পারি।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব,—ছন্দবৈভব।

আমরা জানি, বর্ত্তমান বাঙ্গালায় দুইশ্রেণীর সাহিত্যিক স্বস্ব আদর্শানুযায়ী সাহিত্য রচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-বিধানে চেষ্টাপর হইয়া ভাষাজননীর সেবা করিতেছেন,—এক সম্প্রদায়, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, বঙ্গসাহিত্যকে স্বভাব বিবর্দ্ধিতা এক শক্তিমতী ভাষারূপে বিশ্ব সাহিত্য-সভায় উপস্থিত করিতে প্রয়াসী, অপর সম্প্রদায় যেন বিশেষভাবে এই প্রাচীন পন্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই বহুল পরিমাণে গ্রাম্য এবং বিদেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে বঙ্গভাষাকে নব্যসমাজে বিভূষিতা করিয়াই "সাহিত্য-দরবারে" হাজির করিতে সমুৎসুক! এই শেষোক্ত সাহিত্যিক দল সাধারণতঃ "নব্যতান্ত্রিক" নামে অভিহিত হইতে পারেন। ইঁহারা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পরিচালিত হইয়া থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই নব্যতান্ত্রিক দলের মুখপাত্র রূপে সাহিত্য গঠন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন, সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনা অধিকাংশ স্থলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। ভাবে, ভাষায় তিনি সর্ব্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু ছন্দবৈভবে তিনি গুরু রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মৌলিক ভাব সম্পদ সম্বন্ধে পাঠকের মতভেদ থাকিলেও, ছন্দবৈভবে যে তিনি অতুলনীয় ছিলেন তৎসম্বন্ধে কাহারো মতানৈক্য ছিলনা; আমরা জানি, "বিচিত্রা" সভার এক অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এতদ্বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্বকীয় মহত্বের পরিচয় প্রদান, এবং সত্যেন্দ্রনাথের গুণের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করেন।

বাস্তবিক, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দের অধিপতি নিজের "খেয়ালের" অনুযায়ী ছন্দলীলা প্রকটীত করিতে একমাত্র কবি নজরুল ভিন্ন তাঁহার সমকক্ষ কবি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। "দশানন-বধ মহাকাব্য"-রচয়িত

কবি হরগোবিন্দ, "পর্ণপুটে"র কবি কালিদাস অথবা সাহিত্য শিল্পী বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বাণীসাধকগণও ছন্দ-বিলাসে নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহারা মূলতঃ সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের আদর্শে পরিচালিত হইয়াছেন; মৌলিক ছন্দ প্রবর্ত্তনে সাহসী হন নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, গুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে কবি সত্যেন্দ্র নাথই অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে, এই ছন্দ বিলাসের মোহে কবি স্বকীয় কাব্য-প্রতিভাকে অনেক স্থলে সঙ্কুচিত করিতেও কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই, এবং এই একমাত্র কারণ বশতঃই, ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য বিধানে কবি রবীন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পারেন নাই। জ্ঞানবীর ৺হরিনাথ দে মহোদয়ের পরলোক গমনে লিখিত কবিতা এবং এবম্বিধ অন্য কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে নির্ণীত হইতে পারে। রবীন্দ্র নাথের

"বুক ভরা মধু বঙ্গের বধু জল নিয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্ চোকে জল আসে ভরে"।

পাঠ করিতে করিতে পাঠকের "প্রাণ" ও মায়ের জন্য "আনচান্" করিতে থাকে, তাঁহার—

"ওহে জীবন বল্লভ, সাধন দুর্লভ,
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব"

ইত্যাদি গানের ছন্দে মানব-হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে সচেতন করিয়া তুলে, বস্তুতঃ এই কবির ভাবে এবং ছন্দে যে মধুর মাদকতা আছে, সত্যেন্দ্র নাথের রচনায় তাহা সম্ভবতঃ নাই। পরন্তু, তাঁহার ছন্দে উন্মাদনা আছে, উহা অধিকাংশ স্থলেই চঞ্চল তটিনীর মত নৃত্যপুলকা, ছন্দ বিলাসী কবি ছন্দকে অনেক ক্ষেত্রে নটিনী মূর্ত্তিতেই সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহার,—

"পাল্কী চলে রে অঙ্গ দোলে রে,
আর দেরী কত আরো কত দূর
ঐ দেখা যায় খুড়ো শিবপুর।"

অথবা,—

"এরে দুম তেরে না, টিকি কাটো দেয়ী না।"

কিম্বা,—

"বজ্র হাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়,
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে, চিকমিকিয়ে রে।"

ইত্যাদি বহুল ক্ষেত্রেই ছন্দ দুহিতার এবম্বিধ নর্ত্তন লীলাই বিশেষভাবে উপভোগ্য হইয়া পড়ে, উহার মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি কদাচিৎ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হয়। অথচ, ভাষার সাহায্যে এবং ছন্দের গুরুত্বে গম্ভীর ভাব প্রকাশেও যে সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষম ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অনুদিত কবিতা "মৃত্যুরূপা মাতা"র ছন্দ গাম্ভীর্য্য পাঠককে বিমুগ্ধ করিয়া যায়।

"নিঃশেষে নিবিছে তারাদল,
মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,
গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ুবেগ,
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ
বহির্গত বন্দীশালা হ'তে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি'
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।"

ইত্যাদি কাব্য পংক্তিচয় ছন্দের গুরুত্বে যে কোনও সাহিত্য-রসিকের উপভোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এতদ্‌সত্বেও, বাঙ্গালী জাতি সত্যেন্দ্র নাথকে শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই, বাঙ্গালী সত্যেন্দ্র নাথকে ভালবাসে,—তাঁহার মহত্বকে পূজা করে, তাঁহার ছন্দ শিল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়,—অথচ, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতে অনিচ্ছুক, এই অদ্ভুত তথ্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই, সত্যেন্দ্রনাথ নিজে উচ্চ কবি প্রতিভার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও

স্বকীয় কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার কোনও প্রয়াস তিনি করেন নাই। অধিকন্তু, তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় ভাব অপেক্ষা ভাষার প্রাধান্যই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভাবান্বেষী পাঠক উহা পাঠে সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, উহার ছন্দ-চাতুর্য্যে আমোদিত হয় মাত্র।

সত্যেন্দ্র নাথের কাব্যে ছন্দের প্রাধান্য ও তাঁহার মূলতত্ত্ব নিরূপন।

ভাবই যে সাহিত্যের প্রাণ, ছন্দ তাহার বহিরাবরণ মাত্র, এই তথ্য যে সত্যেন্দ্র নাথের মত মনস্বী কবির অজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে; সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানী ছিলেন, একাধিক ভাষায় তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল, সাহিত্য-রচনা ব্যাপারেও নব্য তান্ত্রিক দলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন, অনুবাদের ক্ষেত্রেও Elegy রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য, ইত্যাদির অনুবাদ কর্ত্তা কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের সহিত সম পর্য্যায়ে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এতগুণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, তিনি কেন যে গভীর ভাব অপেক্ষা ছন্দ সাধনাতেই অধিকতর অবহিত ছিলেন, অধুনা তাহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য-প্রশ্ন হইয়া থাকিবে।

আমাদের মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চরিত্রই এইজন্য আংশিক ভাবে দায়ী! কবির অনুরক্ত শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল জানেন, সত্যেন্দ্রনাথ নানাবিষয়ে শিশুর মত একান্ত অসহায় এবং পরনির্ভর ছিলেন, তাঁহার অবিচলিত মাতৃনিষ্ঠা এবং সাহিত্য গুরুর প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি তদীয় চরিত্রকে কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই গুরুনিষ্ঠা এবং পরনির্ভরতার ছাপ তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই স্বীয়কাব্যে রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার ফলে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে শ্রেষ্ঠ সুগভীর ভাব সম্পদ হইতে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত করিয়াছেন।

প্রকৃত সত্যেন্দ্র নাথের পরিচয় এবং তাঁহার গুণপূজা।

এতদ্‌সত্ত্বেও, সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এই প্রতিভা পরের বশ মানিতে চাহে না। উহা নিত্য নূতন সৃষ্টিতেই আনন্দলাভ করে গুরু নিষ্ঠার প্রভাবও উহাকে সর্ব্বত্র নিষ্প্রভ করিতে পারে না, তাই, আমরা "জাতির পাঁতি" প্রভৃতি কতিপয় কবিতায় প্রকৃত সাহিত্য স্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করি এবং তখন এই হৃদয়বান অগ্রজ কবির সহিত সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করি,—

"জগত জুড়িয়া একজাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

* * *

আসিছে সেদিন, আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে
সেই দিন মহা মানব ধর্ম্মে
মানুষ ধর্ম্ম মিলিত হবে!"

সেইদিন, সেই মহামানবতার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার যুগে, এই মহাশয় কবির আত্মা-বাঙ্গালী জাতির অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং আমরা প্রকৃত সত্যেন্দ্র নাথের চরণে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া বাণী দেবতার তুষ্টি বিধান করিব।

সত্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম এবং কাব্যে তাহার প্রভাব।

সত্যেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম মহামানবতার ধর্ম্ম, প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্ম,—আচার অনুষ্ঠানের নাগপাশে তাহাকে কোথাও আবদ্ধ করিতে পারে নাই, বিজাতীয় পদ্ধতির অনুকরণে তাহা কুত্রাপি শিথিল হয় নাই! দাসত্বের প্রভাবে তাহা বিন্দুমাত্র মলিন

হয়নাই! নিখিল পূজ্য আচার্য্য বিবেকানন্দের বীরধর্ম্মে তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন, তাঁহার কাব্যে এবং রচনায় এই অনাবিল উদার হিন্দুমতবাদ সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে, তাঁহার ধর্ম্মে "ভেদজ্ঞান" ছিলনা। উহা জাগতিক সমস্ত ধর্ম্মের মিলন কেন্দ্রস্বরূপে সম্বর্দ্ধিত।

"মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু
শব নাই শুধু শিব,
মনে লয় মোর হেথা একদিন
মিলিবে নিখিল জীব,
আত্মার সাথে হবে আত্মার
নবীন আত্মীয়তা,
মিলন ধর্ম্মী মানুষ মিলিবে
এ নহে স্বপ্ন কথা!"

এই ধর্ম্ম বুদ্ধিই সত্যেন্দ্র নাথকে মানবতার পূজায় প্ররোচিত করিয়াছিল; এই বুদ্ধিবশেই মহাত্মা গান্ধীকে তিনি "মহা-মানব" রূপে পূজা করিতেন, এই ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় তিনি বিদেশীয় মহাপুরুষদের আদর্শ গ্রহণ করিতেন, আবার এই ধর্ম্ম বুদ্ধির বলেই কবিধর্ম্মী গর্ব্বিত যুবক কুত্রাপি স্বীয় আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নাই, পরলোক গত পিতামহের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই,—

"সত্য দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই।

সত্যেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম এবং সাহিত্য প্রাণের ইতিহাস অনেক পরিমাণে এই তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠীত রহিয়াছে! অধিকন্তু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারের বিপক্ষে সংগ্রাম প্রবৃত্তি তাঁহার ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামীজির প্রচারিত এবং শ্রীমন্মহাত্মার অনুষ্ঠীত অস্পৃশ্যতা বিদুরিণী নীতিকে তিনি একান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বজাতির ঘৃণ্য মেথরও তাঁহার সম্বর্দ্ধন লাভে বঞ্চিত হয় নাই; মুচি, কসাই, ধীবর-চণ্ডাল সকল বর্ণই তাঁহার "**জাতির পাঁতি**" বলে মনুষ্যত্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়া সাহিত্য সমাজে পাংক্তেয় হইয়াছেন।

"রাইদাস মুচি সুদীন কসাই
গণি শুকদেব সনক সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোট নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে;
চণ্ডাল সে তো বিপ্র ভাগিনা,
ধীবর ভাগিনা যেমন ব্যাস।
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন,
নহে গো এ নহে উপন্যাস।"

এই ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্র নাথের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইতেছে; ভবিষ্যৎ যুগে, কবির সমালোচকগণ এই বৈশিষ্ট্যের সহায়তায় সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

কাব্যে মনুষ্যত্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা
এবং
সাহিত্যের প্রতি অবিচার।

ছন্দলীলা প্রকটনের সহায়তায় পাঠক সাধারণের চিত্তকে স্বকীয় কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্ররোচনা বশতঃ সত্যেন্দ্র নাথ স্বকীয় সাহিত্য রচনার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা বহু প্রমাণ পাইয়াছি, কিন্তু, সাহিত্যে মনুষ্যত্ব বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠীত করিবার প্রচেষ্টায় এবং স্বকীয় আদর্শকে অব্যাহত রাখিবার সঙ্কল্পে ভাব-সাধনার প্রতি তাঁহার অবিচারের মাত্রাও অল্প নহে, অধিকন্তু সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বন্ধু বান্ধবদের তৃপ্তির জন্য অথবা মাসিক পত্রের "খোরাক যোগাইবার" অনুরোধে অপেক্ষাকৃত নিম্নাঙ্গের কবিতা রচনার দ্বারাও তিনি স্বকীয় প্রতিভার ব্যভিচার-সাধন করিয়াছেন। তাঁহার "পাতিল-বিল প্রভৃতি রচনা একশ্রেণীর পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিলেও উহারা সত্যেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী কবির লেখনী প্রসূত এই কথা ভাবিতেও প্রকৃত সাহিত্য ব্রতীর মন পীড়িত হয়।

এই সব ত্রুটী বাদ দিয়া বিচার করিলেই সত্যেন্দ্র নাথকে আমরা প্রকৃত কবিরূপে দেখিতে পাইব। মনে প্রাণে কাব্য

জননীর সেবা করিয়া তিনি জাতীয় সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, ছন্দ জগতে অভিনব বিধানের প্রবর্ত্তকস্বরূপে তিনি চিরদিন সুধী সমাজে আদৃত থাকিবেন। শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টা, পরিপূর্ণ প্রাণের একনিষ্ঠ সাধক এবং মহামানবধর্ম্মী এই কবি ভবিষ্য জন্মে যখন—

"এই গঙ্গারি কূলে,
নব বীণা লয়ে আসিবে আবার এই শ্যাম তরু-
মূলে"

তখন আমরা, তাঁহার গুণমুগ্ধ, তাঁহার ধর্ম্মে এবং চরিত্র মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালীরা তাঁহাকে আবাহন করিয়া তাঁহারই সুরে গাহিব,—

"পর যে মন্ত্রে আপনার হয়
তুমি সে মন্ত্র জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত জনারে
মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিচরণ
নানা বরণের ফুলে
অবিরোধে লোক সার্থক হোক
পাশাপাশি মিলে জুলে,
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব
যে ধনের আশা করে
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত
জগত জনের করে।
জয় তব হোক জয়,
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি
আমাদের সংশয়।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

নবদ্বীপ বিজয়ী পণ্ডিত। *

সেনহাটী খুলনা জিলার একটী প্রসিদ্ধ পল্লী। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পল্লীমাতার স্নেহময় ক্রোড়ে বৈদ্যবংশে পণ্ডিত শিবদেব সেন কবিরত্নভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রাশনাম ছিল রাধাবল্লভ সেন। কবি রত্নভূষণ চাঁচড়ার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

তখন নবদ্বীপ ছিল বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। নবদ্বীপের রাজসভা সর্ব্বদাই দেশ বিদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা পূর্ণ থাকিত। নবদ্বীপের রাজসভার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাই তখন বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেন। এই সময়ে নবদ্বীপের তদানীন্তন রাজা রঘুরাম রায়ের নিকট জনৈক পণ্ডিত অপূর্ব্ব প্রকাশিত একখানি পুঁথি আনয়ন করেন—পুঁথির প্রথম দুইটী পাতা এবং শেষের একখানি পাতা ছিল না। রাজা তাঁহার দরবারের পণ্ডিতবর্গকে পুঁথির লুপ্ত পত্র পূরণ করিয়া পুঁথিখানি সম্পূর্ণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতবর্গ তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী পুঁথির পত্র পূরণ করিয়া দিলেন কিন্তু রাজার তাহা মনঃপূত হইল না। চাঁচড়ার রাজপণ্ডিত শিবদেব কবিরত্নভূষণ যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, রঘুরাম তাহা জানিতেন। তিনি সেই পুঁথিখানি রাজা কৃষ্ণরামের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সভা পণ্ডিত দ্বারা উহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

রাজা কৃষ্ণরামের আদেশে শিবদেব উহা পূরণ করিয়া নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। লুপ্ত পত্রত্রয়ের পূরণে শিবদেব এমন পাণ্ডিত্য, সরসতা, বিচারক্ষমতা ও শাস্ত্রবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন যে রাজা রঘুরাম উহা দেখিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া চাঁচড়ার রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি স্থানীয় আমার দরবারের পণ্ডিতমণ্ডলী যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখায় পঠিত

পারেন নাই, আপনার দ্বার পণ্ডিত কবিরত্নভূষণ আশাতিরিক্তরূপে সে কার্য্যে সামর্থ্য দেখাইয়া অগাধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন সন্দেহ নাই, যদি আপনি কিছু মনে না করেন এবং অনুমতি দেন, তবে আমিও পণ্ডিত মহাশয়কে কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা রঘুরামের পত্র পাইয়া রাজা কৃষ্ণরাম নিজ সভাপণ্ডিতের সাফল্যে অতিমাত্র গৌরবান্বিত হইয়া রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি সংবাদ দিলেন—"আমি পণ্ডিতের সম্মান জন্ম তাঁহার বাসভূমি সেনহাটী গ্রামখানি তাঁহাকে নিষ্কর দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি, পণ্ডিত বড় অভিমানী সুতরাং আমার মনে হয় আপনি পুরস্কার প্রদান করিতে গেলে, তিনি হয়ত তাহাতে দুঃখিত হইবেন।"

রাজাদিগের মধ্যে যখন এই বিষয় লইয়া পত্র বিনিময় হইতেছিল, কবি রত্নভূষণ তখন নিজ বাসভূমি সেনহাটীতে ছিলেন, তাই কৃষ্ণরাম তাঁহাকে সংবাদ দিয়া চাঁচড়ায় আনিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত! নবদ্বীপের পুঁথির লুপ্ত পত্রত্রয় পূরণে আপনি যে কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—রাজা রঘুরামও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার সঙ্কল্প করিয়া আমার অনুমতি চাহিয়া ছিলেন। উত্তরে আমি লিখিয়া দিয়াছি, আমার পণ্ডিতের সম্মান জন্ম আমি তাঁহার বাসভূমি সেনহাটী গ্রামখানি তাঁহাকে নিষ্কর দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি, তিনি অভিমানী সুতরাং আপনার দান গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না; এইক্ষণ এই দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।"

রাজার কথা শুনিয়া কবি রত্নভূষণ উত্তর করিলেন—"সে কি রাজন্! শাস্ত্র ব্যবসায়ী আমি, আমাকে বিষয় বাসনে আকৃষ্ট করিতেছেন কেন? উহা আমার শাস্ত্র চর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটাইবে। আমাকে মাপ করুন!" রাজা বলিলেন—"যদি আপনি এ দান গ্রহণ না করেন তবে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।" কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"যদি আপনি নিতান্তই না ছাড়েন, তবে আমাকে অনুমতি দেন, আমি গিয়া চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র অধ্যাপনা করি, আর আপনি সেই চতুষ্পাঠীর সাহায্য বাবদ আমাকে কিছু জমি দেন, কিন্তু নিষ্কর আমি লইব না, সে জমির কর আপনার লইতে হইবে।"

রাজা।—"আপনি গেলে আমার সভা চলিবে কি করিয়া?"

পণ্ডিত।—"আমি দেশে টোল করিব, কিন্তু আপনি যখনই সংবাদ দিবেন, তখনই আমি দরবারে উপস্থিত হইব। আর আমার পুত্র বিনোদরামও কৃতবিদ্য হইয়াছে, আপনার ইচ্ছা হইলে তাহাকে আনিয়া সভায় রাখিতে পারেন।"

রাজা সম্মত হইয়া কবি রত্নভূষণের পুত্র বিনোদরাম কবি রত্নাকরকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া কবি রত্নভূষণের চতুষ্পাঠীর সাহায্য বাবদ নামমাত্র করে তিনটী পাতি জমি দিলেন—কবি রত্নভূষণ দেশে আসিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে টোল করিয়া ছাত্রাধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। কবি রত্নভূষণ টোল করিয়াছেন শুনিয়া দেশ বিদেশের বহু ছাত্র তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। এমনও গল্প আছে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া কোন এক ব্রহ্মদৈত্য তাঁহার জীবিতকালের ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন।

পণ্ডিত শিবদেবের পরে তাঁহার পুত্র বিনোদরাম কবি রত্নাকর চাঁচড়ার সভাপণ্ডিত হয়েন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুত্র কবি রত্নাকর পিতা কবি রত্নভূষণ হইতেও অধিকতর বিচক্ষণ ছিলেন। কৃষ্ণরামের পর শুকদেব চাঁচড়ার রাজা হয়েন। শুকদেব কবি রত্নাকরকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন ও ভালবাসিতেন। এদিকে নবদ্বীপের রাজা রঘুরামের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী রাজা তৎকালে সমগ্র বঙ্গে—বঙ্গে কেন—ভারতে কেহই ছিলেন না। বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন—তাঁহাদের

বলেই তিনি মধ্যে মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের পণ্ডিতবর্গকে নিজ দরবারে আহ্বান করিয়া বিচার সভায় অনুষ্ঠান করিতেন। বিচারের জন্য একটি বিষয় স্থির করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ যে কেহকে আহ্বান করিতেন---একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত মধ্যস্থ থাকিতেন। একবার এ সভায় কবি রত্নাকর উপস্থিত হয়েন। নবদ্বীপ রাজ সভা পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বড় নাম—বড় মান। তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিলে তিনি দিগ্বিজয়ী হইবেন মনে করিয়াই কবি রত্নাকর সভা পণ্ডিত মহাশয়কেই আহ্বান করিলেন—মধ্যস্থ হইলেন বিক্রমপুরের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। কবি রত্নাকর, ক্ষীণদেহ ছিলেন ও তাহার উপর আবার তাঁহার দক্ষিণপদে 'গোদ' ছিল—তাই তাঁহাকে লোকে সাধারণতঃ 'গোদা' রত্নাকর বলিত। এ হেন পণ্ডিতকে রাজভোগপুষ্ট উন্নতকায়, পদ গৌরবে গৌরবান্বিত নবদ্বীপের রাজ সভা পণ্ডিতকে বিচারে আহ্বান করিতে দেখিয়া সকলেই যেন একটু বিস্মিত হইলেন। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্রবর্গের নিকট কবিরত্নাকরের এ সাহস অসীম সাহস ও ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইল, তাই তাঁহারা তাঁহার দৈহিক বিকৃতি লইয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ও একাকী ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার চারিটী ছাত্রও নবদ্বীপে গিয়াছিলেন—তাঁহারা নবদ্বীপের ছাত্রবর্গের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শ্লেষ পূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"হস্তী স্থূলতনুঃ স চাঙ্কুশ বশঃ কিং হস্তিতুল্যোঙ্কুশঃ।
বজ্রেনাভিহতাঃ পতন্তি গিরয়ঃ কিং বজ্রতুল্যোগিরিঃ॥
দীপঃ প্রজ্জ্বালতস্তমোঽপি বিহতং কিং দীপ তুল্যং তমঃ।
শক্তির্যস্য গরীয়সী স বলবান স্থূলেষু কঃ প্রত্যয়ঃ॥"

স্থূল তনু হস্তী ক্ষুদ্র অঙ্কুশের বশ হয়, সুতরাং অঙ্কুশের সহিত হস্তীর তুলনা হইতেই পারে না। ক্ষুদ্র বজ্রের আঘাতে যখন প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন বজ্রের সহিতই বা পর্ব্বতের তুলনা হয় কি করিয়া? একটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেই যদি অন্ধকার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে কি দীপের সহিত অন্ধকারের তুলনা চলে? যাহার শক্তি আছে সেই বলবান, শুধু মোটা দেখিলেই হয় না।

কবি রত্নাকরের ছাত্রদিগের কথা শুনিয়া আর কেহই কোন কথা বলিলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তখনই বিচার আরম্ভ হইল, তিন দিনে বিচার শেষ হইল। কবি রত্নাকরের বিচার পদ্ধতি ও তর্ক প্রণালী দেখিয়া সভাশুদ্ধ বিস্মিত হইল। রাজা মধ্যস্থকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—'আমি নবদ্বীপ শ্রীপাটের শিষ্য, সুতরাং এ স্থলের কোন পণ্ডিতের বিচার বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা, তবে কবিরত্নাকরের ন্যায় পণ্ডিতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মভূমি সেনহাটী যে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। বীণাপাণির মাত্র দুখানি চরণ, তাহার একখানি শ্রীপাট নবদ্বীপে ও অন্যখানি বিক্রমপুরে অর্পিত আছে---মার যদি তৃতীয় চরণ থাকিত তবে সেনহাটীই তাহা পাইবার অধিকারী হইত; একথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি।'

মধ্যস্থ মহাশয়ের এ কথার উত্তরে কবিরত্নাকরের অন্যতম ছাত্র কামদেব সিদ্ধান্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

'স্বধুন্যা পুণ্যতীরে কলিকলুষ হরে শ্রীনবদ্বীপ পীঠে
পাদংবিন্যসা সৈকং ত্রিজগদঘহরা মোহনাশ-প্রকাশঃ।
পাদংচান্যং সুধান্যাগুণি-গণবহুলে হ্যাপি বিক্রমপুবে গীঃ
আস্তে স্বচ্ছন্দমেতদ্ বুধজন মণি না সত্যমুক্তংহিমন্যে।
কিন্তিপৎ সংস্থিতায়াঃ পদযুগলসৎ স্থান-সংস্থান-কান্ত্যা
বীণাপাণ্যাঃ সুদৃষ্টির্হ্যভিমতফলদা সেনহাট্যাং নিবদ্ধা।
ইতোতৎ তথ্যসারং সমধিগতবতা ধীর মধ্যস্থ রত্নে
নাস্থত্যা নোক্তমহো স্মৃতিগতমপি নো জ্ঞায়তে গোপিতং
কিং?'

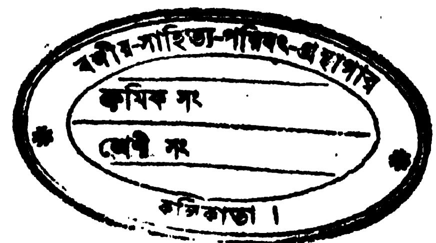
মধ্যস্থ মহাশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই—মাতা বীণাপাণির একখানি পদ নবদ্বীপে; অন্য পদ বিক্রমপুরে একথা তিনি ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু মাতার পদদ্বয় এই ভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় নবদ্বীপ, সেনহাটী ও বিক্রমপুর দেশত্রয়ের ভৌগোলিক সংস্থানানুসারে, তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যে সতত সেনহাটীর উপরই বর্ষিত হইতেছে এ কথা তিনি গোপন করিতেছেন কেন?

সভাখণ্ড এই শ্লোক শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রাজা কবিরত্নাকরকে প্রচুর পুরস্কার সহ জয়মালা প্রদান করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। কথিত আছে, এই বিচারের পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেনহাটীর সহিত নবদ্বীপ বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু সেনহাটীর তদানীন্তন ভূস্বামী চাঁচড়া-রাজ নীলকণ্ঠ তাহাতে সম্মত হন নাই।

এই সময় কবিরত্নভূষণের মৃত্যু হওয়ায় কবিরত্নাকর বাড়ীতে আসিয়াই পিতার টোল চালাইতে লাগিলেন। কবিরত্নাকরের নবদ্বীপের সভাজয়ের সংবাদ পাইয়া দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ছাত্রসংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাহাদের অধ্যাপনা করিতে দু' একদিন দিবাবসান হইয়া যাইত—তিনি স্নানাহারেরও সময় পাইতেন না। কিন্তু ইহাতেই তিনি অধিক আমোদ পাইতেন। নিজের কোন অভাব—কোন কষ্টই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

টোলের সাহায্য বাবদ অল্প করে রাজা কৃষ্ণরাম কবিরত্নভূষণকে কয়েকটী গাতি জমি দিয়াছিলেন। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একদিন কবিরত্নাকর সারাদিন ছাত্রাধ্যাপনার পর অপরাহ্নে পূজা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় স্থানীয় জমিদারের কাছারী হইতে জনৈক মুসলমান প্যাদা আসিয়া তাঁহার নিকট গাতির খাজনার তাগীদ করিল। সারাদিন পরে অবসর পাইয়া তিনি যবে ইষ্টদেবীকে পূজা করিতে বসিয়াছেন, তখন সমর কাছারীর মুসলমান প্যাদাকে দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন—কোন প্রকারে মনঃসংযোগ করিয়া তিনি পূজা সমাপন করিয়া উঠিলেন—তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করা হইলে তিনি বলিলেন—"বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ না করিয়া আমি জল স্পর্শ করিব না।" এই বলিয়াই খড়ম পায়ে দিয়া বাটীর নিকটস্থ মাণিক্ বক্সীর বাটীতে চলিয়া গেলেন। মাণিক কায়স্থজাতীয় ও সম্পত্তিশালী ছিলেন—কবিরত্নাকরকে অসময়ে দেখিয়া মাণিক্ শশব্যস্তে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কবিরত্নাকর বলিলেন—"মাণিক খুড়া! আমি বড় দায় ঠেকিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আমার গাতিজমাগুলি তুমি লইয়া আমাকে উদ্ধার কর।" মাণিক্ বলিলেন, "সে কি, আপনার গাতি আমি লইব কেন? আর ত তৃতীয় প্রহর বেলায় অস্নান ও অভুক্তাবস্থায় বা এত ব্যস্ত কেন? আচ্ছা খাওয়া দাওয়া করিয়া সুস্থ হন—রাত্রে এ বিষয়ে পরামর্শ করিব।" "না, না, খুড়া তাহা কিছুতেই হইবে না—যে সম্পত্তির জন্য আমার শাস্ত্র চর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটে, যাহার জন্য আমার ইষ্টপূজার সময় যবনের মুখ দর্শন করিতে হয়, তাহা না ঘুচাইয়া আমি অন্ন জল স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ কর ভালই—না হইলে আমার অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইবে। আজ হউক, কাল হউক, দশদিন পরে হউক, সম্পত্তি ঘুচাইয়া তবে আমার অন্ন জল গ্রহণ।" এই বলিয়া কবিরত্নাকর বড় দুঃখে, ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কবিরত্নাকরের চরিত্র মাণিকের অবিদিত ছিল না, তিনি আর তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মাণিক গাতি লইতে সম্মত হইলেন—কবিরত্নাকর সেই সময়েই সেখানে বসিয়াই বিনাপণে মাণিককে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী আসিয়া তবে অন্ন জল গ্রহণ করিলেন—এমনই ছিল তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও আত্ম সম্মান জ্ঞান, এমনই ছিল তাঁহার বিষয় নিস্পৃহতা ও ভগবদ্ভক্তি! হায়! কোথায় সেই ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ! তাঁহাদের মত যোগ্য সন্তান নাই বলিয়াই আমাদের পল্লীমাতা আজ দীনা, হীনা, শোক-তাপ-বিমলিনা কাঙ্গালিনী বেশে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন—কে তাঁহার সে অশ্রু মুছাইয়া দিবে?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।



চণ্ডীদাস কয়জন ?

কবি চণ্ডীদাসের নাম বঙ্গ-বিশ্রুত; বঙ্গোশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, বা অশিক্ষিত এমন কোন লোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার—যিনি চণ্ডীদাসের নাম শুনেন নাই আর যাঁর কানের ভিতর দিয়া চণ্ডীদাসের সেই সুধা মাখানো মোহন বাঁশীর অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদিনী সুস্বর 'মরমে পশিয়া গিয়া' আকুল করিয়া তুলে নাই তার প্রাণ; ঘাটে, মাঠে, ঘরে, বাহিরে, সঙ্গীহীন অবস্থায় আর বন্ধু সমাজে, শোকে আনন্দে, প্রিয়ার বিরহে অথবা শুভ সম্মিলন বাসরে সর্ব্বত্রই চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্থান এখনো শীর্ষদেশে। যখনই বিরহ দহন তাপিতকার করে তোলে বিরহীর মন, বিশেষ করে, সে যদি জলঝরা বাদলের মাদলের সনে হয়—তখনই অন্তরের কোন অন্তঃস্থলতার আকুল ক্রন্দনে ফুকারী উঠে—

"পাখীরে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিনু
সকলি গরল ভেল ॥"

আবার নব বসন্তে প্রভাত প্রফুল্ল পাখীর কাকলি আর পুষ্পসার সুগন্ধি শীতল বায়ুর স্পর্শে মিলন মধুর বর্ষণে সোহাগ পুলকিত কলেবরে যখন প্রিয়ের তরে গা এলাইয়া দেয় তখন কোকিল নিন্দিত মধুর স্বর লহরীর সাথে প্রাণ হতে গান তার আপনা আপনি ফুটে বের হয়:—

বধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণপতি হইয়ো তুমি ॥

শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যে দিন এ হেন চণ্ডীদাসের আবার নূতন এক গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন সেদিন "ললিত লবঙ্গ লতা পরি শিথল মলয় সমীরে" এক মহা ঝটিকার আবর্ত্তের আরম্ভ হইল। মহা আন্দোলন, আলোচন ও সমালোচন সুরু হইয়া গেল। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে মধুপগণ যেমন মহা কলরব করিতে থাকে এই নূতন আবিষ্কার বা পুরাতনের পুনরাগমণে বাঙ্গালীর নীবব নিথর, নিস্পন্দ কুঞ্জকুটীরেও সেই রকম এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল; কেহবা পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস এই উভয়কে এক বলিলেন আবার অনেকেই বলিলেন দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস দুই পৃথক্ ব্যক্তি এবং বর্ত্তমানে যে কেউ চণ্ডীদাসের কথা আলোচনা করিতে বসেন তিনি যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াই বসেন—চণ্ডীদাসকে পৃথক প্রতিপন্ন করিবার জন্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবল দ্বিজ ও বড়ু চণ্ডীদাসকেই পৃথক্ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আদি কবি প্রভৃতি আরও বহু চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছেন; ফলে আগুন নিবাইতে ঘি ঢালা হইয়াছে। চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সেই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। "বিধুর নিকটে নেত্রপক্ষ পঞ্চবাণ" প্রভৃতি পদে চণ্ডীদাসের যে ১৩২৫ পদের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে

পরিষদ প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী——৮৩০
তাহার পরিশিষ্টে——৯
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে——৪১৫

১২৫৪ পদ

পাওয়া গিয়াছে; আর বাকীগুলি বোধহয় অনুদ্ধাম্মিত পদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিলুপ্ত শেষাংশের সঙ্গে গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। যাহা সুপ্ত তাহা আমাদের আলোচনার বাইরে। যাহা ব্যক্ত তাহার মধ্যে কিছু বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত, কতক দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত আর কতকগুলি শুধু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত। আদি, কবি, বড়ু প্রভৃতি যদি ভিন্ন হয় তবে শুধু চণ্ডীদাস নামে যে পদগুলি আছে তাহা কোন্ চণ্ডীদাসের? এক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই যে চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতা দেখা যায় তবে কি ইহাও বহু চণ্ডীদাসের রচনা?

অবশ্য আমরা এ কথা স্বীকার করি যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বহু চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু

বাসুলীর সেবকই যে তাহাদের হইতে হইবে—ইহাতেই কেমন একটা খটকা বাঁধিয়া যায়। অবশ্য "কৃষ্ণের জন্মলীলা" রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসকে আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাস হইতে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করি।

এ পর্য্যন্ত পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে প্রধান আবিষ্কার। পদাবলীর চণ্ডীদাসের সময় নির্দ্ধারিত ও স্থাপিত হইয়াছে ; তাহাতে এখন পর্য্যন্ত কাহারও বিশেষ আপত্তি হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কোন্ সময়ের লেখা তাহা নিয়াও বহু গবেষণা হইতেছে ও হইয়াছে।

সন তারিখের সমস্যা এ দেশে সকল সময়ই অতি জটিল। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস হইতে লক্ষণ সেন কাহারও জন্ম মৃত্যু বা আবির্ভাব তিরোভাবের সন তারিখ স্থির হয় নাই। পণ্ডিতগণ; তত্ত্বান্বেষীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন আর বাদানুবাদ করিতেছেন ; বাংলা-সাহিত্যে তবুও একটু আশার কথা আছে ; কারণ সেকালের বাংলা গ্রন্থ রচয়িতাগণ অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থশেষে বা প্রারম্ভে অথবা গ্রন্থমধ্যে ভনিতারূপে—আপন আপন নাম ধাম ও বংশ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেন এবং অনুলিপিকরগণও গ্রন্থশেষে আপন আপন নাম ধাম ও নকল করিবার তারিখ প্রভৃতি লিখিয়া রাখেন। কিন্তু "অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়" আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আবিষ্কৃত পুথির শেষ দিকটাই হয়ত খণ্ডিত হইয়া পরে অথবা শেষ পাতাটা যদি বর্ত্তমান থাকে তবেও বাংলা দেশীয় গ্রন্থকীট বাছিয়া বাছিয়া সন তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করে—তার উপাদেয় খাদ্যরূপে ; চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনও উদ্ধার করা হইল, প্রকাশিতও হইল কিন্তু শেষ দিকটা বিলুপ্তির অতল সাগরেই নিমজ্জিত হইয়া রহিল। মন্দভাগ্য আমরা পুঁথির মধ্য হইতে তাহার কাল নির্ণয়ের কোনও সাহায্যই পাইলাম না। হয়ত চণ্ডীদাসের কোন পরিচয়ও অনুলেখনের তারিখটাও পাওয়া গেলে যাইতে পারিত কিন্তু তাহাও লুপ্ত হইয়া রহিল।

এখন গ্রন্থ লিপির বর্ণ বা অক্ষর দেখিয়া, গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া অথবা অন্যান্য আনুসঙ্গিক ইঙ্গিত বা আভাস যদি কিছু পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করিয়া ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিতে হইবে। সাহিত্যাচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় প্রত্নলিপি তত্ত্বের (Patrograph y বিশেষজ্ঞ,- তিনি বহু বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে লিখিত (শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পুথি দেখ)। প্রত্নশব্দতাত্ত্বিক ভাবে (Phylologically) আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে ভাষা আমরা পাইয়াছি তাহাই বা তদনুরূপই ছিল সেই সময়ের ভাষা। তাৎকালীন অন্যান্য গ্রন্থও এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে কি পদাবলীর ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নয় ? ইহার উত্তরে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই, এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সে সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। × × × সর্ব্বত্রই খাঁটী চণ্ডীদাসের খাঁটী ভাষা; বিকৃত,যুগান্তরিত ও আধুনিকতাপাদিত(Modernised) হইয়া গিয়াছে। এতকাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম—তাহা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা। চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পরিয়া তাহা আধুনিক ছাঁচে ফেলা ভাষা। ভাষার এ রূপান্তরের জন্য কেহই দায়ী বা দোষী নহেন। জীবিত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্ত্তন চিরকালই ঘটিয়া থাকে ; সেক্‌সপীয়রের (Shakespeare) or চসারের (Choucer) গ্রন্থাবলীর ভাষা এখন আর সে সময়ের ভাষা নাই। তাহাও যথা সম্ভব আধুনিকতাপাদিত হইয়া বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাস সমসাময়িক (যদি তারা বিভিন্ন হন); সুতরাং একই সময়ে দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করি, বিশেষতঃ উভয়েই যখন কবি,

বাসুলীর সেবক এবং বাসুলী আদেশে গ্রন্থ রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন— বড়ু চণ্ডীদাস আপনাকে বাসুলী গণ বলিয়াছেন, গতি বলিয়াছেন এবং বাসুলীর বরে বই লিখিতেছেন ইহাও স্বীকার করিতেছেন কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস ইহার কিছুই করেন নাই; বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর নামোল্লেখের পরে আর কিছুই বলেন না কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস তাহার পরেও শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে চণ্ডীদাস স্পষ্ট কথায় আপনাকে বাসুলীর গণ বা গতি বলিয়াছেন কিন্তু পদাবলীতে তাহা স্পষ্ট না বলিলেও তাহা অস্বীকার করেন নাই। বিশেষত:—

"বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥"
"বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে॥"
"চণ্ডীদাস কহে কিছু বাসুলী কৃপায়॥"
"বাসুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥"

প্রভৃতি ভনিতা হইতে বোধ হয় বোঝা যায় যে তিনিও বাসুলীর কৃপায় এবং তাঁহার আদেশেই পদ সমূহ রচনা করিয়াছেন এবং রাগাত্মিক সমূহ পাঠ করিলেও প্রতীয়মান হয় যে তিনিও বাসুলীর একজন পরম ভক্ত।

এইজানী বৈপ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহে ত বান্ধিয়া থুইবোঁ দানের অন্তরে॥ ধ্রু
(দানখণ্ড—৭৭ পৃঃ)

সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ঐ
তখনে রাধাক দিল মেলানী।
নাচিতে গাইতে বুলে চক্রপানী॥ ধ্রু
(বাণ খণ্ড—২৯২ পৃঃ)

পাছে জানি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥৪॥
হেব গিয়া তোহ্মার বদনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে॥ধ্রু॥
(বংশীখণ্ড—৩২৭ পৃঃ)

প্রভৃতি উদাহরণ হইতে মনে হয় যে "বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী নামোল্লেখের পরে আর কোন কথা বলেন নাই— এই সিদ্ধান্তটী বিচ্যুতি যুক্ত।

যাহারা চণ্ডীদেবীর সেবা করিতেন তাঁহারাই ছিলেন চণ্ডীদাস এবং এই পরম্পরাগত বহু চণ্ডীদাসই কবি ছিলেন— ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সকলেই ত আর 'রামি রজকিনী'র বধু হইতে পারে না। রাগাত্মিক পদ সমূহে আছে—

"ভজন তোমারি রাজার ঝিয়ারি
রামিনী নাম যাহার॥
বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই যে কলির ভূত॥"

সুতরাং দ্বিজ চণ্ডীদাস "রামি রজকিনীর বধু"; পদাবলীর চণ্ডীদাস যে রামি রজকিনীর প্রেমেই ধরা পরিয়াছিলেন— সে কথা ত সকলেই জানেন; সে সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করাও বাহুল্য মাত্র। আবার—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসও রজকিনীর "প্রেমে বাঁধা"। এখন আপনারাই বিচার করুণ বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভিন্ন কি অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কবি ও পদাবলীর কবি এক কি পৃথক—রামী রজকিনীর প্রেমের ফাঁদে পতিত, বাসুলী দেবীর ভক্ত কয়জন কবি চণ্ডীদাস।

এই চণ্ডীদাসের জীবনী প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" বলেন—"আপত্তি কারকের একজন (অর্থাৎ যাঁহারা চণ্ডীদাসকে বিভিন্ন বলেন) বলিতেছেন, চণ্ডীদাসের রচনা পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহা অনন্ত নামক গায়ক চণ্ডীদাসে কতক ২ পদ ভাঙ্গিয়া রচনা করিয়া আসাম হইতে চালাইয়াছেন। স্বকপোল কল্পিত অনুমানের উপর একটা বড় কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণের চেষ্টার একটা ভাণ করিয়াছেন মাত্র। তিনি কি কোথাও পাইয়াছেন, অনন্ত নামক "একজন গায়ক" ছিল এবং আসাম তার বাড়ী? যদিও আসামীর প্রাচীন ভাষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার কতকটা ঐক্য আছে, সেইরূপ ঐক্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ভাষার সঙ্গেও পরিদৃষ্ট হইবে। যেরূপ কথার প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে কেহ আসামবাসী বলিয়া অনুমান করেন—সেরূপ কথার প্রয়োগ যখন তুল্য পরিমাণেই অপরাপর অঞ্চলের ভাষায়ও পাওয়া যায়, তখন বলা উচিত, কবি বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া সেই সেই দেশের ভাষার তিল তিল গ্রহণ করিয়া এই কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ তিলোত্তমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।…… ……৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, আসাম, উৎকল ও মিথিলার ভাষা গত ঐক্য অনেকটা বেশী ছিল, সেই ঐক্য দেখিয়া চমকিয়া যাইবার কারণ নাই, বরং সেই ঐক্যের নিদর্শন পাওয়া যাওয়াতেই পুথিখানি প্রামাণিক বলিয়া মান্য হইবে।………গায়কের কণ্ঠে প্রাচীন পদের ভাষা নিত্যই নূতন হইয়া যাইতেছে, ইহাই এদেশের রীতি; কিন্তু তাহাতে কবির কৃতিত্ব হ্রাস পায়না, 'কৈরন্তির' স্থানে করে, 'অহ্মের' স্থানে আমি…প্রভৃতিরূপ পরিবর্ত্তন সামান্য বেশ পরিবর্ত্তন মাত্র। বিগ্রহ নব কলেবর ও নব অঙ্গরাগ ভিন্ন হইয়া যায়না। অন্য যে সকল পদ ও কবিতা চণ্ডীদাসের নামে বলিয়া আসিতেছে তাহার নূতন অঙ্গরাগ হইয়াছে মাত্র কবিকে আমরা হারাইয়া ফেলি নাই, নববস্ত্র পরাইয়া বাহির করিয়াছি মাত্র।……কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও পাওয়া যাইতেছে যে কবির নাম অনন্ত, তিনি বড়ু উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাসুলী দেবীর আজ্ঞায় পদরচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্ব্বে তাঁহার "অনন্ত" নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাসুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে আমাদের কোনও সংশয় নাই। চণ্ডীদাসের পদগুলি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন ধৃত এবং কবির প্রকটিত পদের পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে, যথা:—

দেখিলোঁ প্রথম নিশী　　শপন সুণতোবাসী
সার কথা কহি আরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদম তলে　　সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর বিফল জীবন এ বড়ায়িল।
সে কৃষ্ণ আনিয়া দেহ মোরে হে॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে　　বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আর বাঁশী বাস্ত মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী　　না দিলোঁ মো অনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী　　মোএঁ কহ্ন্ক্রিঁর কোলে বসি
নেহানিলোঁ তাহার বদনে॥
ঈসৎ বদন করি　　মন মোর নিলহরী
বেআকুলী ভৈয়িলোঁ মদনে।
চউঠ পহরে কাহ্ন　　করিল আধর পান
মোরভৈল রতিরশ আশে।
দারুণ কোকিল পাদে　　ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

কৃষ্ণকীঃ ৩৩৪ পৃঃ॥

প্রথম প্রহর নিশি স্বপন দেখি বসি
সবকথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বাঁশী বায় সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজপ্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহালিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈসত্ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান, করিল অধর পান
মোর ভেল পতি আশারসে।
দরুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গল আমার নিদে
রসগাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

ভাষার সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে, এই প্রভেদ না থাকিলে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপর প্রাচীনতা অন্য প্রমাণ সত্বেও স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম। এই একটী মাত্র পদই যে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের অনুরূপ তাহা নহে। বিস্তর পদে চণ্ডীদাসের পরিচিত সুর আমাদের কর্ণে বাজিয়া উঠে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কবি চণ্ডীদাসের জীবনের একটী বিশেষ কথা জানিতে হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—(চণ্ডীদাস—সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা ২৩খং—২য়সং—৭৫পৃঃ) "এ পর্য্যন্ত যত লেখাপড়া হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে চণ্ডীদাসের জীবনে তিনবার তিনরকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন তিনি বাশুলীর সেবক তখন তিনি খাঁটী বৌদ্ধ; যখন তিনি রামি রজকিনীর সেবক (বধু?) তখন খাঁটী সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। × × × × বসন্তবাবু ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন যে "রামি রজকিনী" বাশুলীর সেবাদাসিনী আর চণ্ডীদাস বাশুলীর একজন পরম ভক্ত।" এই কথাটীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই সন্দিহান নহেন কারণ ইহাত সবারই জানা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আলোচনা করিতে কবির জীবনের এক কথাটি আমাদের বড় প্রয়োজনীয়; কারণ আমরা এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস কাব্য ও তাহার সমালোচনাদি নাড়াচাড়া করিয়া কবি ও তাহার কাব্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারিয়াছি তাহা হইতে আমরা মনে করি যে কবি এই কাব্যখানা (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) তাঁহার কৈশোরে যখন তিনি রামি রজকিনীর প্রেমে পতিত হইয়াছেন কিন্তু রামি রজকিনী ধরা দেন নাই—সে সময় আপনার মনের আবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া "রাধাকৃষ্ণের" জীবন নিয়া এই কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। যাঁহারা একটু ধীরভাবে বিশেষ করিয়া কবির এই কাব্য ও পদসমূহের আলোচনা করিবেন—আমাদের বিশ্বাস তিনিই আমাদের এই কথায় সায় না দিয়া পারিবেন না। ক্রমে এই বিষয়টী আমরাও এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব সে তত্ত্ব নিহিত 'গুহায়াম্' তাই আমরা চণ্ডীদাস কাব্য-রস পিপাসুগণকে নিম্নোদ্ধৃতকেই একটু অনুধাবন করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—২৩খং ১মসং ১৭পৃঃ) বলেন—তিনি (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি) জয়দেবের কবিতা চুরি করিয়াছেন বস্তুতঃ।

যদি কিছু বোল বোলশি তার
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরেত্বরুবার ভয় অন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥ প্রভৃতি পদ।

জয়দেবের—
(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বৃন্দাবন খণ্ড)

"বদশি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরম তি ঘোরং" (গীতগোবিন্দম্—১০ম সর্গ)
প্রভৃতি পদের সম্পূর্ণ অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়।

ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে কবি ইহা প্রথম বয়সে এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কোন প্রথিতনামা বড় কবি অপর কবির কবিতা এইরূপ বেমালুম চুরি করে কি?

আমাদের মনে হয় কবি রামি রজকিনীর প্রথম প্রেমে পরিয়াছেন—হয়ত আপনার মনের উদ্দাম বাসনা কুক্ষ রাখিতে পারি, সে প্রেম তিনি নিজে ব্যক্তও করিয়াছেন কিন্তু রজকিনী তখনও ধরা দেন নাই। অপর কোন বুদ্ধিনিষ্ঠ মাঝে মাঝে রজকিনীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাওয়া আশা করিতেছেন কিন্তু সকলই নিস্ফল; কিন্তু রজকিনী মানুষ। আর মানুষ "অনুরোধে ঢেঁকিও গেলে" তাই ক্রমে রজকিনীও কবির সঙ্গে "প্রেম" করিতে লাগিলেন—এইরূপ মিলনের মধ্যদিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রকৃতই প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাই অবশেষে "রজকিণী প্রেম" 'নিকশিত হেম' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবি নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতা দিয়া এই অমর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাঁহার এই জীবনের বহু ছাঁপ যে তাহার কাব্যে আছে সে সম্বন্ধে কোনও তর্কই চলিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কবি তাঁহার এই অভিজ্ঞতায় কাব্য রচনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণ রাধিকাকে ইহার মধ্যে টানিলেন কেন? ইহার কারণ হয়ত অনেক। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বপ্লাবী প্রেম তখনই অনেকের মনে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল; এবং তিনি দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ধামালী যে তখন সাধারণ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিল সে কথাও কোন বঙ্গভাষার ইতিহাস পাঠকের নিকটই অবিদিত নাই; আচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলেন—"কৃষ্ণধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধুভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্বমণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন লিখিয়াছেন।" ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা, কারণ তখন তিনি রচনায় সিদ্ধহস্ত ন'ন তাই প্রাচীন রচনা কৃষ্ণধামালীকে তিনি ভিত্তি করিয়াছেন; প্রথম বয়সে যশ, মান ও প্রতিপত্তির প্রতি যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহার হাত হইতে নিস্তার না পাইয়াই তিনি সকলের পরিচিত ও সকলের আদরের কৃষ্ণ-কাহিনী তাহার রচনার বিষয় করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তিনি মামুলি প্রথার হাত হইতে নিস্তার পান নাই—তাঁহার বর্ণনা গোড়াপত্তনি করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জন্ম হইতে তাহার কাব্য আরম্ভ হইয়াছে।)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভাষাও ইহা যে কবির প্রথম বয়সের রচনা তাহা প্রমাণ করিতেছে। পাণ্ডিত্যের গৌরব ততদিনই থাকে যতদিন না সেই পাণ্ডিত্য গাঢ় হয় মাছ অল্প জলেই "ফর্ ফর্" করে বেশী জলে আর তার সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও এই পাণ্ডিত্য গৌরব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি যে উপমাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহার বহু প্রমাণ এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বলেন "অনন্ত কবি অতিশয় গ্রাম্য ছিলেন; ভাষায় গ্রাম্য, অশিষ্ট, ভাবে গ্রাম্য অশিষ্ট। বহু কবি আদি রস প্রধান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাঢ় চোয়ারি দেখিয়া বুঝি কবি রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ গ্রাম্য দুঃশীল কিশোর কিশোরীর অনুরাগের তুল্য মনে করিয়াছেন।" বস্তুতঃই তাহার ভাষা গ্রাম্য, অশিষ্ট, কিন্তু ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয় ইহা তাহার প্রথম বয়সের রচনা বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। কোন নবীন কবিই কি যুগ প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছে? না পারেন? সে যুগে যাহা "সু" ও "কু" ছিল এ যুগের "সু" ও "কু"র সঙ্গে তাহার অনেক প্রভেদ। "চণ্ডীদাসের অপরাপর পদের তুলনায় যদি এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাধারণতঃ হীন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয় তাহাতেও উহা অবিশ্বাস্য বলিবার কোনও কারণ নাই

যে হোমারের অমর কীর্ত্তি "ইলয়ডের" যশঃপ্রভায় সমগ্র ইউরোপ আলোকিত, তিনি বাল্যকালে ভেকের গল্প লিখিয়াছিলেন। যিনি "চাইল্ড হেরল্ড" ও "ডনজুয়ান" লিখিয়া স্কটের কবি প্রতিভাকে চন্দ্রের নিকট শুক্রতারার স্থায় মলিন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি বাল্যে "আলস্যের অবসর" (Hours of Idleness) কাব্য লিখিয়া সমালোচকের কষাঘাত খাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে যে প্রেমিকযুগল সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ও বিষবৃক্ষ একই হস্তের দান বলিয়া কাহার মনে হইবে ?"

(দীনেশ বাবু—১৯৯ পৃঃ)

তিনি যে "রাধাকৃষ্ণ সংবাদ গ্রাম্য দুঃশীল কিশোর কিশোরীর অনুরাগের তুল্য" করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাত আমাদের ধারণার ভিত্তিই সুদৃঢ় করিতেছে নয় কি ? ইহা যে কবির জীবনের ছায়ায় সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সংশয় থাকে কি ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ বা রাধিকার পূর্ব্বরাগ নাই। আবার পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিলেন। আর

"যেই সে দেখিল তখন হইতে" "তিনি কিছু না সম্বিত" পাইলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ বড়াইর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া মদনাতুর হইলেন।

"বড়াই ল।

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি।
ধরিবার না পারোঁ পরাণী॥
দারুণ কুসুম শরে সুদৃঢ় বন্ধনে।
অতিশয় মোর মনে হানে॥
× × ×
অতিশয় বাড়ে মোর মদন বিকার।
তাত মোর কর উপকার॥"

আবার

"তোর মুখে শুনি রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহা নিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে।" ইত্যাদি॥

দানখণ্ডে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট দানের কড়ি চাহিলেন, রাধিকা যখন তাহা দিতে অস্বীকৃতা হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ জোড় করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

"বুঝি বাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে॥
× × ×
ছাড়ি দিবোঁ দান পর আক্ষার বচন॥
× × ×
এভোঁ যাবেঁ না ধরিবে আক্ষার বচন।
বলে ধরি তোকে মোঁ দিবোঁ আলিঙ্গন॥"

প্রভৃতি পদে দেখা যায় যে কবির যৌবনের উন্মত্ততা তখনও দূর হয় নাই। তখনো তিনি পৈশাচিক কাম প্রবৃত্তিকে নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন তিনি "রামী প্রেমে" মাজতে আরম্ভ করিলেন আর একটু একটু করিয়া বয়োবৃদ্ধও হইয়া উঠিলেন তখন তিনি টের পাইলেন যে

"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কাম গন্ধ নাহি তায়॥"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনা যুগের আলো দেখিতে পাইলেন, এবং সেই আলোকপাতে তাঁহার "রাধা বিরহ" অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। তিনি আকুল হইয়া পরাণ ভরিয়া গাহিলেন :—

"কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব্দ মো আউলাই লোঁ রান্ধন॥
কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তাঁর পাএ নিশি বোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়াই চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আবার ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

প্রভৃতি॥

এই দিব্য দৃষ্টি যখন তিনি লাভ করিলেন তখন তাঁর মনের সমুদয় আবিলতা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, কোনোও মলিনতার আর লেশ মাত্রও নাই, তিনি তখন পার্থিব মানুষের অনেক উর্দ্ধস্তরে উত্থিত হইয়া গিয়াছেন। তাই তার সেই পূর্ব্ব-অঙ্কিত চিত্রখানা আর সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইলই না বরং তাহা বোধহয় অতি কুৎসিত, কদাকার সাহিত্যে পর্য্যবসিত হইল, সে কারণই মধুময় পদাবলীর আবির্ভাব। তখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "পিরীতি কি রীতি" তাই এত মধুর সেই পূর্ব্বরাগের সৃষ্টি হইল, মান ও মানভঞ্জনের পালা সুরু হইল, বৃন্দাবনের বনে বনে রাসলীলা আরম্ভ হইল, যমুনা জলকেলীতে পূত হইল।

পদাবলীর পদলালিত্য, রচনা মাধুর্য্য, বিশেষ করিয়া তাহার ভাব ও ভাষা সকলের চিত্তে এক সম্মোহিনী মায়ার প্রভাব বিস্তার করল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রিমাদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র মলিন হইয়া গেল। পদাবলী লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইয়া চিরজীবি হইল আর শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন লোক লোচনের অন্তরালে পড়িয়া রহিল।

তাঁহার গানের ভণিতা হইতেও আমাদের মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির কৈশোর রচনা আর পদাবলী তাহার বার্দ্ধক্যের গঠন। যত দিন তার মধ্যে "অহমিকা" পূর্ণরূপে বিরাজিত ততদিন তিনি বড়ু চণ্ডীদাস কারণ আভিজাত্যাভিমান প্রবল তদনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নাম বিস্তার ইচ্ছা বলবতী কবি চণ্ডীদাস কবিত্বের অভিমান আর বাসুলীর গণ বা গণ্ডী। তারপর যখন তিনি সাধনায় সিদ্ধি হইলেন তখন আর তার মধ্যে অহঙ্কার নাই, পাণ্ডিত্যের চাকচিক্য নাই, আভিজাত্য গৌরব নাই—তখন তিনি শুধু চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী পড়িতে পড়িতে সমস্ত পাঠকই বোধহয় একটী বিশেষ বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াছেন। পদাবলীতে রাধিকাকে বৃষভানু রাজার নন্দিনী ও কৃত্তিকা মোহিনীর গর্ভজাত বলা হইয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তিনি সাগর গোয়ালার ও পদ্মাবতীর কন্যা আবার পদাবলীর রাধিকা ও চন্দ্রাবলী দুইজন পৃথক। একে অন্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিদ্বন্দী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে রাধিকার নামই চন্দ্রাবলী। এই কথা নিয়া কেহ কেহ লেখকের পৃথক সত্তা আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

রাধিকার পিতা মাতাকে নিয়া বোধ হয় বহুদিন হইতেই মতভেদ ছিল; ব্রহ্ম বিবর্ত্ত পুরাণে তিনি বৃষভানু সুতা আর কলাবতী তার "জননী" আবার পদ্মপুরাণে তাঁর জননী "কীর্ত্তিদা"। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন "অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসারে শ্রীরাধার জনক জননীর নাম সাগর গোয়ালা ও পদ্মাবতী ছিল এরূপ মনে করিলে চলিতে পারে।" কবি যখন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং তাঁহার এই গ্রন্থ যখন অনেকটা ব্রহ্ম বিবর্ত্ত পুরাণের ছাঁচে ঢালা তখন কবি পুরাণ হইতে বিভিন্ন রূপে ইহাকে দাঁড় করিলেন কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কিশোর কবির রচনা; তখন তার লোকরঞ্জনের স্পৃহা বলবতী, যশের আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় তাই তিনি বোধ হয় তৎকাল প্রচলিত জনবাদকেই বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই সকল রাধিকাই "রায়ান ঘোষ" "আয়ান ঘোষ" বা "আইহনের" স্ত্রী তখন এই সমস্তাকে খুব বড় করিয়া দেখার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাকি রাধা ও চন্দ্রাবলীকে প্রকৃতপক্ষে অভিন্নই বলা হয় অথচ দেহতঃ তাহারা নাকি ভিন্ন; বৈষ্ণবগণ বলেন এই দেহতঃ বিভিন্ন ব্যাপারের একটু গুহ্য উদ্দেশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন রতি ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন তখনই তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে তাঁর দেহ ভোগ চলিতে পারে কিন্তু শ্রীরাধার সঙ্গে তাহা অসম্ভব। একই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ভোগের লিপ্সাই এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠে সুতরাং এই মত অনুসারে এই রাধিকাই চন্দ্রাবলী। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তা চন্দ্রাবলীর জনক জননীর নাম কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখা উচিত। এই সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা

সম্বন্ধেও আমরা স্থির বিশ্বাস নাহি। যে সমস্ত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁহারা প্রায়ই চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী রচনা। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আমরা এখানে দেখিতে পাই নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ সমস্ত গ্রন্থে ইহা পাওয়া সম্ভব ছিল তাহা সংগ্রহ করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হইয়া উঠিল না; যদি কখনো পাই—সে খোঁজে রহিলাম। কিন্তু এইরূপ ভিত্তিহীন ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের অন্যায়।

ব্রহ্ম বিবর্ত্ত পুরাণে পাওয়া যায়:—

রাসে রাসেশ্বরী রূপা, রাধা বৃন্দাবনে বনে। ৪র্থ প্রঃ খঃ
কৃষ্ণা প্রায়াচ গোলোকে, তুলসী কাননেই তুলা।
চম্পাবতী কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া চম্পক কাননে। ৫০।
চন্দ্রাবলী চন্দ্রবনে শত শৃঙ্গে সতী সতি।
বিরজা দর্পহাস্রীচ বিরাজকেই কাননে ৫০
পদ্মাবতী পদ্মবনে, কৃষ্ণা কৃষ্ণ সরোবরে। ইত্যাদি

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাধাই যখন চন্দ্রবনে থাকেন তখন তিনিই চন্দ্রাবলী সুতরাং উভয়ে অভিন্ন। তবে পদাবলীর চন্দ্রাবলী ভিন্ন কেন? আমাদের মনে হয় কবি এই দুই মহা প্রেমিকের মান ও মানভঞ্জন "দোঁহে পরাব মুরারম" ভাবটী প্রস্ফুটিত করিতে ইচ্ছা করিয়াই, ভিন্ন সত্তা চন্দ্রাবলীর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমিকের মন তাঁহার উপাস্য দেবতাকে অপরের সঙ্গে দেহ-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ভাবিতেও বোধ হয় পারে না। তাই কবি অনন্য সাধারণ প্রতিভা বলে চন্দ্রাবলী ও রাধিকাকে পাশাপাশি সাজাইয়া তাঁহার কাব্যকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার পদ সমূহেও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়াছেন কিন্তু কখনো রাধিকার সঙ্গে এরূপ আলাপও করেন নাই বা রাত্রি যাপন করেন নাই।

সুতরাং আমাদের মনে হয় যে আপনারাও অভিন্ন মত হইয়া বলিবেন যে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যে এক এবং আমাদের বিশ্বাস যে "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা আপনাকে দীন চণ্ডীদাস বলিয়া পরিচিত করেন এবং তাঁহার কবিতায় এইরূপ চণ্ডীদাসী ছন্দ বা মাধুর্য্যের বড়ই অভাব সুতরাং তাঁহারা এই দুই গ্রন্থের রচয়িতার লেখনী-প্রসূত নহে।

শ্রীহরিপদ সেন গুপ্ত।

গন্ধ।

গন্ধ বলিলে যাহা বোঝা যায় প্রকৃত পক্ষে তাহার অর্থ কি? কেনই-বা আমরা বস্তু বিশেষকে গন্ধহীন বলি, এবং পক্ষান্তরে কেনই-বা আমরা কোনও বস্তুকে সুগন্ধযুক্ত এবং অপর কোনও বস্তুকে দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া থাকি? অর্থাৎ গন্ধ কাহাকে বলে এবং তাহার সু এবং কু বা কি? এতদ্ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যদিও আমরা নানা প্রকার গন্ধের কথা প্রতিনিয়তই বলিয়া থাকি, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই আমাদের অজ্ঞানতা সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রীয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং অনেকটা তাহারই ফলে একদিকে গ্রামোফোন (Gramophone), ফনোগ্রাফ (Phonograph) অপরদিকে টেলিফোন (Telephone), অডিফোন (Audiphone) প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক যন্ত্র সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকগণ চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া অসংখ্য প্রকার নয়ন বিমোহন রঞ্জন উপকরণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতেছেন। জিহ্বা ও ত্বকের ক্রীয়া পদ্ধতি সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তানুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। কিন্তু ঘ্রানেন্দ্রিয় ঠিক কি ভাবে বস্তু বিশেষের ঘ্রাণটা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পদার্থ নিচয়ের রাসায়নিক গঠন প্রণালীর সহিত উহাদের ভিন্ন ভিন্ন ঘ্রাণের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবনেন্দ্রিয়ের ক্রীয়া যেরূপ ইথার (ether) বা শক্তি-তরঙ্গ স্পন্দন (Vibrations) সমূহের, ঘাত প্রতিঘাত সঞ্জাত, ঠিক সেইরূপ ইথার তরঙ্গ স্পন্দন হইতেই ঘ্রাণের উৎপত্তি। উঙ্গেরার (Ungerer), ষ্টডার্ড (Stoddard) প্রমুখ অপর বৈজ্ঞানিকগণের মতে কোনও প্রকার শক্তি তরঙ্গ স্পন্দন হইতে ঘ্রাণের উৎপত্তি নহে, পক্ষান্তরে বস্তু বিশেষের অনু সমূহের (Molecules সহিত আমাদের গন্ধবহানাড়ী (Olfactory nerves) গুলির সংস্পর্শ হইতেই ঘ্রাণের উৎপত্তি।

উপরে বলা হইয়াছে যে ঘ্রাণনাড়ী ও অনুসমূহের নোদন (impact) হইতেই ঘ্রাণের উৎপত্তি, কাজেই একমাত্র উদ্বায়ী (volatile) পদার্থেরই ঘ্রাণ থাকিতে পারে। কর্প্পূর, নিশাদল প্রভৃতি উদ্বায়ী পদার্থ। উহারা বায়ুপরিণামশীল অর্থাৎ রাখিয়া দিলে উহারা ক্রমে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হইয়া যায়। কোনও নির্দ্দিষ্ট ওজনের একখণ্ড কর্পূরকে কতকদিন মুক্ত স্থানে রাখিয়া পুনর্ব্বার মাপিলেই দেখা যায় যে উহার ওজন কমিয়া গিয়াছে। একখণ্ড বৃহৎ কর্পূরের যাহা ধর্ম্ম উহার সুক্ষাতিসুক্ষতম অনুতেও তাহা বর্ত্তমান। এই অনুসমূহ বায়ুর সঙ্গে ভাসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘ্রাণ নাড়ীকে আঘাত করে। তখন ঐ ঘ্রাণনাড়ীগুলির একটা কম্পন বা পরিস্পন্দ (vibration) উপস্থিত করে এবং উহা স্নায়ুসূত্রদ্বারা স্নায়ুকেন্দ্রে (Nerve centre) অনুভূত হয়। এই কম্পন বা স্পন্দনের স্বরূপ দ্বারাই ভিন্ন ভিন্নরূপ গন্ধ সূচিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কর্পূরের গন্ধ আছে এরূপ বলা ভুল। খাটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে কর্পূর নামে পরিচিত জৈব (organic) পদার্থ বিশেষের অনুসমূহ গন্ধবহানাড়ীর সংস্পর্শে আসিলে তন্মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের কম্পন উৎপত্তি করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব বর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে উদ্বায়ী পদার্থ মাত্রেরই, এবং একমাত্র উহাদেরই, কোনওরূপ ঘ্রাণ থাকা উচিত; কারণ উহাদের অনুসমূহ বায়বীয় অবস্থায় গতিশীল বিধায়ে বায়ুর সঙ্গে ভাসিয়া যাইয়া ঘ্রাণনাড়ীকে আঘাত করিতে পারে এবং ঐ আঘাত জন্যই ঘ্রাণনাড়ীর একটা বিশিষ্ট—স্পন্দন উপস্থিত হয়। অনুদ্বায়ী (Non-volatile) পদার্থের অনুসমূহ ঐরূপ স্পন্দন উপস্থিত করিতে পারেনা এবং কাজেই উহাদের গন্ধও থাকিতে পারে না।

ঘ্রাণের কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের উক্তরূপ মত হইলেও ২১১টি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখান যায় যে উহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন যোগ্য নহে। প্রথমতঃ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আদর্শ অনুদ্বায়ী পদার্থ। বহুদিন রাখিয়া দিলেও উহাদের ওজন হ্রাস পায় না। কাজেই স্বর্ণ বা রৌপ্যের গন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় যে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা চক্ষে না দেখিয়া বা স্পর্শ না করিয়া ঘ্রাণ দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু সমূহের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে উদজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষারজান (Nitrogen) প্রভৃতি হইতেছে আদর্শ উদ্বায়ী পদার্থ,অথচ উহাদের কোনওটিরই কিছু মাত্রও কোনওরূপ গন্ধ নাই। এ স্থলে বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যা হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত উদজান প্রভৃতি পদার্থের আনবিক গঠন প্রণালী (molecular structure) অত্যন্ত সরল ; কাজেই উহাদের গন্ধ নাই—অর্থাৎ উহাদের অনুসমূহ ঘ্রাণবহানাড়ীকে আঘাত করিলেও তন্মধ্যে কোনওরূপ স্পন্দন উপস্থিত করিতে পারেনা। অতএব নির্ণয় হইতেছে যে উদ্বায়ী পদার্থ সমূহের মধ্যে যেগুলির আনবিক গঠন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল কেবল মাত্র তাহাদেরই গন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তও বিশেষ সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ক্লোরিন (chlorine), আরগণ (argon), অম্লজান (oxygen) প্রভৃতির প্রত্যেকটিরই আনবিক গঠন অতি সরল ; অথচ প্রথমটীর তীব্র গন্ধ বর্ত্তমান, শেষোক্তগুলার গন্ধ নাই।

এই সমস্ত অসামঞ্জস্য উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ গন্ধ সম্বন্ধে একটি নূতন কল্পনা বা সিদ্ধান্তের (Theory), অবতারণা করিয়াছেন। এই মতানুসারে

অণুসমূহের মধ্যাস্থিত পরমাণু সমূহের চঞ্চলতা রূপ ধর্ম্মের উপরেই বস্তু বিশেষের গন্ধ নির্ভর করিতেছে। পরমাণুর (atoms) সমবায়ে অণু (molecules) সমূহ গঠিত। অণুস্থিত পরমাণু গুলা নিশ্চল বা নিষ্ক্রীয় নহে, উহারা অণুমধ্যেই সতত চঞ্চল ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, এবং পরমাণুগুলির এই চঞ্চলতার স্বরূপ দ্বারাই অণুসমূহের অতএব বস্তু বিশেষের গন্ধ নির্দ্দেশিত হয়। যে বস্তুর অণুমধ্যস্থ পরমাণুগুলির চঞ্চলতা এমন যে উহা ঘ্রাণবহনাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া স্পন্দনের সৃষ্টি করিতে পারে তাহারই গন্ধ আছে। ভিন্ন বস্তুর অণুমধ্যস্থ পরমাণুসমূহের চঞ্চলতা (Dynamic conditions) বিভিন্ন প্রকারের, কাজেই উহারা ঘ্রাণ মধ্যস্থিত ঘ্রাণবহা নাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্পন্দন সৃষ্টি করে বলিয়া বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গন্ধ ... হওয়া সত্বেও (যথ অম্লজান, যবক্ষারজান) উহার অণুস্থিত পরমাণুগুলার চঞ্চলতার স্বরূপ এরূপ হইতে পারে যে তাহা ঘ্রাণবহানাড়ীতে কোনও স্পন্দনের সৃষ্টি করিতে পারে না, কাজেই এই শ্রেণীর পদার্থের গন্ধ নাই। ইহাই হইতেছে গন্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গণের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ব্যাখ্যা। অতএব দেখা যাইতেছে অণুমধ্যস্থ পরমাণুগুলার চঞ্চলতার স্বরূপের উপরই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ঘ্রাণের প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সরকার।

গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের হস্তীতত্ত্ব। *

খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও যে ভারতের কথা গ্রীসদেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কি সেই প্রাচীন যুগেও যে ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সমূহ গ্রীসে ব্যবহৃত হইত তাহারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। † কিন্তু ভারতবর্ষের অস্তিত্বের কথা জানা থাকিলেও ইহার অবস্থান সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাহারা মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর একেবারে সীমান্তে অবস্থিত। প্রাচীন যুগ ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যুগে আসিলে সর্ব্বপ্রথম হেকাটায়স্ (Hekataios B. C. 540—486) এবং পরে সুনামখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের (Herodotos) বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্ট কথা পাওয়া যায় বটে কিন্তু যে ঘটনা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার আনিয়া দিয়াছিল তাহার নাম গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ অভিযান, আলেকজাণ্ডারের অনুচরগণের মধ্যে অনেক কতিপয় ব্যক্তি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু সে সকল মূল বিবরণ লুপ্ত হইয়া গিয়া এখন শুধু Straboo, Pliny এবং Arrianএর গ্রন্থে সে সকলের সার মর্ম্ম পাওয়া যায়। ইহার পরেই সুনামধন্য মেগাস্থেনীস্। মেগাস্থেনীস্ ভারতবর্ষে কিছুকাল বসবাস করিয়া এদেশের সম্বন্ধে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়েও এক অমূল্য বস্তু। মেগাস্থেনীসের মূল গ্রন্থ এখন আর অস্তিত্ব নাই সত্য কিন্তু তাহার বিবরণ বিবিধ প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় লেখকদের গ্রন্থে এত বহুল পরিমাণে উল্লিখিত এবং উদ্ধৃত হইয়াছে যে সেই সকল গ্রন্থ হইতেই মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ পুনঃ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য Strabo, Pliny, Arrian, AElian ইত্যাদি। এস্থলে প্রাচীন ভারতের হস্তী সম্বন্ধে যে তথ্য বিবৃত হইতেছে তাহাও প্রধানতঃ Strabo, Arrian, AElianএর যোগে মেগাস্থেনীসের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত। প্রাচীন ভারতের হস্তীসম্পদ খুবই অপর্য্যাপ্ত ছিল। সেই সময়ে যুদ্ধের কার্য্যে প্রচুর

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অধিবেশনে পঠিত।

† ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত দেখা যায় টিন ও হস্তী দন্ত।

গুপ্ত গৃহবাস হইতে বাহিরে আসিয়া তাড়াতাড়ি সেতুপথ বিমুক্ত করিয়া ফেলে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে গিয়া খবর দেয় যে হাতী শিকার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম হইতে আরও ভাল ভাল শিকারী হাতী আনা হয়। অনেক স্থলে তাহারা তৎক্ষণাৎ শিকারে প্রবৃত্ত না হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করে যাহাতে বন্য হস্তীগুলি ক্ষুধার তাড়নায় এবং পিপাসার জ্বালায় একটু কাতর হইয়া পড়ে। তখন তাহারা আবার সেতুপথ মুক্ত করিয়া সকলে মিলিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং সমস্ত পোষা হস্তী-দ্বারা বন্য হস্তীদের উপর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। বন্য হস্তীগণ একেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর তাহার উপরে আক্রমণে নিৰ্বীৰ্য হইয়া উহারা সহজেই পরাভূত হয়। পোষা হাতীগুলি বন্য হস্তীর ধারে ধারেই থাকে, বন্য হস্তীগুলি ঐরূপে নির্বীর্য হইয়া পড়িলে শিকারীদের মধ্যে যাহারা খুব সাহসী তাহারা ভূমিতে অবতরণ করিয়া নিজ নিজ হস্তীর পেটের নীচে আসিয়া দাঁড়ায় সেখান হইতে সুযোগ বুঝিয়া—অজ্ঞাতসারে বন্য হস্তীর পেটের নীচে গিয়া উহার পা গুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তারপরে পোষা হাতী দ্বারা উহাদের উপর আবার আক্রমণ করান হয়। একেই ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহার উপর পা বাঁধা থাকা দরুণ ইহারা সহজেই পড়িয়া যায়। তখন শিকারীরা নিকটে দাঁড়াইয়াই একে একে বন্য হস্তীদের গলায় বৃষ চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দেয়। এবং উহাদের পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া বসে অথবা এক একটি পোষা হাতীর সহিত এক একটী বন্য হস্তীকে ঐরূপ বৃষ চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জুতে গলায় গলায় বাঁধিয়া ফেলে। এদিকে একখানা তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা বন্য হস্তীর গলায় মালার আকারে একটি খাজ কাটিয়া ফেলে এবং তাহার মধ্যে ঐ রজ্জুর ফাঁস বসাইয়া দেয় যেন আর নড়িবার ক্ষমতাও না থাকে। এইরূপে কোন প্রকার বাধা দেওয়ার শক্তি মাত্রও একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া পোষা হাতীর সাহায্যে ইহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া হয়। এই বন্য হস্তী যূথের মধ্যে যেগুলি একেবারে বৃদ্ধ বা অতি অল্প বয়স্ক অথবা রুগ্ন বা দুর্ব্বল অর্থাৎ যেগুলি কাজের অনুপযুক্ত সেগুলি তখনই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকী সমস্ত হস্তীগুলিকে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে বা কোন হস্তীশালায় লইয়া যায়; সেখানে গিয়া প্রত্যেকটী হাতীর পা গুলি একটীর সহিত আর একটি করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং গলায় রজ্জু বাঁধা হয়—কোনপ্রকার দৃঢ় স্তম্ভের সহিত। এইখানে তাহাদিগকে প্রথমে উপবাসে ক্লিষ্ট করিয়া পরে শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য কাঁচ ঘাস এবং শুক্না ঘাসও দেওয়া হয়। ইহারা বন্য অবস্থা হইতে বন্দী-দশায় আনীত হইয়া এতটা নিরুৎসুক হইয়া পড়ে যে প্রথমে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে চায় না। শিকারীরাও এইজন্য প্রস্তুত থাকে; তাহারা তখন সকলে মিলিয়া চারি-দিকে আসিয়া দাঁড়ায় এবং বাদ্য (drums and cymbols) ও সঙ্গীতাদির সংযোগে তাহাদিগের তৃপ্তি এবং তুষ্টি সাধন করিবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ ইহাদিগকে বশে আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না কারণ হস্তী স্বভাবতঃই অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির প্রাণী। কিন্তু কোন কোন বিবরণে আছে যে বন্য হস্তী পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে বশীভূত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই অবস্থায় হস্তী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রক্ত পিপাসু হয়; তখন ইহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং কিছুতেই বশ মানিতে চায় না। সেই সময়ে ইহার সম্মুখে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিলে সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। এরূপ অবস্থায়ও বাদ্য এবং সঙ্গীতাদিই একমাত্র ক্রোধ নিবারক হয়। সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত চারিটি তার সংযুক্ত এক প্রকার বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের মধুর ধ্বনিতে বন্দী দশা প্রাপ্ত ঐরূপ উত্তেজিত বন্য হস্তীরও শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠে এবং ক্রোধেরও উপশম হয়। তখন ক্রমে ক্রমে খাদ্য সামগ্রীর দিকেও নজর পড়ে। তারপরে সঙ্গীতে এমনই অভিভূত হয় যে সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেও হস্তী আর পলায়নে উৎসুক হয় না। তখন একদিকে সঙ্গীত অপরদিকে খাদ্য উপভোগে আদরণীয় অতিথির মত সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

সেই সময়ে সমস্ত হস্তীই রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে হাতী রাখিবার অধিকার ছিল না। কোন কোন স্থলে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারেও হাতী থাকিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—হয়তো সময় এবং অবস্থা বিশেষে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজার অনুমতিক্রমেই উহা সম্ভব হইত। অন্ততঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রয়োজনের সময় যে দেশের সমস্ত হস্তীই রাজার ব্যবহারে আসিত তাহা খুবই অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধের কার্য্য শেষ হইলেই আবার সমস্ত হস্তী রাজ্যের হস্তীশালায় ফিরিয়া আসে।

সামরিক বিভাগের কার্য্য ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী আছে যাহারা হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত। হস্তীকে আয়ত্তে রাখিবার জন্য ঘোড়ার লাগামের ন্যায় কোন প্রকার লাগাম ব্যবহৃত হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে যেমন জাহাজের কাপ্তান হাল ধরিয়া জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করে তেমনই মাহুত অঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে যথেচ্ছা চালাইয়া নিয়া যায়। যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হস্তীর পৃষ্ঠে হাওদার উপরে অথবা রিক্ত পৃষ্ঠে তিন ব্যক্তি যোদ্ধা ধনুর্ব্বাণ হস্তে উপবিষ্ট থাকে। দুইজন দুই পার্শ্বে এবং একজন পেছনে বসিয়া তীর ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

বসন্ত ঋতুতেই হস্তীর পক্ষে যৌথ-সম্মিলনের কাল—যেমন গরু ও ঘোড়ার পক্ষে। এই সময়ে হস্তী এবং হস্তিনারও কপালের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র পথে এক প্রকার চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ নির্গমন হইতে থাকে। ইহাই কাব্যাদিতে বর্ণিত মদবারি ধারা। কোন কোন বিবরণে আছে যে সেই সময়ে হস্তিনী ঐ ছিদ্রপথে প্রশ্বাস ত্যাগ করে। ইহাদের সঙ্গম প্রণালীও ঘোড়া এবং গরুরই অনুরূপ। হস্তিনীর গর্ভধারণ কাল ১৬ মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত। ইহার পরে আবার বসন্ত ঋতুতেই সাধারণতঃ শাবক প্রসব হয়। বসন্তকালে গর্ভধারণ করিয়া ১৬ মাস কিম্বা ১৮ মাস পরে আবার বসন্তকালেই শাবক প্রসব করিতে হইলে হিসাবে একটু গোলযোগ হয়; হয়ত বসন্ত ঋতুটা উঁহাদের বিবরণে অত্যধিক ব্যাপক ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ঘোড়ার ন্যায় একবারে একটি মাত্রই শাবক প্রসব হয়। হস্তীশাবক ৬ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করে। অধিকাংশ হস্তীই দীর্ঘজীবী মানুষের সমান বয়স প্রাপ্ত হয়। কোন কোন হস্তী ২০০ বৎসরের অধিকও বাঁচে। অনেক হস্তী রোগে ভুগিয়া অকালে মৃত্যুলাভ করে।

সেই প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে হস্তী-চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। হস্তীর কোন প্রকার ক্ষত হইলে তাহার চিকিৎসা হয় ঈষদুষ্ণ জলের সেক দ্বারা; যেমন হোমারের বিবরণে আছে 'Patroklos Eurypylos এর ক্ষত চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেকের পরে ক্ষতের উপরে মাখন ঘষিয়া দেওয়া হয়; ক্ষত গভীর হইলে শূকরের মাংস তপ্ত করিয়া কিন্তু শোণিত সিক্ত অবস্থায়ই ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয়, অথবা কয়েক টুকরা শূকরের মাংস ক্ষতস্থানে লাগাইয়া রাখা হয়। চক্ষুর ব্যারাম হইলে প্রথমতঃ গো-দুগ্ধ দ্বারা সেক দেওয়া হয়। পরে চক্ষুতে গো দুগ্ধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। হস্তী যখন চক্ষু মেলিয়া দেখে যে চক্ষুদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায়, তখন ইহাতে খুব আনন্দিত হয়। এবং মানুষের ন্যায় উপকারটুকু বুঝিতে পারে। অন্যান্য রোগের জন্য উহাদিগকে এক প্রকার কাল মদ পান করিতে দেওয়া হয়, তাহাতেও যে রোগ না সারে সে রোগ চিকিৎসার অতীত। কোন কোন বিবরণে আছে যে ক্ষতরোগে হস্তীকে মাখন গিলাইয়া খাওয়ান হয়।

অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় হস্তী সকল সময়ে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বশে কাজ করে না। অনেক বিষয়ে ইহাদের বুদ্ধি বৃত্তির বেশ পরিচয় তো আছেই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের সৌন্দর্য্য রসজ্ঞতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বাদ্য এবং সঙ্গীতাদিতে রসজ্ঞতার কথা ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুঘ্রাণে ইহাদের কিরূপ অনুরাগ, তাহারও বিবরণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে মাহুত আগে যাইয়া হস্তীর জন্য ফুল কুড়াইয়া রাখে; ইহারা সুঘ্রাণের এতই অনুরাগী যে অনেক সময় সুঘ্রাণের আবেষ্টনের মধ্যে ইহাদিগকে নানা প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আবার হস্তীকে

ফুল কুড়াইবার ভার প্রাপ্ত হয়, তখন মাহুত ইহাকে প্রান্তরে বা কাননে লইয়া গেলে হস্তী নিজেই বাছিয়া বাছিয়া সুগন্ধযুক্ত ফুল চয়ন করিয়া মাহুতের হস্তধৃত সাজিতে ছুড়িয়া ফেলে। সাজি ভরিয়া গেলে হস্তীর স্নানের পালা—স্নানও উপভোগ করে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত। স্নানের পরেই সেই আহৃত ফুলগুলি তাহার চাইই; ফুল পাইতে একটু বিলম্ব হইলেই তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করে এবং ফুল না পাওয়া পর্য্যন্ত একগ্রাস খাদ্যও গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। তখন ফুলের সাজি সম্মুখে আনিয়া দিলে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া কতকগুলি খাদ্য পাত্রের এদিকে ওদিকে এবং কতকগুলি শয্যার উপরে ছড়াইয়া দেয়, যেন খাদ্য দ্রব্যও সুগন্ধযুক্ত হইয়া বিশেষভাবে উপভোগ্য হয় এবং সুঘ্রাণের আবেষ্টনে নিদ্রাও যেন অধিকতর সুখদায়ক হয়।

হস্তী সাধারণ অবস্থায় কেবলমাত্র জলপান করিয়া থাকে, কিন্তু যুদ্ধ-ব্যপদেশে শ্রান্তি-ক্লান্তির সময়ে ইহাদিগকে মদ্যও দেওয়া হয়; এই মদ্য ভাত হইতে প্রস্তুত হয়, যে জিনিষ দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত হয় তাহা হইতে ইহা পৃথক পদার্থ। *

হস্তী যে সঙ্গীত-রসজ্ঞ পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু হস্তী যে বাজনাতেও নিযুক্ত হইতে পারে সে কথা হয়ত অনেকেই জানেন না। বাস্তবিকও এরূপ সাক্ষীর উল্লেখ আছে যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে একটি হস্তী করতাল (Cymbol) বাজাইতেছে, আর কয়েকটী হস্তী সেই তালে তালে নাচিতেছে। পূর্ব্বোক্ত হস্তীটির সম্মুখের দুই পায়ে দুটি এবং শুড়ের সহিত একটি করতাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটী করতাল সে বেশ তালে তালেই বাজাইতেছে এবং ইহাকেই দেখিয়া দেখিয়া সেই তালে তালে পা ফেলিয়া অন্য সব হস্তীগণও বৃত্তাকারে নাচিতেছে।

সকল প্রকার ইতর প্রাণীর মধ্যে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। ইহাদের প্রভু ভক্তিতে এতটা উন্নত সীমার পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহাকে মনুষ্য জনসুলভ বলিয়া আখ্যাত করিলে কাহারও পক্ষে অগৌরবের হয় না। যুদ্ধে ইহার মাহুত বা পরিচালক হত বা পতিত হইলে যে হস্তী তাহাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে অথবা নীচে পড়িয়া গেলে অনেক সময় নিজ শরীরের নীচে পতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এ সব ত অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনও দেখা গিয়াছে যে যদি হস্তী কোন কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া মাহুত অথবা পরিচালকের প্রাণ বিনাশ করে, তবে পরে সেই হস্তীই এই দুষ্কৃত কর্ম্মের জন্য এতটা অনুতাপ এবং গ্লানি অনুভব করে যে এরূপস্থলে অনেক সময় উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

একস্থলে উল্লিখিত দেখা যায় যে হস্তী কৃষিকার্য্যে হল চালনায়ও নিযুক্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হস্তী প্রধানতঃ যুদ্ধের কার্য্যেই বেশী ব্যবহৃত হইত, তার পরেই ইহার ব্যবহার হইত আরোহণের জন্য। আরোহণের জন্য উষ্ট্র, ঘোড়া এবং গাধাও ব্যবহৃত হইত কিন্তু বাহন হিসাবে হস্তীরই মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তারপরে চারি ঘোড়ার রথ তার পরে উষ্ট্র; এক ঘোড়ার বাহনের (বোধ হয় একা গাড়ীর কথা বলা হইয়াছে) বিশেষ কোন মূল্য নাই। এই সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে অসাধারণ বিচার বুদ্ধি সম্পন্না ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা একটী হস্তীর চেয়ে অল্প মূল্যবান কোন প্রলোভনের জন্য ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয় না; কিন্তু একটি হস্তী উপহার পাইলে উপহার দাতার উপভোগের জন্য নিজকে সমর্পণ করে। ভারতীয়েরা কোন স্ত্রী লোকের পক্ষে ইহা অপমানের বিষয় বলিয়া মনে করে না বরং হস্তীর ন্যায় মূল্যবান উপহারের দ্বারায় যে রমণীর মূল্য নিরূপিত হয় তাহাদের বিবেচনায় ইহাতে স্ত্রী জাতির পক্ষে গৌরবের পরিচয়ই দেওয়া হয়। *

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

---

* বর্ত্তমান যুগে ইহাদিগকে দেওয়া হয় Rum.

* ভারতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি সাধারণ ভাবে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ খুবই একটা অসাধারণ কথা (ইহা Arrian [illegible]

"চলব বল কোন ধারে"।

চল্‌ব বল কোন্ ধারে?
চায়না পরাণ
বন্দনা-গান,
স্বর্গ-সুদার,-মন্দারে!!
চায়না'ক মন সেই সরলা,
সেই নমিতা, সেই তরলা
সান্দ্র-ঘনে চন্দ্র-কলা
সেই রজনীগন্ধারে!—
শান্তি যাহার আশায় ঢালা,
গন্ধ মৃদু ভাষায় ঢালা,
স্নিগ্ধ শীতল বীজন-বালা
সেই নিরজন নন্দারে!!
চল্‌ব বল কোন্‌ধারে?
কীর্ত্তি-নামের তীক্ষ্ণ আলো
আমায় যে হে মন ভুলাল!
কিন্তু পরাণ কই জুড়াল,
ভাগ্যে হ'ল মন্দা রে!
বল্‌বে বটে আমার আশা
নিতান্ত হীন,—কর্ম্ম-নাশা,
তাই তোমারে এ-জিজ্ঞাসা
বারণ করি কোন্‌টারে!—
প্রাণটারে, না মনটারে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রেমাবতার।

কৃষ্ণ-চন্দ্রের সুধাপ্রবাহে তিনটি ঢেউ—তিন বাঞ্ছা উহা "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিঃ"-ঘটিত।

স্বয়ং শ্যামেন্দু প্রেমসিন্ধু দিয়া অঙ্গপ্রক্ষেপ করিয়া বর্ণচোরা ভক্ত সাজিলেন। জগজ্জীবের ভক্ত হইবার নির্ম্মলোজ্জ্বল আদর্শ এই প্রথম। শ্রীভগবান যেরূপ ভক্ত হইতে পারেন, জীব তদ্রূপ হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভগবান ভগবান, এবার ভক্ত। সুতরাং জীব ও ভগবানের মধ্যে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাইল। তাই এমন করুণাবিস্তার আর কভু হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ লীলার নিগূঢ় উদ্দেশ্যই শ্রীযুগল পরে গৌর হইয়া জীব ধন্য করিবেন। নিভৃত নিকুঞ্জে রস লাড়ুকা পাকান হইয়াছিল, কলির জীবদিগকে খাওয়াইবার জন্য। দ্বাপরে পাক প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পরিবেশন ও বিতরণ অবশিষ্ট ছিল—তাহা গৌরাবতারে পূর্ণ হইল। অতএব ব্রজলীলা ও নদীয়ালীলা এখন অখণ্ড পূর্ণ লীলারই দুই অধ্যায়। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ নিভৃত-নিকুঞ্জমঞ্চ হইতে অবতরণ করেন নাই, কিন্তু নদীয়ালীলায় তিনি নামিয়া জীবের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা বৃক্ষারণ্যে, গৌরলীলা লোকারণ্যে। কৃষ্ণলীলায় হাসি আর বাঁশী গৌরলীলায় ধরায় লোটাইয়া কত কাঁদাকাটি। প্রেম বিলাইতে আর কেবা এত নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন? অতএব তিনি গৌররূপে যথার্থ প্রেমাবতার! "প্রেমাবতার" শ্রীগৌরাঙ্গের একচেটিয়া উপাধি।

শ্রীগৌরাঙ্গ নামদানে অসুর বা পাষণ্ডী উদ্ধার করিয়াছেন। ভক্তি লেশহীন জীব অসুর বলিয়া অভিহিত। জীবোদ্ধার প্রেমাবতারের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। ভক্তি সঞ্চার করিয়া দিবার নাম উদ্ধার। কিন্তু অন্তরঙ্গ হেতু সূচক শ্রীনন্দনন্দনের উক্তি যথা:—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥

বিবরণে আছে। Strabo'র (উদ্ধৃত মেগাস্থেনীসের) বিবরণে আছে—The wives prostitute themselves unless they are compelled to be aste, ৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লৈয়া করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥"

প্রেমাবতারের লীলাকর্ম্ম ও অভিপ্রায় এবং মানবজীবনের অন্তাভোগ্য, সাফল্য ও চরম লক্ষ্য এই পয়ারে ছন্দের সূত্র কাব্যটিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই পয়ারে চন্দ্রের কিরণে প্রেমধর্ম্ম কলিত ও আলোকিত হইয়াছে। মস্তকের উপর মুকুট শোভা পায়, ধর্ম্মধর্ম্মের উপর, ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশের উপর ইহাও লীলা মুকুট স্বরূপ। এই অভিপ্রায়ে প্রেমধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যে মহাপুরুষ সম্যক্ ঋণী, তিনিই প্রেমাবতার। উক্ত অবতার ছত্রে ছত্রে প্রভুর ঋণদায় পরিস্ফুট হইয়াছে। অধমর্ণ ভাবটি প্রেমাবতার লক্ষণ। প্রেমাবতারের চরিত্র একটু অন্য, ভক্ত যেন কোন দায় রাখেনা, ভগবানই দায়ী বা দেনাদার। ভক্তের এবাধ্য ও বাহাদুরী কত? "ভক্তেরে প্রসাদ" ভক্তের আনন্দবিধান মূলক সেবাসাধন যাহার লীলার মুখ্যাঙ্গ, তিনি প্রেমাবতার। "হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ"—ভক্তেরে পোষণ বা প্রসাদ করা প্রেমাবতারের কার্য্য। জীব চাহেন উদ্ধার, ভক্ত চাহেন আনন্দ। প্রেমাবতারই আনন্দদাতা। "আনন্দাংশে হ্লাদিনী" আনন্দ যাহার অংশ বা অঙ্গ। হ্লাদিনীর প্রকট কেলিস্বরূপ। প্রেমাবতার—মাধুর্য্য মাধুরীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।

শ্রীনন্দনন্দন যিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বাবতার অঙ্গী করিয়া, যেন বহুশাখ কল্পবৃক্ষ—কলিযুগে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। এক সোণার মানুষ—চাঁদ মাজা সোণার মানুষ—আমাদের মধ্যে নামিলেন চাঁদ বামনের মুঠে ধরা দিলেন। ইহার পর ও উপর অপর বাঞ্ছিত কি আছে? হাতের ফে লখা কে পাতের তালাস করে? মধুর মানুষটি হাসিতে মধু ছড়াইতেছেন। এ ধনের উপেক্ষা করিয়া আর কোন্ ধনের প্রতীক্ষা করিব? পদে পদে অমানিমানদত্ব যাঁহার গুণ, সেই গুণনিধি গৌর-নিত্যানন্দ না ভাবিয়া জীবন অধন্য করিতে অপগুণ বলা আর কে আছে? "গৌরনিত্যানন্দ" এই কথার স্মরণেই প্রাণে অমৃতের লহরী উঠে। অধিক কি, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ যাহার আমার হইয়াছেন, তিনি সিদ্ধ, ধন্য—তিনি পূর্ণমনোরথ!

পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেম লোভা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥
ছলছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥

গোবিন্দ দাস।

বিরাগে অনুরাগ না আনিয়া দিতে পারে, অনুরাগই বৈরাগ্যের মূল। ঈশ্বরে অনুরাগ অনীশ্বরে (সংসারে) বিরাগ জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং অনুরাগী জনই বৈরাগী। অনুরাগীর নয়ন অরুণবর্ণ এবং সতত ছলছল। অনুরাগী জন কালবর্ণ হইলেও রাধাপ্রেমের তপ্তকাঞ্চনচ্ছটায় স্বর্ণোজ্জ্বল দেখায়—ইহা এক গুপ্ত বিজ্ঞানের বেষণা বটে। অনুরাগীর বিলাসগন্ধ লেশ থাকে না—অনুরাগী ভুক্তি মুক্তিরূপ ভোগরোগবন্ধন রোগের রোগী নয়—অনুরাগী ধূলায় লোটাইতে ভীত হয় না, ভালবাসে ধূলি বিনয়ের পবিত্র ভূষণ,—বিনয় ভক্তি দেবীর পাঠপীঠ। মহাপরাক্রান্ত সিংহ কেবল অবনত হইয়া মহাদেবীর পাদপদ্ম পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন।—

তিনি এইরূপ বিক্রান্ত মহীয়ান্ হইয়াও ভক্তের পাদমূলে ধূলি সদৃশ।

কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবাৎক্রমাবহ্যবৈভব নিয়া আসিয়া এক নব অভিনব ভজনপদ্ধতি প্রচার করিলেন, যেমন সহজ সুগমহাট পূর্ব পূর্বযুগে যোগিঋষিগণও ধারণার সন্ধান পাইয়াছিলেন না। এ নব বারণে ফুল ও ভক্তিবৈভব লাভের পঞ্চকৌশল কোয়ারা খুলিয়া গেল ১। মহতের সেবা ২। পদরজঃ গ্রহণ ৩। পাদোদক পান ৪। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ৫। নাম সংকীর্তন। পঞ্চকোয়ারার নিঝরে পাষাণের সর্বস্বগুলি গলিয়া পড়িল। এই পঞ্চসরকুসুমসংস্পর্শে জীব কৃষ্ণ কৃপাভারা-নিত হইয়া সর্বেন্দ্রিয় চিত্তে ও মধুময় বোধ করিতে লাগিল। ঐ পঞ্চকুসুমের পরাগগন্ধে আবগ্রাণ আকুল হইয়া পড়িল। বহু যোগ সাধনায়ও এই দিব্য পীযুষানুভাবের সঞ্চার হয় না। কাঙাল ভক্তের ধূলায় অঙ্গ লোটাইলে কি যে এক অমৃত অন্তর বাহির অনুভাবমান হয়, তাহার আস্বাদন সুখ বুঝাইবার নয়। ইহা শিখাইতেই কৃষ্ণ স্বয়ং বৈরাগী সাজিয়া ধুলায় লোটাইয়া কত না কাঁদিলেন। যাহা শিখাইতে কৃষ্ণের প্রয়োজন, তাহা শিখাইবার তুমি আমি কে? ধূলিকায়া নিষ্কিঞ্চন ধর্মশিক্ষার অমৃত পন্থা।

দেবতামাত্রই দাতা।—সম্পদ ও বৈভবের ভাণ্ডারী। দেবতা-শিরোমণি বিষ্ণু—দাতার শিরোমণি; কারণ, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই তাঁহার ঘরণী। বিদ্যা ও সৌভাগ্যসম্পদের গোলাভাণ্ডার বিষ্ণুমন্দিরে। বিষ্ণুর চতুর্হস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বিরাজ করে। শঙ্খ—নাদশক্তি (বেদ—ভাষা) চক্র—রাজনীতি, গদা—শাসনশক্তি এবং পদ্ম—রাজলক্ষ্মী। ইনি ঈশ্বর, পালক। কৃষ্ণ—মানুষ, বংশীধারী—দাতা নহেন, মাতানিয়া (প্রেমদাতা)। প্রেমদান শঙ্খচক্রগদাপদ্মের অতীত। এ দানের দাতার নিষ্কামোপাসক।

"আমার কাছে তোমরা আর কিছু চাহিও না"—এই আজ্ঞা ঘোষণা গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ-বৈরাগী (অনুরাগী) গৌরাঙ্গ সাজিলেন—(ভালবাসার রঙ ধরিল—রাধাকে ভালবাসিয়া কৃষ্ণ রাধাই হইয়া গেলেন)। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসী হাত চিৎ করিয়া দেখাইতেছেন আর নাচিতেছেন—বুঝাইতেছেন "আমার কিছু নাই, তাই এত আনন্দ।" হাত চিৎ করিয়া জানাইতেছেন, "আমার কিছু নাই' আমি কাঙ্গাল ভিক্ষুক, ঋণী" এবং কিছু-নাই-এ-আনন্দে নাচিতেছেন এবং সর্ব্বজীবকে ভিক্ষুক বা ত্যাগী হইতে উপদেশ করিতেছেন—নাচিয়া গাহিয়া যাইতে হইলে ত্যাগী হইতে হয় ঘোষণা করিতেছেন। নাচিয়া গাহিয়া কাটানই জীবের জীবন লক্ষ্য। ঈশ্বর যুগানুক্রমে নিজৈশ্বর্য্য আচ্ছাদন করিতে করিতে অবশেষে একবারে বৈরাগী—কাঙ্গাল মানুষ। এই কাঙ্গালত্ব ধর্মামৃতের আওটা। ক্ষত্রিয় হইয়া গুহকাদিকে কোল দেওয়া বেশী নয়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া আচণ্ডালে কোল দেওয়া দৈন্যকাঙ্গালত্বের পরাকাষ্ঠা। যাহাদের উপাস্য দেবতা বৈরাগী, তাহারা যথার্থ ধর্ম্মপথ ধরিয়াছেন। কারণ, তাহাদের অন্য কামনা নাই। স্বর্ণ অনল দাহে যেমন নির্ম্মল হয়, ধর্ম্মও যুগযুগাগ্নি দগ্ধ হইয়া এই ধন্য কলিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিবর্জ্জিত নির্ম্মলকান্তি লাভ করিয়াছে।—ইহার নাম শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ইহার প্রাণ দেবতা—স্বর্গদেবতা—মনুষ্য দেবতা সাক্ষাৎ মানুষ।

রাধাপ্রেমসাগরের সোণার রসসলিলে ডুব দিয়া শ্যাম নদীয়ার কূলে উঠিলেন।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া সে গৌর হয়েছে।
তারে ধর্‌বে বলে ঝাঁপ দিল সে, পেলনা ন'দে উঠেছে॥

(শ্রীকৃষ্ণকান্ত পাঠক)

শ্যাম রাধাভাবের গড়ন পাইয়া আত্মহারা এবং কেবল "কানু কানু" করিয়া পাগল। জগজ্জীবের কপালে সৌভাগ্য চন্দ্র সমুদিত হইয়া যুগলরসের এই কেলি দর্শন করিতে লাগিল। প্রেম ঋণের কৌতুক প্রসঙ্গে জগতের সৌভাগ্য অঙ্কিত হইল। রাধাকানু একতনু হইয়া কলির জীবের দলে মিশিলেন। কৃষ্ণ রাধার মহিমা জগতে জানাইয়া আনৃণ্য লাভে কৃতসংকল্প হইলেন। কারণ, তিনি কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাই জীবোদ্ধারের সূত্র হইল। শ্রীভগবান্ গৌর, গৌরবর্ণ ও ভক্ত হইলেন। গৌরব ভক্তি চিহ্ন। তিনি

ভগবান্, ভক্ত নহেন, এজন্য তিনি ভক্তরূপ। ভক্তরূপে তিনি এক হস্তে নাম-দণ্ড ধরিলেন, ভবভয় যম তাড়াইতে ও পাষণ্ডী দমন করিতে। অপর হস্তে কমণ্ডলু—করুণা পাত্র প্রেমসুধাভরা। দণ্ড ও কমণ্ডলুর ভাণ্ডারী সঙ্গে পরম দয়াল নিতাই চাঁদ। তিনি নাম-দণ্ডে পাপ তাড়াইয়া, কমণ্ডলু হইতে প্রেমবারি জীবাঙ্গে সিঞ্চন করেন ইহা নাম ও প্রেম-প্রচার পদ্ধতি।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥ ভক্তি-রত্নাকর।

জগৎ তারিতে গৌরচন্দ্র ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ভূমিষ্ঠ হইলেন। হিন্দুধর্ম্মেন্দু কামরাহুগ্রস্ত ছিল। রাহুর সেই ঘোর আঁধার মূর্ত্তিকেও আলোকিত করিয়া শ্রীগৌর পূর্ণেন্দু আবির্ভূত হইলেন। চাঁদকে আঁধারে গ্রাস করিয়াছিল আবার এমন চাঁদের উদয় হইল যে সে একবারে সেই আঁধারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। চাঁদের গুণ রাহু গ্রাস ও ক্ষয়যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও সুধা উগারে। গৌরবিধুর কিবা অলৌকিক গুণ প্রভাব তিনি পাপের বহ্নি ও ধূম রাশি রাশি গ্রাস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাশি রাশি প্রেমসুধা উগারিয়া ছড়াইতে লাগিলেন। স্বয়ং কলিও নিষ্পাপ হইল।

কোটি কোটি কিয়ে শরদ সুধাকর
গোবিন্দ দাস।
নিরমঞ্ছন মুখচাঁদে॥

কোটি চাঁদে গড়া চাঁদ—বিভ্রাভ্রমে মাজা চাঁদ—স্বয়ং পূর্ণানন্দ চন্দ্রমা ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শচী জগন্নাথের আনন্দ চিত্তে আটে না; তাই বাহিরে প্রকাশ—গৌরচন্দ্রের চন্দ্রিকোল্লাস গিরিদরী ছাইল, নদী উদ্ধর শীকরে শীকরে খেলিল, গগন প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিল, অমরী গঙ্গা পয়োনয়া হইল, বিহঙ্গম কণ্ঠে গীতিকাকলী সুধায় লহর ছুটিল—সিন্ধু ছুবা ইন্দু কেবা মথিয়া তুলিল!

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ওরূপে মুগ্ধ কৈল নদীয়া নগর॥ (বলরাম দাস)

সন্ধ্যার আকাশে রাহু চাঁদকে গ্রাস করিল; এদিকে ধরাতলে কলি রাহু গ্রাস করিয়া অপরূপ চাঁদ আবির্ভূত হইল।

রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশদিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার। (নরোত্তম দাস)

অখিল ভুবনের ভাগ্যশশী হাসিল, সুধা কৌমুদী সিঞ্চনে ভবরোগের ঔষধে সোমলতা স্নিগ্ধ হইয়া নামফল প্রসব করিল।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
না জানি ঠেকিলা কার প্রেম ফান্দে॥
(বলরাম দাস)

"ভুবন ভরিয়া প্রেমদান" করিতে গৌরাঙ্গাবতার।
"প্রেমে ছল ছল আঁখি"—ইহা প্রেমের বিশিষ্ট লক্ষণ।
নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর॥
(বলরাম দাস)

প্রেম সকরুণ ভাব! প্রেমে কাঁদায় হাসায়, অশ্রুগঙ্গা বহায়। গোরা শিশুকালেই কাঁদিবার ছল পাতিয়া নারীগণ মহলে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। মেয়ে ভাবটি হরি নামে অধিকার দেয় বুঝাইতেই গোরা মেয়ে মহলে শ্রীনাম প্রচারের অধিবাস করিলেন।

বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ববন্ধুগণ॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

এইভাবে নারীগণ হরিনাম আগমনীর আলিপনা আঁকিলেন। হেমাঙ্গ সুন্দর, আনন্দলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি নামে এতই আনন্দ যে ইঁহার সেই আনন্দ দর্শনে নারীগণ ইঁহাকে হরি ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারেন নাই বালকের বর্ণও যেন কাচা হরিদ্রা—গৌর; সুতরাং নারীগণ স্বভাবতঃই তাঁহাকে "গৌরহরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিজ লীলার এক মূল সত্য এস্থলে ইঙ্গিতে জানাইলেন।

গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি। শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীগৌর বালার্কের রুচির কচি রূপ!—তাঁহার কচি হাস্যের কোমলতায় নারীগণের চিত্ত কমলস্থ স্নেহমধু উনাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ
শ্রীকালী হরদাস বসু ভক্তিসাগর।

একটি সন্ধ্যা।

পল্লীতে নতুন রেল-পথের কাজ চলছে। কোলকাতা থেকে বাড়ী ফিরে এসেছি। কোকিল, 'বৌ-কথা-কও', 'চোখ গেল' দিনরাত কেবলি ডাকাডাকি করছে।

বিকেল বেলা দুটি বন্ধু গ্রাম্য রেল-পথ ধরে চলেছি। চলেছি তো চলেইছি—কদ্দুর যাব কেউ জানি না!

তখন দূরে, মস্ত একটা ধেনো মাঠের পশ্চিম পারে, বাঁশ-বাগানের ভিতরে, আকাশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ক্লান্ত তপন ধীরে ধীরে গা-ঢাকা দিচ্ছিলেন। মন যেন কেমন একটা উদাস গাম্ভীর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়্‌লো।

বন্ধু আগে আগে গল্প করতে করতে চলেছেন—আমি পিছনে। তাঁর বড় পিছনে তাকাবার অবকাশ বা অভ্যেস নাই। আমি থেকে থেকে কথা গুলি ভাল করে না শুনেই হুঁ-হুঁ করে সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথের মাঝে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে দুচার পলক আকাশ পানে চেয়ে রইলাম।

রেল-পথের ধারেই কদ্দুরে একটা সাঁৎসেতে ছোট্ট খোড়ো ঘরের ভিতর থেকে একটি শিশুর করুণ কান্না কানে ভেসে এল! চেয়ে দেখি, রোগা-পটকা খুব হালকা একটি কাচ ছেলেকে তার মা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক শুক্‌না স্তন থেকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। তার ছিন্ন বসন বড়ই মলিন! কাপড় পরার কায়দা দেখে বুঝলাম, পশ্চিমাঞ্চলের দীনাহীনা প্রবাসিনী রমণী।

শিশুটি তখনো ট্যাঁ-ট্যাঁ করে থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল! শিশুটির কান্না শুনে আমার চোখে জল এল!

শীর্ণকায় রমণীর রোগা শিশু দেখে বিংশ শতাব্দীর হা-হাবাতে সংসারকে চিনলাম। এখনকার এই অভাবগ্রস্ত সংসার ঠিক ওই শিশুটির মত নিশিদিন কাঁদছে। বিলাসে, ব্যসনে, নিজ-হাতে-গড়া অভাবের ফাঁদে পড়ে কেব'ল কাঁদছে! ভয়ে, দুঃখে, বিষাদে প্রাণের একতারাটি কেমন যেমন একটা করুণ সুরে বাজতে লাগলো।

আমি চোখ মুছে এগিয়ে যাওয়া বন্ধুটির সাথে সাথে চলবার জন্যে তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি কোথায় আছি জানতেই পারেন নি।

সেদিন বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এসে, আজ পর্য্যন্ত সেদিনের সেই বিষাদ-মাখা একটি সন্ধ্যার কথা, আমি যখনি সময় পাই মনে মনে ভাবি আর ভাবি!

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

নিমিষ হারা।

হারিয়ে গেনু কোন্ খানে
—তা কে—জানে
যখন্ ছিনু ধেয়ানে।

সে সুখ মম কইতে নারি
বাণীতে!
জীহ্বা মম দেয় না সাড়া
বর্ণে তাহা আনিতে!
আনন্দ সে সদাই ঘন
নাইক তাহে দ্বন্দ্ব কোনো
সে যেন রে বিজন মনো
অখণ্ড সংগোপনে!
যখন ছিনু ধেয়ানে

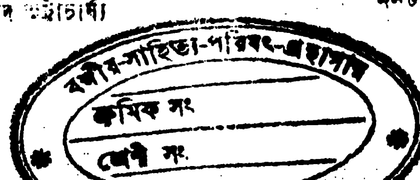
দুলল ফিরে হিন্দোলা
—এ দিন্ দোলা,
গন্ধ প্রভাতীন্ খোলা!

আবার কাজে জগত সাজে
বাঁশরী,
জাগায় মনে অনুক্ষণে
ছিলাম্ যাহা পাশরি!
হৃদয় মম নিদেশ ক'রে
প্রিয়া আমার বিদেশ পরে,
ছলো রাগে, মূর্ত্ত করে
কণ্ঠ মম বীণ্ ভোলা!
দুলল ফিরে হিন্দোলা!

তাই কি করে মন ছলি'
—সে সঙ্কলি'—
নিত্য আহরণ বলি!

বুঝিনু কেন পরাণ কাঁদে
রাগিয়া,
মনটি তারে, ভোগ্ বিহারে
ব্যগ্র পূজা লাগিয়া!
কুঞ্জ রবে পুষ্প বনে,
দিগন্ত লীন বংশী স্বনে
স্বপন গীতি প্রেম নয়নে
প্রাণে রস দিতে অঞ্জলী!
মনটী সদা সঙ্কলি!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।



প্রতিভা

১৫শ বর্ষ   মাঘ, ফাল্গুণ ও চৈত্র ১৩৩২   ৪র্থ সংখ্যা

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। *

মুখবন্ধ।

শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয় আমাকে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের পরিচয় এবং জীবনী যতদূর সংগ্রহ সম্ভাবনা হয় তাহা সংগ্রহ জন্য আজ্ঞা করেন। আমার শক্তি ক্ষুদ্র অথচ বিষয়টী গুরুতর হইলেও একজন প্রবীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয়ের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিরক্ষা ও গুণানুকীর্ত্তন পুণ্যকার্য্য বিবেচনায় আমি ঐ কার্য্যে ব্রতী হই। এ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরবাসী তিনশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিচয় অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছি এবং স্বীয় শক্তি অনুসারে আরো লিখিতেছি। প্রবন্ধটী, এ সভায় সম্পূর্ণ পাঠকরা অসম্ভব। সভার সময় সীমাবদ্ধ সভা আমাকে এত সময় দিতে পারেন না। সভার ইতি- শাখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান্ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, মহাশয় আমাকে আমার লিখিত প্রবন্ধের আদর্শস্বরূপ কয়েক জীবনী পাঠজন্য উপদেশ দেন; তদনুসারে আমি অদ্য নিম্নো- পুরাতন ও নব্য সময়ের কয়েকটী প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ করিলাম অধিকন্তু উঁহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কি ভাবে চলিত তাহারও অতি সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া গেল।

হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই ভাষা দেবভাষা বলিয়া আখ্যাত। এই দেবভাষা কোন্ সময়ে কি ভাবে হইয়াছে, ইতিহাস তাহা অবধারণে অক্ষম। তবে পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর আদি গ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত এবং পৃথিবীর আদি সভ্য সমাজ এই ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ঋক, সাম, যজুর্ব্বেদ শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিক্রমপুরে ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।

প্রভৃতি সহস্রাধিক উপনিষদ; সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন; মাহেশ, পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহাকাব্য; ভাগবত, বিষ্ণু, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ; মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, উষণা, অঙ্গিরা প্রভৃতি সংহিতা; রঘু কুমার, ভট্টি, নৈষধ, মাঘ প্রভৃতি কাব্য; মৃচ্ছকটীক, শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, বীরচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক; চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ; পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ, কাদম্বরী প্রভৃতি কথা গ্রন্থ; গর্গসংহিতা, সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র; শঙ্কর ভাষ্য, শ্রী ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য; যাস্ক প্রভৃতি নিরুক্ত শাস্ত্র; গান্ধর্ব্ব বেদ, প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র; মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণব, যোগিনী, ব্রহ্ম যামল, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্র; এইরূপ অগণ্য বিবিধ রত্ন-হারাবলী যাহাদের কর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন কি না তাহাই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

মহা রাজাধিরাজ আদিশূর এবং তৎপরবর্ত্তী শূরবংশীয়, বল্লাল সেন প্রভৃতি সেন বংশীয় এবং হরিবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা প্রভৃতি নরপতিগণের রাজত্বকাল সময়ে বিক্রমপুরবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাত্র শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহারা কেবল গ্রন্থরচনা ও আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন না। তাঁহারা মন্ত্রণ গৃহে মন্ত্রী, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালক, বিচারালয়ে বিচারপতি, সামাজিকতায় সমাজ সংস্কারক ও রক্ষক, রাজনীতি ক্ষেত্রে কুটমন্ত্রণাকারী এবং মন্দিরে ধর্ম্মবক্তা, নীতিশাস্ত্রে নীতিজ্ঞ ছিলেন।

সুদূর সময়ের বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়া দিলেও পরবর্ত্তী জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, হলায়ুধ প্রভৃতি মহামনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে এ পর্য্যন্ত অহসহনীয় দারিদ্র্য দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া জীর্ণকুটীরে মনুষ্যত্ব রক্ষা এবং পূর্ব্বপুরুষ-গণ হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ কিরূপে রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন অপরাপর প্রবন্ধে তাহাও আলোচিত হইল।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন এবং রাজকীয় বিভাগানুসারে বিক্রমপুরের ভৌগলিক অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান বরিশাল জিলার কতক স্থান, ঢাকা জিলার বর্ত্তমান বিক্রমপুর, ফরিদপুর জিলার প্রায় সম্পূর্ণ স্থান এবং পাক-জোয়ার পরগণার কতক স্থান নিয়া প্রাচীন বিক্রমপুরের অবস্থান ছিল। কোটালীপাড়া; বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের অংশ ছিল। পরে পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা প্রভৃতি নদ নদীর গর্ভে বিক্রমপুরের শতং গ্রাম বিলীন হইয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের কলেবর অনেক ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং অনেক বিক্রমপুরবাসী নানা জিলায় ও নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন সুতরাং বিক্রমপুর বলিতে পূর্ব্বে যাহা বুঝা যাইত এখন বিক্রমপুর বলিতে তাহা বুঝায় না।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন, নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি; কলাপ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ; সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র; অভিধান, শব্দশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ভাগবতাদি পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, কুলশাস্ত্র তন্ত্র, বৈদিক তান্ত্রিক, পৌরাণিক ক্রিয়া-কাণ্ড, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানাবিধ সংগ্রহ গ্রন্থ, অতি প্রাচীন সময় হইতে বিক্রমপুরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে।

বিক্রমপুর, পূর্ব্ব বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রভূমি। শ্রীহট্ট, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল এবং ঢাকার ছাত্রগণ দলে২ সংস্কৃত শিক্ষার্থ বিক্রমপুরে উপস্থিত হইতেন। বিক্রমপুরে জিলান্তর হইতে নব্য ন্যায় ও নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন জন্যই অধিক ছাত্রের আগমন হইত। নব্য ন্যায় পাঠার্থীগণের মধ্যে শ্রীহট্ট বাসী ছাত্রগণের আদর অধিক ছিল। শ্রীহট্টবাসী ছাত্রগণ মধ্যে অধিকাংশই মেধাবী ও সুবুদ্ধী ছিলেন। এক একটী বিদেশী ছাত্র জন্য অধ্যাপকেরা যে কত যত্ন কত আগ্রহ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উৎকল ও বিহারী ছাত্রগণ কখন নবদ্বীপে কখন

বিক্রমপুরে নব্য ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আগমন করিতেন। বিক্রমপুরের অধ্যাপকগণ, তাঁহাদিগকে চাউল, ডাইল, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য যোগাইতেন। উঁহারা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন। সর্ব্বপ্রকার ছাত্রের আহার ও থাকিবার স্থান অধ্যাপকগণ সানন্দ মনে চালাইতেন। অনেক সময় নিজে মাথায় বহন করিয়া এবং ধার আনিয়া ছাত্রের আহারের যোগার অধ্যাপক করিতেন। ছাত্রের নিকট কোনরূপ অর্থসাহায্য অধ্যাপক মনেও করিতেন না। অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এবং পুণ্যকার্য্য বলিয়াই অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্য্য হৃষ্ট চিত্তে করিতেন। আমরা যে দৈনিক পঞ্চসুনা অর্থাৎ পঞ্চপাতক করিতেছি সেই পাতক নিবারণার্থ দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ করা আবশ্যক। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। ঐ যজ্ঞের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ সুতরাং লোভবশতঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত না। কর্ত্তব্য ও পুণ্য জন্যই তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে সম্পন্ন হইত। ছাত্রগণের রাত্রি পাঠ জন্য তেল পড়ুয়া বিদায় দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। অনেক সময় ছাত্রগণ শুষ্ক পত্র আহরণ করিয়া রাখিত। অন্ধকারে পাঠের আলোচনা হইত; কোন স্থান স্মরণ না হইলে শুষ্ক পত্র জ্বালিয়া নিয়া যে আলোক উৎপাদিত হইত ঐ আলোক সাহায্যে পুস্তক দেখিয়া লওয়া হইত সুতরাং তেলের আবশ্যকতা অনেক সময়ে ঐরূপে বিদূরিত হইত। ফলে পাঠার্থী জন্য তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের কপর্দ্দকও ব্যয় হইত না।

ছাত্রগণের আহার এবং অধ্যাপক ও অধ্যাপক মহাশয়ের একান্ন ভুক্ত পরিবারের আহারের ব্যবস্থা একই ছিল। চাউল, লবণ, সাধারণ ডাইল হইলেই যথেষ্ট হইত। তবে চাউলের পরিমাণটা কিছু বেশী ছিল। নিমন্ত্রণে সিধা পাইলে দধি ক্ষীরেরও ব্যবস্থা হইত। কিন্তু এই আহারে স্বাস্থ্যের হানি না হইয়া স্বাস্থ্যের উন্নতিই দেখা গিয়াছে। বায়ু ও আলোকের স্বাচ্ছন্দ্য, অন্নাহারের প্রাচুর্য্য, নিয়ত প্রাতরুত্থান, সন্ধ্যাবন্দনাদি ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি, অধ্যাপক গুরুকে দেবতা জ্ঞান, প্রভৃতি সদাচরণ হেতু উন্নত স্বাস্থ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংযমশিক্ষা হইত এবং চিরকাল তাহা অব্যাহত থাকিত।

দৈনিক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এই নিয়ম ছিল যে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিতেন, শৌচাদির পরে কেহ কেহ প্রাতঃস্নান করিতেন কেহ কেহ বা রাত্রবাস বস্ত্রাদি পরিত্যাগে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া পাঠ গৃহে সমবেত হইতেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্য চলিত। পরে স্নানাহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ছাত্রগণ স্বীয় স্বীয় পাঠাভ্যাসে মনোযোগ করিতেন। অধ্যাপক নিজ সাংসারিক কার্য্য করিতেন। সায়ং সন্ধ্যাবন্দনের পর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়া পঠিত পাঠের পর্য্যালোচনা করিতেন। রাত্রির আহারের পর ছাত্রগণ নিজ নিজ পাঠে মনোযোগ দিতেন। অধ্যাপক পরদিন যাহা অধ্যাপনা করাইতে হইবে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিতেন। পরে বহু রাত্রে নিজে আহার করিতেন। পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে নিজে না পড়িয়া কখনও পরের দিন পড়াইতেন না। কোন কারণে পূর্ব্বরাত্রিতে নিজে না পড়িতে পারিলে ছাত্রগণকে বলিতেন আমি পড়িতে পারি নাই, তোমরা পুরাতন পাঠ অভ্যাস কর। উপদিষ্ট বিষয় নিজে ভাল করিয়া না বুঝিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কখনও ছাত্রকে উপদেশ দিতেন না। ছাত্রগণ, বিশেষ ন্যায়ের পড়ুয়াগণ, এমন তর্কবিতর্ক করিয়া অধ্যাপক হইতে উপদিষ্ট বিষয় বুঝিয়া নিতেন যে একটি বিষয় নিয়া হয়ত দুই তিন দিন চলিয়া যাইত। তথাপি না বুঝিয়া "হাঁ বুঝিয়াছি" বলিতেন না। অনেক সময় অধ্যাপককে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত।

তৎ সময়ে মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। সকল ছাত্রই হাতে পুস্তক লিখিয়া লইতেন। মূল পুস্তকের উপরে ও নীচে যথেষ্ট স্থান রাখা হইত। ঐ স্থানে অধ্যাপকের উপদিষ্ট বা কোন কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ পাদটীকা স্বরূপে লেখা হইত।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই জানিতেন দানের মধ্যে অভয় দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরই বিদ্যাদানের শ্রেষ্ঠত্ব। অন্নদান

তৃতীয়। জন্মদাতা পিতা হইতে বিদ্যাদাতা পিতার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বাড়ীতে নিজ পরিবার ভিন্ন অধ্যাপকের ২০।২৫টি ছাত্র থাকিত। অধ্যাপক পত্নী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, কন্যা কি ভগ্নী অম্লান বদনে দুই সন্ধ্যা ইহাদিগকে পাক করিয়া খাওয়াইতেন। ইহাতে ঠাকুরাণীদের সুবর্ণ বর্ণ কখনও মলিন হইত না। পাচক ব্রাহ্মণের ও ভৃত্যের সংস্থান ছিল না। পাচক ব্রাহ্মণের পক্কান্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও ছাত্রগণ গ্রহণ করিতেন না। এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বেতনভোগী পাচকের পক্কান্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। আবশ্যক মতে ছাত্রগণই অধ্যাপকের বাড়ীতে পাচক কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে গুরু শিষ্যের কিরূপ ঐকান্তিকতা ছিল তৎসম্বন্ধে এক দিবসের একটি ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নে বলিতেছি :—

বিক্রমপুরবাসী দুইটি ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ প্রায় শেষ করিয়াছেন। দুইখানা কঠিন পুস্তক অধীত হয় নাই। ত্রিপুরা জেলার ব্যাকরণের একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিকট ছাত্র দুইটি যাওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। ছাত্র দুইটি তথায় যাইয়া দেখিলেন অধ্যাপকের নিকট বহু পাঠার্থী অধ্যয়ন করিতেছেন, ছাত্র দুইটি অধ্যাপকের নিকট নিজ নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে অধ্যাপক বলিলেন স্থান মাত্র নাই কি করি? একটি হইলেও কথঞ্চিৎ স্থান হইত, দুইটির স্থান নাইই। ছাত্র দুইটি বলিল মহাশয় আমরা এক শয্যায় থাকিব ও দিবসে একাহার করিব সুতরাং আপনার একজন রাখারই ফল হইবে। এই কথা শুনিয়া অধ্যাপক স্মিতমুখে বলিলেন এমন ঐকান্তিকতার বাধা জন্মাইব না। যেরূপেই হয় তোমাদের দুইজনকে স্থান দিব।

এখানে আর একটি কথা বলা বড় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে প্রাচীন স্মৃতি ও ন্যায় এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিক্রমপুর অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতির গুরু স্থান নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ। এইজন্য বিক্রমপুরের নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতির পাঠার্থীগণ দেশে পাঠ প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াও একবার নবদ্বীপে শিক্ষার্থ যাইতেন। পূর্ব্ববঙ্গের অন্য স্থানের ছাত্রগণ প্রায়শঃ বিক্রমপুর হইতেই উপাধি নিয়া দেশে যাইতেন। ঢাকায় সারস্বত সমাজ সংস্থাপিত হওয়া অবধি পঞ্চাশবর্ষাধিক কালমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রগণ আর নবদ্বীপ পাঠার্থ প্রায় গমন করেন না।

নব্যস্মৃতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনন্দন পশ্চিম বঙ্গবাসী। নব্য ন্যায়ের স্রষ্টা মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টে জন্মধারণ ও প্রাথমিক শিক্ষা শ্রীহট্টে গ্রহণ করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনা নবদ্বীপেই হইয়াছিল। ফলে রঘুনাথ, রঘুনন্দন, ও প্রেমাবতার চৈতন্য প্রভু একত্রে একই গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পদপ্রান্তে বসিয়া তিন বিভিন্ন পথে বিভিন্ন শিক্ষালাভে নবদ্বীপ কেন তৎসঙ্গে সমস্ত বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথের পরে গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, বীর রাঘব শাস্ত্রী, গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, গোলক ন্যায়রত্ন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, ত্রিলোচন দেব ন্যায়পঞ্চানন, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী নানাবিধ টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়া নব্য ন্যায়ের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। নব্য ন্যায় পাঠার্থীগণ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী বটেন। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম, গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম জগদানন্দ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, রাধাকান্ত শিরোমণি, রজনীকান্ত তর্করত্ন মহামহোপাধ্যায় তারিনী চরণ ন্যায়বাচস্পতি, অভয়ানন্দ চমৎকার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ গুরু স্থানের পণ্ডিতগণসহ সমকক্ষতা রক্ষায় অক্ষম হয়েন নাই। এই প্রবন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবে।

জীমূত বাহন।

জীমূতবাহন বঙ্গীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্টনারায়ণের ষোলটি সন্তানের মধ্যে বটু অন্যতম। বটু পাড়িহাল গ্রামবাসী ছিলেন। পাড়িহাল গ্রামের সংক্ষেপ নাম পাড়ি

বা পালি। ঐ পাড়িগ্রাম রাঢ়দেশে বীরভূম জিলার অজয় নদের সমীপবর্ত্তী ছিল। বটু বেদ প্রচারার্থ বেদ বেদাঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। এবং রাজসরকার হইতে বৃত্তি স্বরূপে পাড়িহাল গ্রাম দান প্রাপ্ত হন; পাড়িহাল গ্রামবাসী বলিয়া তৎসন্তানগণ পাড়িহাল শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

বটুর এক পুত্রের নাম মণিভদ্র। তৎপুত্র ধনঞ্জয়। ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তৎপুত্র শুদ্ধবুদ্ধি। তৎপুত্র কবি শিরোমণি বিধু; তৎপুত্র হলধর রাঢ়দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। পাড়িহাল বংশে হলধর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হন। হলধরের পুত্র চতুর্ভুজ এবং চতুর্ভুজের পুত্র জীমূতবাহন ও বিশ্বমঙ্গল। জীমূতবাহনের বংশ সম্বন্ধে বেদগর্ভ বংশ সম্ভূত এড়ু মিশ্র ঘটক কৃত মহা বংশাবলী গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ বংশাবলী বর্ণিত আছে। মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও বেদগর্ভ দুইজন প্রবীন ব্যক্তি এবং উভয়ে সমসাময়িক; জীমূত বাহন ও এড়ু মিশ্র প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি সুতরাং এড়ু মিশ্রের লিখিত জীমূত বাহনের বংশাবলী ভ্রম প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মহাবংশাবলীতে লিখিত আছে :—

"তস্যান্বয়ে বিধুর্জ্জাতে কবীনাঞ্চ শিরোমণিঃ
তস্য পুত্র হলো নাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ
পাড়িকুলে মুনি শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধ পূজিতঃ
তস্য পুত্রঃ সুকীর শ্রীমান্ চতুর্ভুজঃ সদার্চ্চিতঃ
বিশ্বমঙ্গল জীমূতৌ চতুর্ভুজ সুতা ভূ ভৌ
গৌর ভূমে তদা সম্রাট বিশ্বক সেন মহাব্রতঃ
জীমূত পি নৃ পাশ্চত্যঃ স প্রাড বিরাট ঈরিতঃ॥

জীমূতবাহন বিশ্বক সেনের রাজ সভাসদ ছিলেন দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বক সেনের অপর নাম বিজয় সেন। ইহাও দেখা যাইতেছে যে জীমূতবাহন বল্লাল সেনের পিতা বিশ্বক সেনের সভাসদ ছিলেন। জীমূতবাহন বিজয়সেনের প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধানতম বিচারপতি ছিলেন। জীমূত বাহনের নিজগ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি ১০১৪ সকে অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রন্থাদি রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বক সেন ও তৎপুত্র বল্লাল সেনের সভাসদ ও কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহা হইতে নিশ্চয় অবধারিত হইতেছে যে জীমূত বাহন খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। জীমূত বাহনের পিতামহ রাঢ় হইতে বঙ্গের রাজধানীতে বিক্রমপুর আসেন এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। তখন বাঙ্গালার রাজধানী বিক্রমপুর রামপালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান পঞ্চসার গ্রাম রামপাল রাজধানীরই একাংশ। বজ্রযোগিণী গ্রাম রামপালের উপকণ্ঠ ছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার সহিত কালীঘাটের যে সম্বন্ধ রামপাল রাজধানীর সহিত বজ্রযোগিনীর সেই সম্বন্ধ। অদ্যাপিও বজ্রযোগিণী এবং পঞ্চসার গ্রামে বহু সদ্বংশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে জীমূত বাহনের পিতামহ হইতে তাঁহারা রামপালে বা বজ্রযোগীনীতে বাস করিতেছিলেন।

জীমূত বাহন বহু শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। জ্যোতিষ, স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে তৎপ্রণীত গ্রন্থাদি দৃষ্ট হয়। তিনি একটী প্রধান ও বিস্তৃত রাজ্যের প্রধানতম আদালতের প্রধানতম বিচারপতি, সুতরাং ব্যবহার-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তৎকৃত দায়ভাগই তাহার নিদর্শন স্বরূপ। দায়ভাগ লিখিত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতের দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে বা নিবন্ধ গ্রন্থানুসারে বাঙ্গলা দেশের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। মিতাক্ষরাই দায়াধিকার সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ ছিল। জীমূত বাহন ঐ সমুদয় মতের বিচার ও খণ্ডন করিয়া মন্বত্রি প্রভৃতি সংহিতাকর দের সংহিতা ও স্মৃতি শাস্ত্র এবং বেদ পুরাণের আবশ্যক মত মত নিয়া স্বীয় অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্বমত স্থাপন পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ দায়ভাগ গ্রন্থ লিখেন। প্রায় সহস্র বর্ষ দায় ভাগ লিখিত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে বাঙ্গলায় হিন্দুরাজ সিংহাসন ধূলিসাৎ হইয়াছে। মুসলমান রাজ স্বপ্নের রাজ্যের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজত্ব ১৫০

বর্ষাধিক কাল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু জীমূত বাহনের দায়ভাগ অনুসারে আজিও বাঙ্গালার হিন্দুধনাধিকারীদেরও উত্তরাধিকারীত্বের বিচার হইতেছে। পাশ্চাত্য প্রধান ২ ব্যবহার জীব, দায় ভাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

জীমূত বাহন "ধর্ম্মরত্ন" নামে এক খানা বিস্তৃত স্মৃতি গ্রন্থ লিখেন। ইহা এক খানা প্রসিদ্ধ নিবন্ধ গ্রন্থ। জীমূত বাহনের "ধর্ম্মরত্ন" প্রধানসমাজ বিধি ও রাজবিধি বলিয়া আদৃত। ধর্ম্ম রত্নেরই একাংশ "দায় ভাগ"। "কালবিবেক" নামে এক খানা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ জীমূত বাহনের লিখা।

অধ্যাপক "মেকডনেল" সাহেবের মতে ধর্ম্ম রত্ন ও দায় ভাগ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লিখিত কিন্তু এইমত বিশুদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বিষ্বক সেন খৃঃ একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। জীমূত বাহন তাঁহার সভাসদ ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে সুতরাং জীমূত বাহন খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না।

বাচস্পতি মিশ্র।

বাচস্পতি মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তিনি কোটালীপাড়া বৈদিক সমাজভুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বকালে কোটালীপাড়া বিক্রমপুরান্তর্ভূত ছিল। বৈষ্ণব মিশ্র ও যশোধর মিশ্র কনোজ হইতে রাজ বিপ্লব বশতঃ বিক্রম পুরেশ্বর হরিবর্ম্মার রাজধানীতে উপস্থিত হন। তৎসময়ে তাহাদের সহিত রাজ সভাসদ ও আমাত্য বাচস্পতি মিশ্রের সাক্ষাৎ হয়। যশোধীরের বংশধরগণ এখনও ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন। বাচস্পতি মিশ্র কোটালীপাড়া হইতে বিক্রমপুর হরিবর্ম্মা দেবের রাজধানীতে বাস করিতেন।

বাচস্পতি মিশ্র ষড়দর্শনের টীকা লিখিয়াছেন। "ভামশূতী নিবন্ধ প্রভৃতি ষড়দর্শন শাস্ত্রের নিবন্ধ গ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত। অধুনা ষড় দর্শন পাঠার্থীগণ অনেকেই বাচস্পতি মিশ্রের টীকা পাঠ করেন।

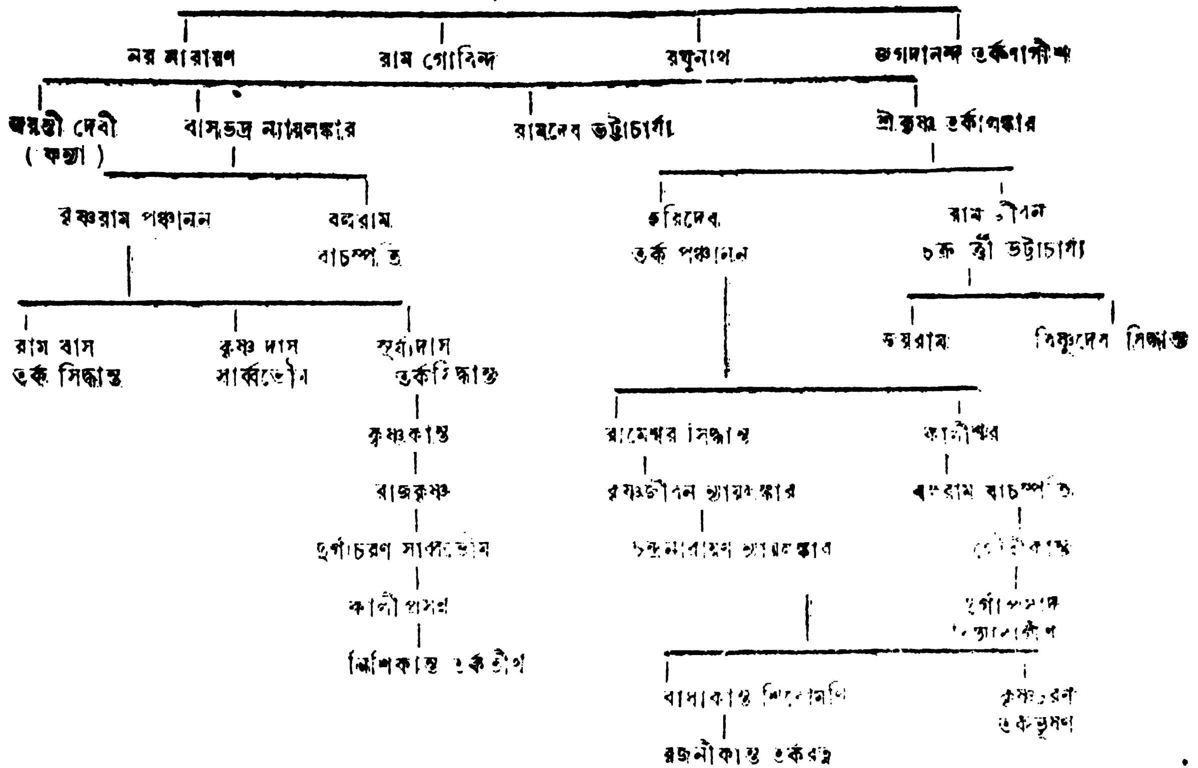
দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বাচার্য্যগণ মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত দর্শনের "শারীরক ভাষ্য" রামানুজের "শ্রীভাষ্য" উদ্যোত করের ন্যায়বার্ত্তিক, গৌর পাদাচার্য্যের "সাঙ্খ্যকারীকার টীকা" শ্রীমন্ত পাদাচার্য্যের "পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ" নাম্নী বৈশেষিকের ভাষ্য শবর স্বামীর "মীমাংসা ভাষ্য" ইত্যাদি টীকা ও ভাষ্য বিশদ গ্রন্থ বটে। ঐ সমুদয় গ্রন্থ সর্ব্ব দেশেই অতুলনীয়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় সমস্ত দর্শনের সর্ব্বাঙ্গীন টীকা আর কেহ লিখেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের শারীরক ভাষ্যের "ভামতী" ন্যায় বর্ত্তিক নাম্নী ন্যায়ের টীকা, "সাঙ্খ্য-তত্ত্ব কৌমুদী" নাম্নী সাঙ্খ্যকারীকার টীকার ন্যায় ভাষ্য নাম্নী ন্যায়ের অপর টীকা পাতাঞ্জল দর্শনের "তত্ত্ব বৈশারদী" নাম্নী টীকা অতুলনীয় ও বিশেষ আদরের সামগ্রী। প্রফেসার মেকডনেল মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র রাজা হরিব্রহ্মদেবের ও তৎ পুত্রের রাজমন্ত্রী কি অমাত্য ছিলেন। গুরুতর রাজকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের যেরূপ গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তৎ সম্বন্ধে যে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর হৃদয় আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হয় সন্দেহ নাই।

ধানুকার বৈদিক ভট্টাচার্য্যগণ।

ধানুকার বৈদিকগণ সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহারা প্রসিদ্ধ ময়ূরভট্টের সন্তান। ময়ূরভট্ট কনোজেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের সভায় একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য জন্য সূর্য্যদেবের স্তব করেন। ঐ স্তবই প্রসিদ্ধ "সূর্য্য শতক" নামক গ্রন্থ। ময়ূরভট্টের বংশে জীতামিত্র নামে একজন বিখ্যাত বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ গৌর দেশে আগমন করেন। জিতামিত্রের পুত্রের নাম লক্ষণ মিত্র। ঐ বংশে গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ চৈতন্যদেবের মাতুল কন্যা বিবাহ করেন। "কৃষ্ণার্জ্জুনীয়" কাব্য ইঁহা

রচিত। গৌরে "সুখ ডোবা" নামক স্থানে ইনি বসতি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিয়তরূপে বাস করিতে থাকেন। সুখ ডোবা এখন পদ্মার গর্ভস্থ। গোপীনাথ কণ্ঠাভরণের বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল।



জগদানন্দ তর্কবাগীশ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হন। জগদানন্দ মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তদানীন্তন ঢাকার নবাব সাহেব সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; এবং তদুপলক্ষে নবাব সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী ইদিলপুরের জমীদার কমল রায় মহাশয়ের সহিত ও মালখানগর নিবাসী বসু মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ দেবীদাস বসুর পিতার সহ তর্কবাগীশ মহাশয়ের আলাপ পরিচয়। অতঃপর ঐ উভয় ব্যক্তিই তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্ত্র শিষ্য হন। ইঁহারা উভয়ে ধানকুড়া নামক বিল ভরাট ও দীর্ঘিকা পুকুর খনন করিয়া জগদানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং শিব স্থাপন করেন। ধানুকার ভট্টাচার্য্যগণ এই প্রসিদ্ধ জগদানন্দ তর্কবাগীশেরই সন্তান।

রামদেব ভট্টাচার্য্য ধানুকা গ্রাম ছাড়িয়া নিকটস্থ কাটৈসার গ্রামে নিজ বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের পুত্রগণ মধ্যে বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে দুইটী শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিব স্থাপন করেন।

ধানুকা গ্রামে লক্ষ্মী গোবিন্দের মন্দির, শিব মন্দির, অম্বিকা দেবীর মন্দির ও শ্যামা মন্দির প্রভৃতি বহু দেব মন্দির

এবং ঐ সমুদয় দেবমন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত আছে। তৎসমুদয়ই ধানুকার ভট্টাচার্য্যদের পূর্ব্ব পুরুষের নির্ম্মিত ও স্থাপিত। এখনও রীতিমত ঐ সমুদয় দেব সেবা চলিতেছে।

জগদানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয়, "কৃষ্ণ কৌমুদী" ও "কৌলিকাঞ্চন" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বহু ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থ শিষ্য নানা জিলায় বর্ত্তমান আছে। রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার মহাশয় দেবীদাস বসুর গুরু। তৎপুত্র বলরাম বাচস্পতিই "কাশীখণ্ড" প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। কৃষ্ণ রাম পঞ্চানন "গৌরীকাঞ্চলিকা" নামে তন্ত্র শাস্ত্রের একখানা সুন্দর গ্রন্থ লিখেন।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম স্বয়ং একজন প্রখ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীচরণ চূড়ামণি। বলরাম রায় বাচস্পতির অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম ও জগদ্বন্ধু ন্যায় পঞ্চানন অতি প্রবীন নৈয়ায়িক। পূর্ব্ব কথিত ধানুকা নিবাসী পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রায় সমুদয়েরই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ধানুকা গ্রামটীকে ন্যায় শাস্ত্রের একটী বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলরাম বাচস্পতির বংশে চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ নামে একজন প্রসিদ্ধ তার্কিক জন্ম ধারণ করেন। ইনি কলিকাতার শিব কুমার ভবন নামা বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। রামদেব ন্যায় বাগীশের পুত্র গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ কুমারসম্ভবের, চণ্ডীর, কর্পূরাদিস্তবের ও মহিম্নস্তবের বিশদ টীকা প্রণয়ন করেন। ১৬৪০ হইতে ১৬৭৬ শক মধ্যে এই সমুদয় গ্রন্থ রচিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক। তাঁহার অভ্যুদয় সময়ে ভারতবর্ষের তৎতুল্য নৈয়ায়িক আর কেহ জীবিত ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি প্রথমতঃ পিতা কৃষ্ণজীবন ন্যায় লঙ্কারের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপর ন্যায় শিক্ষার তৎকালীন কেন্দ্রস্থল মিথিলায় গমন পূর্ব্বক ন্যায় শাস্ত্রে অগাধ বিদ্যালাভ করেন। দেশে আসিয়া টোল স্থাপন করেন। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও বাঙ্গালার নানাস্থানে বিচারার্থে গমন পূর্ব্বক বেশ বিজয়ী হন। কাশী নরেশ তাঁহার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া চন্দ্র নারায়ণকে নিজ সভায় আহ্বান করেন। এবং তিনি অতঃপর কাশী মহারাজের সভাপণ্ডিত পদে বরিত হন। অতঃপর তিনি কাশী কুইনস্ কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়া বাসায়ও অনেক ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অভাবে তৎ পুত্র রাধাকান্ত তর্কশিরোমণি ও কৃষ্ণচরণ তর্কভূষণ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া সুচারুরূপে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় সুরধনী কাব্যে কাশী বর্ণনা স্থলে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশ করেন।

"শিকরোল সন্নিকটে কলেজ ভবন,
বহু চূড়া বিভূষিত অপূর্ব্ব শোভন,
প্রশস্ত প্রাঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।
চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়,
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাত সঞ্চয়।
খালি পায় সমুদয় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কলেজে যেন করিয়ে আটক।"

চন্দ্রনারায়ণ, গৌতম সূত্র বৃত্তি, কুসুমাঞ্জলী বিবৃতি, বাধানুগম টীকা, চতুর্দ্দশ লক্ষণী ফক্কিকা, বিভক্তি তত্ত্বার্থবাদ, গদাধরী-বাদনুগম, গদাধরীয় অনুসরণ খণ্ডের টীকা, জাগদীশী ক্রোড় টীকা, জাগদীশী চতুর্দ্দশ নন্দনী পাইতা, তত্ত্ব চিন্তামনির টিপ্পনী, তত্ত্ব সংগ্রহের টীকা, ন্যায় ক্রোড় ও চক্রী পাইতা নামে ন্যায় শাস্ত্রের বহু পত্রিকা গ্রন্থ প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এবং নৈষধ কাব্যের টীকা প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের পৌত্র অর্থাৎ রাধাকান্ত শিরোমণির পুত্র নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ রজনীকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের ধানুকা জগদানন্দের নিজ বসত বাটীতে

বাস্তব্য করেন এবং আমরণ বহু ছাত্রের অধ্যাপনা কার্য্য করেন। ইনি "সার সন্দরীর টীকা" "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহের টীকা" এবং "পুষ্কর শান্তি বিচার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৫৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৩১৮ সনের মাঘ মাসে পরলোক গমন করেন। তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র রেবতীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য "সংযুক্তার স্বয়ংবর" নামক সংস্কৃত একখানা নাটক "প্রবন্ধ কল্প লতিকা" নামে কতকগুলি কাব্য ও নাটকের সমালোচনা করিয়া সমালোচনা গ্রন্থ এবং কতকগুলি কাব্য নাটকের টীকা লিখিয়াছেন। ২য় পুত্র রোহিণীকান্ত সাঙ্খ্যতীর্থ বাড়ীতে থাকিয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্য চালাইতেছেন। ইনি সাঙ্খ্যকারীকার গৌরপাদভাষ্যের টীকা ও সাঙ্খ্যসারের টীকা লিখিয়াছেন।

হরচরণ তর্কচূড়ামণি "দীপান্বিতা ব্যবস্থা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বর্ত্তমানে মূলা কেদার কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয় স্বর্গ্য নারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের বংশীয় দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌমের পৌত্র বটে।

জগদানন্দ তর্ক বাগীশের পুত্র রামদেব ন্যায়বাগীশের বংশে একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত জন্ম ধারণ করিয়াছেন ইহার নাম গুরুচরণ শিরোমণি। তিনি গঙ্গাতীরে বাসেচ্ছু হইয়া কাশিতে থাকিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। অল্পকাল তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

জগদানন্দের ৩য় পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার বহু গ্রন্থের বহু টীকা লিখেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামজীবন ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এবং পাকা বাড়ী করিয়া বহু দেব মন্দির স্থাপন করেন। তৎপুত্র বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পুত্র হরিদেবের শিষ্য মুন্সী গঙ্গান্তর্গত পুরুয়া গ্রাম বাসী ঘোষ বাবুগণ বটেন। ঐ ঘোষ বাবুদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুকুর খনন করিতে একখানা প্রস্তরময়ী দুর্গা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ঐ মূর্ত্তি স্বীয় ইষ্টদেবকে তাহারা প্রদান করেন। ঐ মূর্ত্তি ধানুকায় স্থাপিত আছেন। ধানুকায় ঐ মূর্ত্তির নাম "অম্বিকা" দেবী। দেবীদাস বসু মহাশয়ও পুকুর কি দীর্ঘিকা খনন করিতে এক পাষাণময়ী কালী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ পাষাণময়ী কালীকা মূর্ত্তিই ধানুকার "শ্যামা মূর্ত্তি"।

কৃষ্ণ জীবন ন্যায়পঞ্চানন একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি ছিলেন। একাধারে দার্শনিকত্ব ও কবিত্ব প্রায় দেখা যায় না। কৃষ্ণ জীবনের অনেক কবিতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়ের সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পৌত্র গদাধর একজন তন্ত্রশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার তান্ত্রিক মতানুসারী ধানুকার ভট্টাচার্য্যগণের ও তৎ শিষ্যগণের তান্ত্রিক পূজাদি হইয়া থাকে। কাশী কলেজের বর্ত্তমান ন্যায় শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় এই বংশে জন্মধারণ করিয়াছেন।

জগদানন্দের কন্যা জয়ন্তী দেবী সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি স্বামী, পিতা, পিতৃব্যগণ নিকট সংস্কৃত ভাষায় চিঠি পত্র লিখিতেন।

রামজীবন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশের রামদাস তর্কভূষণ, বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত, গোলক সার্ব্বভৌম, চন্দ্রশেখর ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ জন্মধারণ করেন।

পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ।

টঙ্গীবাড়ীর থানার অন্তর্গত পয়সাগাও গ্রামে পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্ম হয়। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি দাসু বন্দোপাধ্যায়ের সন্তান। ইনি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পুত্র। পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমতঃ কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কাব্য অলঙ্কার এবং নিজে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তৎতুল্য বৈয়াকরণ বিক্রমপুরে আর দৃষ্ট হয় নাই। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। গুরু উপদেশ ভিন্ন নিজের চেষ্টায় স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে এমন পাণ্ডিত্য লাভ করেন যে অনেক ন্যায় ও স্মৃতির বিচারে তিনি মধ্যস্থতা করিয়াছেন। তিনি কলাপ ব্যাকরণের অতি বিশদ টীকা লিখিয়াছেন। এইরূপ একাধারে নানা শাস্ত্র

শিক্ষা অন্য কোন পণ্ডিতের থাকা দৃষ্ট হয় না। ৫০ বর্ষ হয় ৭৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্য অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষার জন্য শত ২ ছাত্র পাঠার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছে। তিনিও কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্র শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন স্মৃতি শাস্ত্রের এবং অন্নদাচরণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একান্নবর্ত্তী ভ্রাতষ্পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। একই সময়ে এক ঘড়ে ব্যাকরণ স্মৃতি ও ন্যায়ের ছাত্রগণ অধ্যয়ন করায় উঁহাদের অর্থ সংকুলন করিয়া অন্ন দানে কষ্টকর হইলেও উঁহারা কোন ছাত্রকে কখনও পরাঙ্মুখ করেন নাই।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গ।*

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের এ অঞ্চলে ইতিহাসের কোনও আদর ছিলনা। সাহেবরা লিখিতেন আমরা পড়িতাম, কিংবা তাহাদের লেখার অনুবাদ করিতাম। স্বাধীন গবেষণা-মূলক ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদের এ অঞ্চলে একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। দু' একজন যাহারা ঐতিহাসিক আলোচনা করিতেন, তাহারা কিংবদন্তীমূলক ঐতিহাসিক গল্প কথারই প্রচার করিয়াছেন, প্রকৃত গবেষণা-মূলক ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুরূপ নিরপেক্ষ ইতিহাসের কথা আমরা জানিতে পারি নাই।

বাঙ্গালীর প্রাণে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য যদি কেহ গভীর মন্ত্রে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে সে কবি বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি শুধু আহ্বান করিয়াই নীরব থাকেন নাই, নিজেও কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আহ্বান বাণী সর্ব্বত্র একটা সাড়া দিয়াছিল, তাহারই ফলে আমরা অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে একে একে সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুণ্য পীঠে পূজকরূপে অবতীর্ণ হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ যুগেও আমরা স্বাধীন ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় পূর্ণভাবে পাই নাই, ভগ্ন জীর্ণ দেউলের লুপ্ত কাহিনী, তাম্রশাসনের পাঠ, প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা প্রকৃত ভাবে কর্ম্ম কেন্দ্র নির্দ্দেশের কথা জানিতে পারি নাই। প্রথমে এমনই হয়—কিন্তু এখন আমরা নূতন উষার আলোকের শুভ দীপ্তি অনুভব করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ প্রখ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমাকে 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' পথ-প্রদর্শক বলিয়াছেন, একথা আমার পরম গৌরবের কারণ, আমি প্রসঙ্গতঃ এখানে সামান্য দু' একটী কথা বলিব, যে ব্যক্তি প্রথম কোন বিষয়ে অগ্রসর হয়, সে ব্যক্তি অযোগ্য হইলেও তাহার একটু গর্ব্বের কারণ থাকে, সে গর্ব্ব আনন্দের। আমি যখন বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনার জন্য মাল মসল্লা সংগ্রহের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলাম, ক্যামেরা কাঁধে করিয়া ছবি তুলিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহ কেহ 'পাগল' এইরূপ আখ্যা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনেকেত মুখের উপরই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন "বিক্রমপুরের আবার ইতিহাস"। কাজেই নিরাশহৃদয়ে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সাহায্য কাহারও নিকট হইতে বড় একটা পাই নাই, কিন্তু সে কথা এখন বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেত প্রায় ২৫।৩০ বৎসর আগের কথা।

সে সময়ে আমি বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া যে কয়টি বিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি

---

* বিক্রমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।

ভগ্ন দেউল বাড়ী, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথি, দীঘি পুষ্করিণীর বিশেষত্ব, নানাজাতীয় লোকের বাস, প্রাচীন শিল্প, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষত্ব, মহিলা বারব্রত খেলা ধুলা, ইত্যাদির বৈচিত্র্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাহারই ফলে আমি, প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তির চিত্র ও তত্ত্বিবক প্রবন্ধ ও বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের বিষয় আলোচনা করি। আপনারা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ইহার পূর্ব্বে কেহ এ'দিকে মনোযোগ করেন নাই।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস—ধর্ম্ম বিপ্লবের ইতিহাস। প্রথম যুগে অন্ততঃ বৌদ্ধযুগের সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এ অঞ্চলে যুগে যুগে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রমত এ দেশে পূর্ণ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে এ দেশের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, এখনও তাহার প্রচুর নিদর্শন দেখিতে পাই, আমি নানা শ্রেণীর শ্রীমূর্ত্তি বিক্রমপুরে দেখিতে পাইয়াছি, ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি, অবলোকিতেশ্বর, মারীচি, চুণ্ডাকেষণী, ত্রৈলোক্য মহাভয়ঙ্কর, মুঞ্জশ্রী, জম্ভলার পিতা ইত্যাদি কতই বা নাম করিব। সৌর প্রভাবের নিদর্শনও এ অঞ্চলে অভাব নাই—বিক্রমপুরে এমন গ্রাম নাই যেখানে দুই একটী সূর্য্য মূর্ত্তি নাই, তারপর বিষ্ণু মূর্ত্তি,—বিষ্ণু মূর্ত্তি চতুর্বিংশতি প্রকারের হইয়া থাকে, এই সর্ব্বশ্রেণীর বিষ্ণুমূর্ত্তিই বিক্রমপুরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও যে কত প্রকারের শ্রীমূর্ত্তি আছে, তাহার বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার এখানে কোন প্রয়োজন নাই, দুর্লভ নারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া আপনারা মনসাদেবী পর্য্যন্ত যে কোনও দেব দেবীর মূর্ত্তির নাম করুণ না কেন, তাহাই বিক্রমপুর হইতে আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব।

শাক্ত প্রভাব এ দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল, এখনও আছে। সৌর প্রভাবেরও অন্তর্ধান ঘটে নাই, কারণ এখনও সূর্য্যের ব্রত, সূর্য্যের পাঁচালী এ অঞ্চলে আছে। আমাদের এই বিক্রমপুরে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এখনও আমরা আপনাদিগকে নমো গণেশায় হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৮ পীঠের কথা এখানেই শুনাইয়া দিতে পারি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব এ অঞ্চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথঠাকুর কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ভিক্ষুক বৈরাগী শ্রেণীর পরিচয়ও আমরা প্রতি মুহুর্ত্তে পাই। বাউল সম্প্রদায়—এ অঞ্চলের একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায়। ইহাদের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রতিভা' পত্রে লিখিয়াছিলাম। এই শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তকের নাম সুধারাম বাউল। সুধারামের অনেক গান বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়েরা বাড়ী বাড়ী গাহিয়া বেড়ান। আপনাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন—

'ডুবছে নাও ডুবাইয়া যাও
ওরে রসিক নাইয়া
ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে তারে বলি নাইয়া'—

এ গানটি এবং আরও অনেক গান সুধারামের রচিত। এই ভাবে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়—নানাজাতির নানা শাখার বাসভূমি এদেশে শ্রেষ্ঠ কুলীন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইতে মগ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত 'মগুয়া ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পাইবেন।

আমাদের প্রতি পদ্মার বড় আক্রোশ। বিক্রমপুরের বহু কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম লাভ করিয়াছে, সেদিন রাজা বাড়ীর মঠটি গ্রাস করিয়া আমাদের আরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, নতুবা আপনাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে আসিতেছেন, তাঁহারা আমাদের গৌরব পতাকা স্বরূপ সেই মঠাদি দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতেন এবং আমরাও আমাদের যে একটা কিছু গৌরব করিবার আছে তাহা দেখাইতে পারিতাম।

সম্প্রতি বন্ধুবর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা যত্নে ও আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা চলিতেছে, একটী দীঘির খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার

পূর্ব্বেও পরেশনাথ মহলানবিশের উদ্যোগে একবার খনন কার্য্য হওয়ার কিছু কিছু অতীত গৌরবের চিহ্ন পাইয়াছিলাম। এই ভাবে ক্রমশঃ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেউল ইত্যাদির খনন কার্য্য হইলে বিক্রমপুরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রচনার সুযোগ পাইব।

আলাদীনের ন্যায়, যাদু মন্ত্র প্রভাবে কেহ কেহ বিক্রমপুরকে রাতারাতি স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অসত্যকে দৃঢ়রূপে ব্যর্থ করিবার জন্যই দিন দিন নূতন নূতন তাম্রফলক ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়া আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইতেছে—যে বিক্রমপুর চিরদিনেরই বিক্রমপুর এবং অতীত শ্মশানের ভস্মরাশি ইহার অণুতে পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে এবং সে রেণু স্বর্ণ রেণু।

প্রাচীন সাহিত্য—প্রাচীন ইতিহাসের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়, আমরা এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। বিক্রমপুরের প্রাচীন পণ্ডিতদের গৃহে, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে, বৈষ্ণবদের আখড়ায় এখনও বহু প্রাচীন পুঁথি কীট দষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে, লুপ্ত হইতেছে, কিন্তু তাহার উদ্ধার হয় নাই, কারণ অর্থ ও সংগ্রহ ব্যাপারের প্রচেষ্টা এতদিন চলে নাই, ব্যক্তিগত ভাবে এ সব কাজ চলে না। সর্ব্বজনের সহানুভূতি ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সহানুভূতি ইহাতে চাই, তারপর এসব ব্যাপারে 'গৌরী সেনের' প্রয়োজন চাই, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রূপী গৌরীসেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার আগে ঢাকা 'সাহিত্য পরিষদ', সারস্বত সমাজ প্রভৃতি সামান্যতঃ এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কঙ্কালের মধ্যে প্রাণটুকু মাত্র ধুকু ধুকু করিতেছিল, তাহারা কি করিবেন? কাজেই কিছু হয় নাই, এখন আশা হয় কাজ হইবে। তবে এ সকল প্রাচীন রত্ন কক্ষ আগুলিয়া রাখা অপেক্ষা দানশীলতাই শ্রেয়ঃ।

বিক্রমপুরের নানাস্থানে বহু গাঁথা বা Ballad songs প্রচলিত আছে যেমন সোনামণির অপহরণ কথা, নৈরার ঘটক বংশের আদি কথা,—কেদার রায়ের সম্পর্কিত আরও অনেক গাঁথা শুনিয়াছি, আমি কতক সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুরের বিবরণও কেদার রায়ে প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপ গাঁথাগুলি সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ময়মনসিংহের গীতাবলি আজ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমাদের দেশের যুবকেরা হা হতাশ ও প্রেমের কবিতা লিখিয়া যে শক্তি অপচয় করেন, সে শক্তি যদি সামান্য ভাবেও এই সব দিকে নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে অনেক কাজ হইত। আশা করি এ কথাটি তাহারা শুনিবেন।

ইতিহাস রচনা একার কাজ নহে—দশজনের কাজ। তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিয়া তবে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তবে ইতিহাসের আরাধ্যাদেবী তিলোত্তমা গড়িয়া উঠিবে। উঠিলেও নিস্তার নাই—সত্য যাঁহাদের লক্ষ্য সে পথে চিরদিনই দ্বন্দ্ব চলিবে।

আমি এ জন্যই বিক্রমপুরের গ্রাম্য ইতিহাস সংগ্রহের জন্য ব্রতী হইয়াছিলাম। দুই খণ্ড প্রকাশিতও হইয়াছে। বিক্রমপুরে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় নয় শত গ্রাম, সমুদয় গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করাত একার কাজ নয়। এইভাবে যদি একে একে গ্রাম্য বিবরণগুলি সংগৃহীত হইত তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে বিশেষ সুযোগ হইত, কিন্তু সেরূপ উৎসাহও ত বড় একটা দেখিতে পাইতেছি না। যতদিন 'বিক্রমপুরকে' বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম, ততদিন নানাস্থানের সাহায্যে নানাভাবে কতক কতক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং নিজেও এজন্য বহু ক্লেশ করিয়া ঘুরিয়াছি কিন্তু দীন আমি, আমারত এমন শক্তি ছিল না এবং নাই যে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সবটা সময় দিতে পারি, কাজেই ইতিহাস ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতেও ছাড়ি নাই!

এ বিষয়ে আমাদের তরুণ সাহিত্যকারীদের সাদরে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা যদি নিজ নিজ গ্রামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন তাহা হইলে অনেক কাজ হয়, তবে একাজ নিজ বংশ গৌরব ও অযথার্থ ভাবে নিজ গ্রাম্য গৌরব প্রকাশ করিবার দিকে ঝুঁকি না দিয়া যাহা সত্য তাহাই নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করা উচিত। আমি এরূপ সংগ্রহে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থী।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান, সে কথা আমরা ইতিহাসের দিক্ দিয়াও গর্ব্ব করি, কার্য্যতঃ সে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বংশাবলী আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে বা তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কথা বংশ-পরিচয় কেহই দিতে পারেন নাই, অন্ততঃ শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীর নিকট হইতে তাহা পাই নাই, কাজেই এ দিকেও আমার একটা কৌতুহল জাগিয়াছে, কোন বিশেষজ্ঞ ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব।

একদিনে কোন কাজ হয় না। বিশেষতঃ পরাধীন দেশে। আজ মিশর, পেলেষ্টাইন্. বাবিলন, মধ্য এসিয়া প্রভৃতি দেশে যে খনন কার্য্য চলিতেছে, তাহার জন্য অর্থের ভাবনা নাই, কর্ম্মীর অভাব নাই; কারণ স্বাধীন দেশের লোকেরা এ কাজে অগ্রসর, আমাদের দেশে তেমন হওয়া সম্ভব কোথায়? শরৎকুমারের মত বদান্য সুপণ্ডিত ও ঐতিহাসিক ভূম্যধিকারী বাঙ্গালা দেশে যদি সংখ্যায় বেশী থাকিত, তাহা হইলে অনেক দুর্দ্দশা দূর হইত, বিক্রমপুরের ইতিহাসের উদ্ধার অনেক পূর্ব্বেই হইত। বরং তাহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের একজন ভুম্যধিকারী প্রায় দুইশত বৎসরের একটী মঠ সরিকি হাঙ্গামার জন্য ভূমিসাৎ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গ্রামবাসীর কাতর ক্রন্দন শোনেন নাই—কারণ তাঁহার কাছে প্রাচীন কীর্ত্তির দাবি অপেক্ষা আপনার জমিদারী স্বত্বের মূল্য যে অনেক বেশী!

বাঙ্গালীর প্রতিভা আছে—কাজ করিবার শক্তিও আছে। বিক্রমপুরবাসী বিক্রমশালিনী জননীর সন্তান আচার্য্য জগদীশের এ গৌরব বাণী বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কারণ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে হনুলুলু পর্য্যন্ত খুঁজিলেও বিক্রমপুর বাসীর সাক্ষাৎ পাইবেন। আজ দূর সিন্ধু গর্ভের বালুকা শয্যায় লুপ্ত কাহিনী অতীত গৌরব-স্মৃতি আমরা আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইতেছি, ইহা যেমন প্রতিভার নিদর্শন, তেমনি আমাদের বাঙ্গালা দেশের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার বিষয়ে আমরা যদি নূতন কিছু বাহির করিতে পারি, তাহা বুঝি আরও বেশী গৌরবের পরিচায়ক।

ইতিহাস চির দিন সত্যকে প্রকাশিত করে। সৌভাগ্যের বিষয় দিন দিন আমরা সে সত্যের অনুসন্ধান পাইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ রামপ্রসাদ চন্দ আমাদের বিক্রমপুরের গৌরব, তাঁহার কাছে আমরা অনেক আশা করি। পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের দেশ প্রীতি আমাদিগকে যেমন মুগ্ধ করে তেমনি তাহার আমাদের এ অঞ্চলের শ্রীমূর্ত্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত গ্রন্থ ও তাম্রশাসনের পাঠ আমাদিগকে পুলকিত করিতেছে। এইরূপ কর্ম্মী ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া যাহারা এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাহাদের নিকট হইতে আমরা ক্রমশঃ আমার দেশের ইতিহাস আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাইব।

ইংরেজ জাতি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাস আলোচনা না করিলে আমাদের চলিতে পারে না, তুলনা মূলক সমালোচনা ভাল এবং তাহাতে অনেক সংকীর্ণতা দূর হইয়া প্রকৃত সত্যের পথের সন্ধান বলিয়া দেয়। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, আমার কথাই সত্য তাহাও চলেনা, বিরুদ্ধ মত, ও যুক্তির বিচারের মধ্য দিয়া সত্যকেই পাইতে হয়। কিংবদন্তী ও গল্প কাহিনী, ও কুলপঞ্জীকে পরিত্যাগ করাও যেমন চলেনা, তেমন অবিসংবাদিত রূপে গ্রহণ করিলেও চলেনা। বিচার চাই, তর্ক চাই, যুক্তি চাই।

বিক্রমপুরের মুসলমান প্রভাবের ইতিহাসটা ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। অথচ বিক্রমপুরের শতাধিক পল্লী মুসলমান প্রভাবের নিজ নিজ নাম দ্বারা প্রচার করিতেছে। এ বিষয়ে কোনও কৃতী মুসলমান যুবকের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি খুব বেশী। তাহাদের ও আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এমন কি সত্য পীড়ের সিন্নি ও কালী বাড়ীতে পাঁঠা ছাড়িয়া দেওয়া বহুকাল হইতে বিনা কলহে চলিয়া আসিতেছে। এ অতি ছোটকথা—কিন্তু একদিক দিয়া চিন্তা করিলে খুব বড়কথাই বলিতে হয়।

বিক্রমপুর সাহিত্য সমাজের যে পরিচয় পাইলাম, সে অতি আনন্দের কথা, তাঁহারা কার্য্যাবলীর যে তালিকা

দিয়াছেন যদি সেইভাবে কাজ হয় তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমধিক সমুজ্জ্বল হইবে। আর একটা আমার কথা এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমাদের পূর্ববঙ্গে এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা যাদুঘর আছে, চোখে দেখিবার এবং কাণে শুনিবার অনেক বিষয়ই এখন হাতে আছে, এ সুযোগ আমাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

আজ আমাদের যিনি সভাপতি প্রিয়দর্শন ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকের শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করার সুযোগ আমাদের বিক্রমপুরের অনেক তরুণ যুবকই পাইতেছেন, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াও যদি তাঁহারা দেশের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য ব্রতী না হন, ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী না হন, তাহা হইলে তাহাদের ও আমাদের সমান দুর্ভাগ্য।

আমি কিছুই বলিলাম না, বলিবার প্রয়োজনই নাই। আমি শুধু এইটুকু চাই, আমরা দিন দিন যে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সেই নির্জীব দেহে নব সঞ্জীবনী শক্তি প্রবাহিত হউক। তরুণের দল দীপ্ত তপনের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রতিভা জাগিয়া উঠুক। আমরা দেখিয়া ধন্য হই।

আমার শুধু একটী কামনা আছে। বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণখানা যদি সর্ব্ব প্রকারে দেশবাসীর করকমলে উপহার দিবার উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই সে চেষ্টা আমার সার্থক হইবে। আমি বিক্রমপুরের দীন সেবক। একদিন যেমন বলিয়াছিলাম—

"তোমারই মাটিতে গড়া, ভব বায়ু এই প্রাণ
তোমারি কল্যাণে যেন হয় মোর অবসান।"

যদি আমার এ কামনা সার্থক হয় তাহা হইলেই আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর আমার কিছু চাহিয়া করিবার নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

এস্কিমো জাতির বিবরণ।

(ESKIMOS—ESQUIMAUX)

উত্তর আমেরিকারও উত্তর ভাগে গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশের তুষার ও হিম বাত্যার রাজ্যে এস্কিমো জাতির বাস। প্রচলিত হিসাবে ইহারা আবাহমান কাল হইতেই এই সকল হিম প্রদেশেই বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিলাতের ভৌগলিক মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (Ex-president of the Royal geographical Society of London) Sir Clements Markham প্রমুখ পণ্ডিতেরা এস্কিমোদিগকে ওঙ্কিলন (Onkilon) নামে সাইবেরিয়ার এক প্রাচীন জাতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে মধ্যযুগে তাতার আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া এই জাতির শেষাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ উত্তর সাগরের অন্তর্গত New Siberian Islands নামক দ্বীপাবলীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সেখান হইতে বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত পথে তাহারা Grimell Land এবং Greenlandএ আসিয়া পড়ে। উত্তর মেরু আবিষ্কারক Commander Pearyও এই মতেরই পোষকতা করেন এবং তাহার এরূপ বিশ্বাসের কয়েকটি হেতুও নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন যে মঙ্গোলীয় জাতির বিশিষ্ট ছাপ ইহাদের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। ১৮৯৪ সালে পেয়ারী গৃহিণী (Mrs Peary) যে এস্কিমো বালিকাকে দেশে লইয়া আসেন তাহাকে দেখিয়া চীন দেশীয় লোকেরা তাহাকে তাহাদের স্বজাতীয়া বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। প্রাচ্যজাতি সুলভ কতকগুলি বিশিষ্টতাও ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই পাওয়া যায়। যথা কার্য্যকুশলতা, অনুকরণ পটুতা ইত্যাদি। ইহারা প্রস্তর নির্ম্মিত যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহার সহিত সাইবেরিয়াতে প্রাপ্ত একপ্রকার গৃহাবশেষের খুবই ঘনিষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহারা যে বিপদে আপদে মৃতাত্মার আবাহন করে তাহাও হয়ত জাপান চীন প্রভৃতি দেশের পূর্ব্বপুরুষ পূজা প্রথারই ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

সাধারণতঃ ইহারা চীন এবং জাপানীদের ন্যায় খর্ব্বাকৃত তবে মাঝে মাঝে দীর্ঘাকৃতি লোকও ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠাবয়ব। কাহারও কাহারও মাংসপেশীর পরিপুষ্টি অতি আশ্চর্য্যজনক কিন্তু অনেক স্থলেই ইহাদের শরীরে অতিরিক্ত চর্ব্বির আবরণে মাংস পেশীর বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত। কাহারও কাহারও মতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী Red Indiansদের সহিতই ইহাদের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সেই হিসাবে তাহারা ইহাদিগকে Red Indiansদের জাতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

আদিম অবস্থায় উহারা যে স্থান হইতেই আসুক বর্ত্তমানে বহু শতাব্দী ধরিয়া জাগতিক সভ্যতার দুরধিগম্য প্রদেশে প্রকৃতির রাজ্যে অভিনব আবেষ্টনের মধ্যে উহারা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই উহারা এখনও শিশুর ন্যায় সরল, শিশুরই ন্যায় যে কোন জিনিষ দেখিলে সে বিষয়ে ইহাদের কৌতুহলের সীমা থাকে না। একবার Mrs. Peary যখন গ্রীনলেণ্ডে যান তখন এক বৃদ্ধা এস্কিমো রমণী শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্যই একশত মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া আসে। শিশুর ন্যায়ই ইহারা অতি সহজেই উল্লাসিত হয় এবং অতি সামান্য দুঃখের কারণেই অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার দুঃখ ভুলিতেও বেশীক্ষণ লাগে না, এমন কি মৃত্যু শোকও ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটাইয়া ওঠে। মোটের উপর ইহারা বেশ প্রফুল্লচিত্ত। হয়ত এই প্রফুল্লচিত্ততা প্রকৃতিরই বিধান, নতুবা দেশের ওরূপ প্রাকৃতিক কঠোরতার মধ্যে এই জাতির টিকিয়া থাকাই সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

ইহারা প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়া এখন পর্য্যন্তও প্রকৃতির উপরেই চির-নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতির এখানে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মূর্ত্তি নয়; এখানে চাষ আবাদ দূরে থাকুক, দুই একটা ফুল পাতা, দুই এক গাছি তৃণ দেখা যায় এমন স্থানও খুবই বিরল। শুধু তাই নয় পানীয় জলও অনেক স্থলেই বরফ বা তুষার গলাইয়া সংগ্রহ করিতে হয়। জীবন ধারণোপযোগী খাদ্যের জন্য নির্ভর করিতে হয় একমাত্র শিকার লব্ধ মৎস্য মাংসের উপরে; পশুচর্ম্ম হইতেই ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ এমনকি নৌকা এবং বাস করিবার জন্য তাঁবু পর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য ইহারা প্রস্তর অথবা প্রস্তরাকারে খণ্ড খণ্ড বরফ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু ইহারা স্থায়ী বাসিন্দা মোটেই নয়। অন্যান্য যাযাবর জাতির ন্যায় বোধ হয় খাদ্য সংগ্রহের সুখ সৌকর্য্যের অন্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আদিম অবস্থায় প্রায় সকল জাতিই যাযাবর অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। এখনও তাতার, তিব্বত, বেলুচিস্থান প্রভৃতি স্থানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এস্কিমোগণ অ-সভ্য হইলেও বর্ব্বর নয়। Peary সাহেব ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"They are savages, but they are not savage; they are without government, but they are not lawless; they are utterly uneducated according to our standard, yet they exhibit a remarkable degree of intelligence. In temperament like children, with all a child's delight in little things, they are nevertheless enduring as the most mature of civilised men and women, and the best of them are faithful unto death. Without religion and having no idea of God, they will share their last meal with any-one who is hungry, while the aged and the helpless among them are taken care of as a mother of course. They are healthy and pure-blooded; They have no vices, no intoxicants, and no bad habits—not even gambling. Altogether they are a people unique upon the face of the earth. A friend of mine well calls them the philosophic anarchists of the north."

বাস্তবিক পক্ষে ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে একটা জাতি পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতার আলোক না পাইয়াও এরূপ সাত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেছে অথচ ইহারা যাযাবর অবস্থার লোক; স্থায়ী ভাবে একত্র অবস্থান করিয়া যে কোনপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও নয়। সুতরাং ইহারা স্বভাবতঃই সৎ, শান্ত এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক। বর্ব্বর জাতিসুলভ হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা ইহাদের মধ্যে নাই।

অনেক পর্য্যটকেরা আসিয়া প্রচার করিয়াছেন যে এস্কিমোর শ্বেত জাতীয়দিগকে দেবতা বলিয়াই গণ্য করে, কিন্তু Peary সাহেবের মতে এরূপ উক্তি ভিত্তিহীন। বরং তাহার বিবরণে দেখা যায় যে কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সাহায্য করিলে যেমন ইহারা কৃতজ্ঞ থাকে তেমনই কোন প্রকার প্রত্যাশা দিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও সে কথা ইহারা ভোলে না। আবার অনেক বিবরণে ইহাদের প্রতি বর্ব্বরতার এবং নিষ্ঠুরতার নৃঃশংসতারও আরোপ দেখা যায়; কিন্তু Peary সাহেব ইহার বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, "The Eskimos are not brutes; they are just as human as caucasians."

এস্কিমোরা শারীরিক শক্তিতে এবং কষ্ট সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর আদিম জাতি সমূহের মধ্যে অদ্বিতীয়। ইহাদের সাহিত্য দূরে থাকুক লিখিত ভাষাও নাই, কাজেই বর্ণমালাও নাই। ইহাদের কথিত ভাষা agglutinative ধরণের অর্থাৎ মূল শব্দ সংগ্রহ খুব বেশী নয়। কিন্তু এক একটা মূল শব্দের পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে প্রত্যয়াদি যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়। তবু ইহাদের ভাষা আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়; তবে এই সাধারণ ভাষা ছাড়া ইহাদের একপ্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা আছে, যাহা শুধু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ; এই ভাষা উহারা বিদেশীয়দিগকে জানিতে দেয় না। ইহাদের যেমন সাহিত্য নাই তেমনই কলা হিসাবে কোন শিল্প চর্চ্চাও নাই। ইহাদের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন নাই। দ্রব্য বিনিময় দ্বারাই বিদেশীয়দিগের সহিত আদান প্রদান চলিয়া থাকে। ইহাদের নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের বড় একটা প্রয়োজনও হয় না। কারণ ইহাদের মধ্যে সম্পত্তিতে স্বাধিকার জ্ঞানই প্রায় নাই।

কোনপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও ইহাদের মধ্যে সামাজিক ভাব এবং পরস্পরের প্রতি সহজ প্রীতির ভাব এতটা উৎকর্ষতা প্রাপ্ত যে শীল মৎস্যের চেয়ে কোন বড় শীকার পাইলে তাহা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও খুবই প্রত্যক্ষ কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সকল সময় শীকার সংগ্রহ করা বড় সহজ নয়; আর এমন দৃশ্য তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না যে একটা লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অথচ তাহার প্রতিবেশীয়া আকণ্ঠ পূরণ ভোজন সমাধা করিতেছে। যদি কাহারও শীকারের অস্ত্র শস্ত্র না থাকে তবে কাহারও দুই প্রস্থ থাকিলেও সে এক প্রস্থ উহাকে দিয়া দেয়। ইহাদের শীকারের অস্ত্র শস্ত্র খুবই আদিম অবস্থা পরিচায়ক। Peary সাহেব তাহার অভিযানে গিয়া অনেককে বন্দুক ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আসিয়াছেন; ইহাতে এই জাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মৎস্য মাংস শীকারের উপরেই ইহাদের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্য সরবরাহ নির্ভর করে। ইহারা আদিম অবস্থায় পড়িয়া রহিলেও বুদ্ধি বৃত্তিতেও অপারগত এমন মনে হয় না, কারণ পোষাক পরিচ্ছদ এবং তাঁবু নৌকা প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম ও গৃহ নির্ম্মাণে ইহাদের বুদ্ধি এবং কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। Peary সাহেব যখন ইহাদিগকে অভিযানের কার্য্যে লাগাইয়াছিলেন তখন অপূর্ব্ব পরিচিত নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার প্রণালী উহারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে Peary সাহেবের অভিপ্রায় আয়ত্ত করিয়া লইয়া নানা ভাবে তাহারা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাদের সাহায্য না পাইলে এখন পর্য্যন্তও উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হইতে পারিত কিনা সন্দেহের বিষয়। Peary সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন, "I have often been asked: of what use are Eskimos to the world? They are too far removed to be of value for commercial enterprises, and further more

সাধারণতঃ মূল মৃত্তিকাভূমিই এই বেদীর কাজ করে। ঘরের অবশিষ্টাংশের মাটি কাটিয়া মেঝে তৈয়ারী হয়। কোন কোন স্থলে প্রস্তর দ্বারা এই বেদী প্রস্তুত হয়। বিছানার ধারে একটি বড় প্রস্তরের উপরে সারা দিনরাত্রি এক বাতি জলে--বাতি অর্থ প্রস্তরের আধারে সীল মৎস্যের চর্ব্বি জ্বালান হয়; এই বাতি হইতেই রন্ধন এবং ঘরের উত্তাপ রক্ষাও চলে। অগ্নি তথা বাতি জ্বালিবার জন্য পাথরের চকমকি (Flint and steel)ই এতকাল ব্যবহৃত হইত। এখন কোন কোন স্থলে Peary সাহেবের মারফতে তাহারা দেয়াশলাইএর ব্যবহারও শিক্ষা পাইয়াছে। উহারা বাতির দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করে যেন আবশ্যক মত ঘরের গৃহিণী বাতির তদারক করিতে পারে। এক ঘরে দুই পরিবার থাকিলে হয়ত আর একটি বাতিও জ্বলে। এই সকল ঘরের তাপমান বিছানায় এবং ছাদের দিকে ৮০°-৯০° পর্য্যন্ত উঠে, মেঝেতে হয়ত তুষার সীমা (Freezing point) পর্য্যন্ত নামে। ঘরের ছাদের মাঝখানে বায়ু চলাচলের জন্য ক্ষুদ্র একটা ছিদ্রপথও থাকে।

গ্রীষ্মকাল আসিলে প্রস্তরের এবং মাটির ঘরও স্যাঁতসেঁতে হইয়া পড়ে তখন ঘরের ছাদ খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরটা শুকাইয়া লওয়া হয়। এই সময়টা—জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—তাহারা সপরিবারে তাঁবুতে বাস করে। তাঁবুগুলি সিল মৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত, চর্ম্মের লোমশ দিকটা ভিতরের দিকে থাকে। এক একটা তাঁবুর জন্য ১০।১২ খানা সিল মৎস্যের চামড়া সেলাই করিয়া লওয়া হয়। তাঁবুর মেঝের পরিমাণ হয় ৮-১০ ফুট লম্বা, ৬-৮ ফুট প্রশস্ত। তাঁবুর ভিতরেও সেইরূপ বিছানার বন্দোবস্ত হয় সেইরূপই বাতি জ্বলে। অস্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার বরফের ঘরও তৈয়ারী করে। যেমন অস্থায়ী বন্দোবস্ত তেমনই এইরূপ ঘর তৈয়ার করাও বিশেষ সময় সাপেক্ষ নয়। চারিজন চতুর লোকে চেষ্টা করিলে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি ঘর তৈয়ার করিতে পারে। বরফ কাটিবার জন্য একরূপ ছুরি আছে, প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা; একদিকে ধার অপর দিকে করাতের ন্যায় দাঁতওয়ালা। প্রথমতঃ সকলেই এইরূপ এক একখানা ছুরি লইয়া প্রস্তরাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া বরফ কাটিতে থাকে—এক একটি খণ্ড লম্বায় ২।৩ ফুট উচ্চতায় ২ফুট হয়, এবং পুরু হয় কয়েক ইঞ্চি, হইতে অবস্থানুসারে আরও বেশী। বরফখণ্ড কাটা হইয়া গেলে একজন স্থান নির্ণয় করিয়া মাঝখানে দাঁড়ায়, তাহার চারিদিকে সকলে বরফ খণ্ড সমূহ আনিয়া হাজির করে। সেই ব্যক্তি মাঝখানে দাঁড়াইয়া বরফ খণ্ডগুলি লইয়া চারিদিকে দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিতে থাকে। বলাবাহুল্য প্রথম স্তরের প্রস্তরগুলি বেশ বড় থাকে, ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর ব্যবহার করা হয়। প্রস্তরখণ্ড কাটিবার সময় সবগুলিই ভিতরের দিকে একটু বাঁকা করিয়া কাঁটা হয় পরে একস্তরের উপরে পরের স্তর প্রস্তর বসাইবার সময় প্রত্যেকটা স্তরই ভিতরের দিকে একটু কাঁৎ করিয়া বসান হয়। ফলে সমস্ত ঘরটা কোণাকার (Conical) হইয়া উঠিতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে ছাদের উপরে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। ঘরের ভিতর হইতে সেই লোকটিই এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া কাৎ করিয়া একটি প্রস্তর খণ্ড উঠাইয়া ধরিয়া হস্ত কৌশলতায় ঐ প্রস্তরটি বসাইয়া ছাদের কার্য্য শেষ করে। ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে নীচের দিকে একটা ছিদ্র পথ কাটিয়া দেওয়া হয়। ঘরের মেঝের পরিমাপ হয় সাধারণতঃ ৫×৮ ফুট হইতে ৮×১০ ফুট পর্য্যন্ত। এইরূপে ঘরে অথবা তাঁবুতে বাস করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাহারা জীবন যাপন করে। আহার্য্যের জন্য শিকার করিয়া মৎস্য এবং মাংস সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল নিহত পশুর চামড়া হইতে পোষাক পরিচ্ছদ এবং বিছানা তৈয়ারী হয়; পোষাক তৈয়ার করিতে পশু চর্ম্মের বিভিন্ন খণ্ড সেলাই করায় জন্য সুতার পরিবর্ত্তে নিহত পশুর তন্তুই ব্যবহৃত হয় এবং সূচের কাজ হয় কোন পশুর হাড় দ্বারা; এস্কিমো রমণীরা এই কর্ম্মে খুব নিপুনা। ইহাদের পোষাক অনেকটা তিব্বতীয় এবং ভুটানীদের মত হয়। ইহারা স্বভাবতঃ বড়ই অপরিষ্কার,

স্নান ইহারা কস্মিনকালেও করে না—এই ক্ষেত্রেও তিব্বতীয়দের সহিত ইহাদের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়; বরফ বা তুষার না গলাইলে জলও ইহারা পায় না। গাত্রাবরণে অতিরিক্ত ময়লা জমিয়া অস্বস্তিকর বোধ হয় তখন ইহারা একটু তেল মাখিয়া শরীরের ময়লা উঠাইয়া ফেলে।

ইহারা সাধারণতঃ বেশ সুস্থকায়, কিন্তু বাত এবং ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ প্রবল; বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিশেষতঃ রমণীরা একপ্রকার হিষ্টিরীয়া ব্যারামেও ভোগে।

ইহাদের জীবনযাত্রা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অবিশ্রাম সংগ্রাম; আহারোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করা এক সংগ্রাম, শীতবাত হইতে শরীর রক্ষা করাও এক কঠোর ব্যাপার, আবার যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত তখন সেও এক সংগ্রামের মূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত হয়। কাহারও মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে, কাহারও মৃত্যু পদস্খলনে, কাহারও মৃত্যু তুষারপর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়াতে ইত্যাদি। এসব আকস্মিক দুর্ঘটনা এড়াইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত (৬০ বৎসরের উপরে) প্রায় কেহ বাঁচে না। মৃত্যুর পরে ইহাদের সৎকার ব্যবস্থাটা বেশ সহজ। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ যথাসম্ভব পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দুই একটা অতিরিক্ত পোষাক সঙ্গে দিয়া বিছানার সমস্ত চর্ম্মাবরণ এবং পরে একটা রশি দ্বারা জড়াইয়া বাঁধা হয়। উহারা মৃত দেহ স্পর্শ করিতে ভালবাসেনা কাজেই ঐ রশি ধরিয়া sledge টানার মত করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। ঘর বা তাঁবু হইতে বাহির করিবার সময় এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়া পর্য্যন্ত শব দেহের মস্তক সম্মুখের দিকে রাখা হয়। নিকটতম যে কোন স্থানে যথেষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় সে স্থলে গিয়া শবদেহ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়া আসে, যেন শিয়াল কুকুর বা শকুনিতে বিধ্বস্ত না করে। ইহারা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; আত্মার অস্তিত্ব অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তির অস্তিত্ব আর পরলোক অর্থ এই পার্থিব জগতেরই একটা দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র। যেখানে মৃতব্যক্তি আবার পার্থিব ভাবেই জীবন যাপন করিবে। কাজেই মৃতব্যক্তির সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পার্থিব সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিও তাহার সঙ্গেই দিয়া দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তি শিকারী হইলে তাহার sledge, নৌকা তাহার অস্ত্রশস্ত্র এমনকি তাহার কুকুরগুলি পর্য্যন্ত গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার সহিত সমাহিত করা হয়। এ বিষয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক প্রথার সহিত ইহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাহাদের মত ইহারা মৃতের পত্নিকে সহমরণে পাঠায় না। মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে তাহার বাতি, চর্ব্বি, দেয়াশলাই, সেলাই করিবার যন্ত্র পাতি এবং বরফ গলাইয়া জল সংগ্রহ করিবার জন্য একটি পাত্র পর্য্যন্ত মৃতদেহের সহিত সমাহিত হয়। মৃত রমণীর শিশু সন্তান থাকিলে তাহাকেও গলা টিপিয়া মারিয়া ঐ সঙ্গে সমাহিত করা হইত। বর্ত্তমানে Peary সাহেব গিয়া স্থল বিশেষে এই প্রথার অনেকটা সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

তাঁবুর ভিতরে কাহারও মৃত্যু হইলে সেই তাঁবু আর কেহ ব্যবহার করে না; তাঁবু ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, কালক্রমে উহা পচিয়া, ছিঁড়িয়া বা উড়িয়া চলিয়া যায়।

কোন ঘরের ভিতরে মৃত্যু হইলে সকলে সেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বহুদিন পর্য্যন্ত সেই ঘর আর কেহ ব্যবহার করে না। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা খাদ্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করে; আর বিশেষ কথা এই যে মৃত ব্যক্তির নাম কেহ উল্লেখ করে না। যদি দলে আর কাহারও সেই নাম থাকে তবে তাহার নাম বদলাইয়া অন্য নাম রাখা হয়। পরে ঐ দলে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ঐ নাম দেওয়া হয়। তখন ঐ নামের যত কিছু দোষ কাটিয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে অনেক ভাবী শিশু সন্তানের নাম পূর্ব্ব হইলেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এস্কিমোরা আমোদ আহ্লাদে যেমন শিশুর মত সরল অথবা তরলমতি মৃত্যু শোকেও ইহারা তেমনি প্রথমে খুবই

অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার কয়েক দিনের মধ্যেই শোক দুঃখ কাটিয়া যায়।

এস্কিমোদের মধ্যে কোনপ্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহারা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; তাহা ছাড়াও ইহারা অশরীরি আত্মার অস্তিত্বের বিশ্বাসবান—বিশেষতঃ দুরাত্মা (অশুভ আত্মা)। ইহারা দেশের প্রকৃতির নিকট হইতে এমন শুভপ্রদ কিছু লাভ করে নাই। যাহার ~~জন্ত কোন~~ ফলদাতা বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতার ভাব আসিবে। বোধ হয় এই জন্তই কোন মঙ্গলময় বিধাতার কল্পনা, ইহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই। বরং এখানকার প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে সারাজীবন তাহাদিগকে সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয় বলিয়াই তাহারা স্বভাবতঃই মনে করে যে তাহাদের চারিদিকে শক্রতা সাধন করিবার জন্য অসংখ্য অশরীরি আত্মা সমূহ নিয়তই ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। এই সব দুর্ব্বৃত্ত আত্মাদের নায়ক হইয়াছে Tornarsub, শুভ বা সদাত্মার মধ্যে তাহারা জানে তাহাদের মৃত পূর্ব্ব-পুরুষদের আত্মা সমূহ।

দুরাত্মাধিপতি এই Tornarsubকে ইহারা সারাজীবনই সমীহ করিয়া চলে। শীকার পাইলে প্রথমেই Tornarsubকে কিছু উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। বরফের ঘর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় তাহারা ঘরের সম্মুখ ভাগ পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আসে যেন কোনও দুরাত্মা এই ঘরে আশ্রয় লইতে না পারে। কোন পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবার সময় তাহারা পোষাকটিকে এমন ভাবে ছিড়িয়া ফেলে যে কোন দুরাত্মা যেন আর সেই পোষাক ব্যবহার করিতে না পারে। মনে হয় যেন কোন দুর্ব্বৃত্ত একটু আরামে থাকিতে পাইলে আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। হঠাৎ কোন কারণ বিনা কুকুর ডাকিয়া উঠিলে ইহারা মনে করে যে Tornarsub অদৃশ্য অবস্থায় নিকটে কোথাও আছে। তখন ইহারা বাহিরে আসিয়া চাবুক ঘুরাইয়া বন্দুক ছুড়িয়া দুরাত্মাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। বায়ুর গতিতে ইহারা অনেক সময় মনে করে যে Tornarsubই বায়ুভরে চলিয়া গেল। অনেকটা Scandinavian's পুরাণে Odin এর গতির কথা মনে করাইয়া দেয়। যাত্রা পথে হঠাৎ আসিয়া হয়ত একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে Tornarsub কি বলিয়া গেল—শুনিতে পাইলে কি?

পিতৃপুরুষদের শুভ আত্মাদের সহিতও যে ইহারা সম্পর্ক শূন্য এমন নয়। শীত বাত্যা বা বরফের দুর্য্যোগে সকল প্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়েই তাহারা পিতৃপুরুষদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহাদের মধ্যে কোন দলপতি নাই। দলের মধ্যে একব্যক্তি থাকে যে চিকিৎসকের কাজ করে তাহার একটু প্রভাব প্রতিপত্তিও দেখা যায়। চিকিৎসকের কোন প্রকার ঔষধ পত্র নাই; কোন কোন স্থলে খাদ্য সম্বন্ধে নিষেধের ব্যবস্থা আছে যেমন এক বা একাধিক পক্ষকালের জন্য রোগী সিল মৎস্য বা হরিণের মাংস খাওয়া হইতে বিরত থাকিবে। ঔষধের পরিবর্ত্তে কখন কখন চিকিৎসক নিজে সমাধিস্থ হইয়া রোগ আরোগ্য করে; তাহার অন্যবিধ প্রক্রিয়া হইতেছে সুর সংযোগে এবং বাদ্য সংযোগে মন্ত্রোচ্চারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী। ইহাদের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র জল হস্তী দন্ত (Walrus Ivory) বা হাড়ের ফ্রেমের উপরে সিন্ধু ঘোটকের (Walrus) গলনালীর পর্দ্দা প্রস্তুত এক প্রকার Tambourine; আর একখণ্ড জলহস্তী দন্ত বা হাড় দ্বারা Tambourine এর কিনারায় আঘাত করিয়া তাল রক্ষা করা হয়। এস্কিমোদের সঙ্গীত চর্চ্চা বা বাদ্যযন্ত্র চর্চ্চাও এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছে।

চিকিৎসক আবার ভবিষ্যৎ বক্তা। এই ব্যক্তি সাধারণতঃ এত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সংবাদ প্রচার করে যে ইহাকে বড় কেহ সুনজরে দেখে না। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে একজন দৈবজ্ঞ অতি মাত্রায় ভবিষ্যৎ মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া লোককে অতিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; ফলে সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে লইয়া শীকার যাত্রায় বাহির হইল। এই যাত্রাই সেই দৈবজ্ঞের পক্ষে অগস্ত্য যাত্রা হইল। এরূপ

দৃষ্টান্ত অবশ্য খুবই বিরল। কোন কোন স্ত্রীলোককেও এই দৈবজ্ঞ এবং চিকিৎসকের ক্ষমতা লাভ করিতে দেখা যায়।

যেখানে আকাশ অনবরত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নক্ষত্র খচিত থাকে সেখানকার লোকেরা সে গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া লইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইহারা যথাসম্ভব জ্যোতিষী। উত্তর দেশের আকাশে যে সকল নক্ষত্র পুঞ্জ বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় সেগুলি ইহাদের নিকট সুপরিচিত; বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র পুঞ্জের জন্য ইহাদের প্রদত্ত নাম এবং বিবরণ আছে। কোন নক্ষত্র পুঞ্জে (Great Dipper) তাহারা দেখিতে পায় এক দল দেবধামস্থ বল্গা হরিণ, কোনটাতে (Pleiads) দেখে একদল কুকুর একটি মাত্র শ্বেত ভল্লুককে (Polar bear) তাড়া করিতেছে, কোনটার (Gemini) বিবরণে তাহারা বলে যে গৃহের প্রবেশ পথ সম্মুখস্থ দুইটি প্রস্তর খণ্ড। চন্দ্র এবং সূর্য্যের আকাশ পর্য্যটনে তাহাদের ধারণা যে এক মুগ্ধনায়ক তাহার নায়িকার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীদের কোন কোন জাতির মধ্যেও ঠিক এইরূপ বিশ্বাস দেখা যায়।

এস্কিমো কুকুরের একটু পরিচয় না দিলে এস্কিমোদের বিবরণই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ কুকুরই ইহাদের একমাত্র গৃহপালিত পশু; আবার শিকার যাত্রায় এই কুকুরই ইহাদের একমাত্র সঙ্গী এবং সহায়কারী। এখানকার সমস্ত কুকুরই এক জাতীয়, কিন্তু ইহাদের গাত্রাবরণে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা কাল, সাদা, হলদে, ধুসর বর্ণ বা বাদামী রং আবার কোনটা হয়ত চিত্র বিচিত্র। কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন এই কুকুর উত্তর দেশীয় নেকড়া বাঘের (Arctic Wolf) বংশধর; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহারা অন্যান্য দেশীয় কুকুরের ন্যায়ই প্রভুভক্ত। ইহাদের শারীরিক বিশেষত্ব মুখের আকৃতি। মস্তকের দিক হইতে মুখের দিকটা ক্রমশঃ সরু, এক চক্ষু হইতে আর একটা চক্ষু পর্য্যন্ত ব্যবধান খুব বিস্তৃত। কান দুইটি খাড়া এবং ক্রমশঃ সরু আকৃতির। গাত্রচর্ম্ম খুব পুরু তাহার উপরে বেশ অনেকটা কোমল পশমের আবরণ। লেজও শেয়ালের ন্যায় লোমশ; পায়ের মাংস পেশী খুব পুষ্ট এবং শক্তিশালীও। ইহাদের আকৃতি এবং গড়নও বেশ শক্তির পরিচায়ক; ওজনে এক একটা কুকুর সাধারণতঃ ১মণ বা ১মণ ১০ সের পর্য্যন্ত হয়—Peary'র বিবরণে আছে তিনি একটা কুকুর পাইয়া ছিলেন, তাহার ওজন দেড় মণের উপরে (১২৫ পাউণ্ড)। বলাবাহুল্য ইহারা মাংসাশী; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মাংস ছাড়া আর কোনরূপ খাদ্যে ইহাদের শরীর রক্ষা হয় না। ইহারা তুষার ভক্ষণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহাদের শক্তির পরিচয়ে ইহাও বলা যাইতে পারে যে আর কোন দেশের কুকুর এত শৈত্যের মধ্যে অর্দ্ধাহারে বা প্রায় অনাহারে এত কাজ করিতে পারে না; পারিবার কথাও নয় কারণ ইহারা এই হিমানী প্রদেশে তুষার শৈত্যের উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই জন্মগ্রহণ করে। কখনও বা একমাস বয়স পর্য্যন্ত গৃহে আশ্রয় পায়—কখনওবা পায় না। তাহা ছাড়া ইহারা চিরকালই উন্মুক্ত আকাশ তলেই জীবন-যাপন করে। গৃহপালিত পশু হইলেও ইহারা সাধারণতঃ গৃহে আশ্রয় পায় না।

উত্তর মেরু অভিযান সমূহে বহুবার এই সব কুকুরের অত্যাবশ্যকতা এবং কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

নাথ সম্প্রদায়।

জগতে কত জাতি গড়িল, উঠিল, পড়িল আর ভাঙ্গিল তাহার ইয়ত্তা নাই। যে জাতি একটু সহনশীল তাহা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইল না—কোনও রকমে বাঁচিয়া রহিল। যে আরও একটু দৃঢ় সে আরও একটু ভাল অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল; আবার কোনটী বা পতনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে

বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া কিছুকাল পরে আবার নূতন উদ্যমে নবীন আশায় নব প্রেরণা ও উৎসাহ লইয়া পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। ইহাই কালস্রোত। এই কালস্রোতে পতিত হইয়া কোন জাতিই চিরকাল তাহার প্রভাব, তাহার বিশেষত্ব, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব—বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম হিন্দু বা আর্য্য ও ইহুদী বা জু—এই দুই জাতির মধ্যেও লোক চক্ষুর অগোচরে বা তাহার সম্মুখ দিয়া প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

এই কালস্রোতের অনুগামী হইয়া বাংলার বুকে একদিন নাথ ধর্ম্মের সৃজন ও প্রচার হইয়াছিল। হয়ত ইহার সৌভাগ্য সূর্য্যও 'একদিন দীপ্ত গরিমায়' অতুল প্রতিভায়ই পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে ধীরে উদিত হইয়াছিল। প্রখর-খর কিরণজাল চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত করিয়া বহু মানবের মধ্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল;—কিন্তু এখন সে রবি অস্তমিত প্রায়, যা আছে তা শুধু গোধুলি-রাগ-রঞ্জিত আকাশের দীপ্ত লোহিতাভাময় দৃশ্য পট—শেষ হইয়া যাওয়া গীতের রেশ মাত্র। তবে ভরসা হয় যে হয়ত এ জাতি আবার ইহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে—মাঝে মাঝে সে আভাস পাওয়া যায়। এই জাতির বর্ত্তমান অধিকারীগণের মধ্যে প্রাণের সাড়া দেখা দিয়াছে।

ভারতে কোন জাতিরই ধারা বাহিক ও সময় নির্দ্দেশক কোন ইতিহাস নাই,—নাথ সম্প্রদায়েরও নাই। সুতরাং অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন জাতির মত এই সম্প্রদায়েরও বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ইহার জাতীয় সাহিত্য, ক্রম পরিণতি ও ইহাদের রক্ষিত লিপি প্রভৃতির সাহায্য নিয়া, ক্রমে ক্রমে গবেষণা করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং মতভেদ অবধারিত কিন্তু "নানাপন্থা বিন্ততে অয়নায়"।

কাহারও কাহারও মতে ইহারা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং নবম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে পূর্ব্বভারত, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে শিষ্যশাখার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত সমাজ কবিরপন্থ ও নানকপন্থাগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই নাথ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না।

নাথ-সিদ্ধাগণের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। ইহা নাকি সর্ব্ববাদীসম্মতও। এই গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছেন্দ্র নাথ, বা মৎস্যন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের নাথ পন্থীদের নিকট মতস্যেন্দ্রনাথের গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়। তদনুসারে প্রথমগুরু নিরঞ্জন, দ্বিতীয় অধিক সোমনাথ, তৃতীয় চেৎসোমনাথ, চতুর্থ ওঙ্কার নাথ, পঞ্চম অচেত নাথ, ষষ্ঠ আদিনাথ, সপ্তম মৎস্যেন্দ্রনাথ ও অষ্টম গোরক্ষনাথ। তৎপরে গুরু পরম্পরা লইয়া বিবাদ আছে। আমরা তাহার উল্লেখে বিরত রহিলাম।

সপ্তম গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এবং অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। এই মতস্যেন্দ্রনাথকে নেপালীগণ অবলোকিতেশ্বর পদ্মযোনি বোধিসত্ত্ব হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। [Hodgon's Essays Vol. II. page 40.]

এই নাথ সিদ্ধাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে "গোরক্ষ বিজয়ে"* আছে :—

"রাত্রিত জর্ম্মিল মীন গুরু ধনন্তরি।
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি॥
হাড়িফার জর্ম্ম হইল হাড় হোতে।
সর্ব্ব অঙ্গ সিদ্ধার ভেস দেখি এ সাক্ষাতে॥
কর্ণ হইতে জর্ম্মিল কানদা সিধাই।
অতি খরতর হই জর্ম্মিল তথাই॥
জটা ভেদি নিকলিল জতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধ ঝোলা সিদ্ধ কাথা তাহার গলাত।"

এই বর্ণনা রূপকও হইতে পারে।

তিব্বতীয় গ্রন্থমালার প্রমাণে রুশ দেশীয় পণ্ডিত ভাসিলিফ (Wasilief) স্থির করিয়াছিলেন যে গোরক্ষনাথ খৃষ্টের জন্মের আটশত বৎসর পরবর্তী। সার চার্লস ইলিয়ট (Sir Chalres Eliot) বলেন যে চতুর্দ্দশ শতকে নাথ সম্প্রদায়ের সৃজন হয় এবং হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ইহাদের সম্মান করিতেন। (Hinduism & Budhism (1921) (Vol. II. Page 117)

(Leonard) লেওনার্ড বলেন (Notes on Kamphatta Jogis; Indian Antiquary Vol. VI. pp 298-300) "যখন গোরক্ষনাথ ধরমনাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ প্রদেশের অধিবাসীগণের ধারণা তখন গোরক্ষনাথকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।" পশ্চিমভারতের মতে গোরক্ষনাথ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের; কিন্তু গরীব নাথ নামে ধরমনাথের একজন শিষ্য জাটদিগকে বিতাড়িত করিয়া ধরার রাজ্যে রায়ধনকে ১১৭৫—১২১৫ খৃঃ অঃ মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। (Indian antiquiry. Vol, VII, page 49) এই হিসাবে গোরক্ষ নাথ ১২০০ শতকের হইয়া পড়েন। রাইট—(Right) সাহেব তাহার নেপালের ইতিহাসে লিখিয়াছেন (pp-140-152) রাজা বলদেবের সময়ে ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন। সিলভ্যান লেভি (Sylvian Levi) (Le Nepal. I. 347) লিখিয়াছেন যে ৭ম খৃঃ যে সময় রাজা নরেন্দ্রদেব নেপালের অধীশ্বর ছিলেন সে সময়ে গোরক্ষনাথ সেখানে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সমস্ত আলোচনার পরে বৈজ্ঞানিক নিয়ম (Mathematical mean) অনুসারে এই নাথ সম্প্রদায়ের বয়স খৃষ্টীয় ৮।৯ শতকে ধরাই শ্রেয় মনে হয়, কিন্তু একটা জাতির ইতিহাসে বয়স নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সমীচিন তাহা নির্ণয় করিবার ভার সুধী সমাজের উপর; আমরা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

এই নাথ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল বহু জাতির ও বহু ধর্ম্মের সংমিশ্রণে। গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন বৌদ্ধ আবার মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে হিন্দু ছিলেন। এই সম্প্রদায় কোথা হইতে কি প্রকারে গঠিত হইয়া ছিল এবং ইহার নাম উপাধি কোথা হইতে কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা জানিতে পারি যে—

যোগীদের গুরুপরম্পরা ও জৈন তীর্থঙ্করদের নামের শেষে নাথ থাকাতে যোগীধর্ম্ম নাথধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হয়। এবং 'ধর্ম্মানুসরণকারীগণ নাথপন্থী বলিয়া অভিহিত হয়েন।' জৈনগণ নাথ অর্থে গুরু বুঝেন। পার্শ্বনাথ বৈশালীর যে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হয় তাহাদের কৌলিক উপাধি ছিল নাথ বা নায়; এইজন্য তাহাকে নায় পুত্ত, নাত পুত্ত, বা নাথ পুত্ত বলা হইত। পরে জৈন গ্রন্থে জ্ঞাত বা জ্ঞাতৃক হইতে নাথ বুৎপত্তি স্থির হয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থেও নাথ—জ্ঞাতি; বুদ্ধদেব নাথ করণ ধর্ম্ম বা নাথ ধর্ম্ম উপদেশ করেন অর্থাৎ জ্ঞাত ধর্ম্ম বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের ধর্ম্ম উপদেশ করেন। তীর্থঙ্কর শব্দের অনুরূপ নাথঙ্কর শব্দও বুদ্ধদেবের সময় প্রচলিত ছিল। যিনি পুণ্যতীর্থে, জ্ঞানতীর্থে বা শাস্ত্রতীর্থে স্নাত তিনি তীর্থঙ্কর। স্নাত হইতেও নাত বা নাথ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে নাত বা নাথ শব্দের জ্ঞাত, স্নাত, এবং জ্ঞাতিযুক্ত প্রভৃতি অর্থ পাওয়া যায়।

যোগীদের নাথ ধর্ম্মের উড়স ও ধারা জৈনও নয়, বৌদ্ধও নয়, অথচ উভয় ভাবাপন্ন; ব্রাহ্মণ্য ভাবযুক্তও নয়। ক্ষত্রিয় ভাবাপন্নও নয়—অথচ উভয় ভাব প্রবণ; ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকগতও নয়, শ্রমণগতও নয়—অথচ উভয় ভাবাপন্ন এইরূপ একটী ধর্ম্ম ও দর্শন যুক্ত সাধন পন্থা। এই ধারাকে আচেলক বা আজীবিক ধারা বলা যাইতে পারে। বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের শতাব্দীকাল পূর্ব্বে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মগুরু হইতে অচেলক সম্প্রদায় সমূহের উদ্ভব হয়। আজীবিকগণ যমপট হস্তে বিচরণ করিতেন; মৃতদেহ দাহ করিতেন না, পলে রজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রান্তরে নিক্ষেপ করিতেন। এই প্রথার উল্লেখ ময়নামতীর গানে আছে

এবং শুনা যায় কোন কোন নাথ সম্প্রদায়ে এপ্রথা এখনও চলিত আছে—একেবারে লোপ পায় নাই। কায়াসাধন, সহস্রাড়, চৌরাশি লক্ষ যোণী ভ্রমণ প্রভৃতি কথাও আজীবিকগণের উক্তি। আজীবিকগণের অনুসরণেই নাথ পন্থীগণ ত্রিনাথ বা ত্রিতীর্থঙ্কর মানেন।

ব্রাহ্মণদের প্রতিকুলতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আজীবিকগণ ৭.৮ ম খৃঃ অঃ শৈবশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন। সেই প্রাচীন আজীবিক ধারা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুরুগণের চেষ্টায় ও যোগীপাল, মানিকপাল প্রভৃতি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নুতন আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নাথ পন্থা নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম নাথ সিদ্ধাগণ শিবের আরাধনা করিতেন, শিবকে তাহাদের দেবতা বলিয়া মনে করিতেন, এমন কি গোরক্ষ বিজয়াদিতে দেখা যায় যে তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ কর হইত। পরে শৈবমত ভাঙ্গিয়া তাহাতে সহজযান ও বজ্রযান মিশাইয়া তাহারা একটী নূতন মতের সৃষ্টি করেন। মৎস্যেন্দ্র নাথ ছিলেন শৈব ভাবাপন্ন আর গোরক্ষনাথ ছিলেন বৌদ্ধ ভাবাপন্ন। তাহাদের কোন সময়ে কি মত ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে "গোরক্ষ বিজয়" "মীনচেতন" প্রভৃতি পাঠে মনে হয় যে তাহাদের প্রধান সাধন ছিল "কায়াসাধন"। যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমূহ আয়ত্ত করিয়া তাঁহারা কোন কোন নাড়ীকে অধিকতর শক্তিশালী আবার কোন কোন নাড়ীকে নিক্রিয়-প্রায় করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহারা যোগশাস্ত্রে অসীম পারদর্শী ছিলেন। কোন মাসে, কি বারে শরীরের অবস্থা কিরূপ হয় এবং সে সময় কি প্রকার সাধনা করিতে হয় এ সব তথ্য তাঁহারা সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতিতে তাহারা সিদ্ধ হস্ত ছিলেন; আর প্রাণ, অপানাদ বায়ুকে পায়ুস্থান—মূলাধার চক্র—হইতে উদ্ধার করিয়া উদ্ধ ব্রহ্ম রন্ধ্র বা সহস্রাড়ে আনয়ন করার চেষ্টাই ছিল তাঁহাদের কায়াসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্ ই অনন্ত সিদ্ধার উদ্ভব হইয়াছিল। নাথ সিদ্ধাগণ কেহ কেহ মৃত-সঞ্জীবনেও সমর্থ ছিলেন। গোরক্ষনাথ তাহার গুরুর চৈতন্ত-সম্পাদন মানসে মীন পুত্র বিন্দুনাথকে হত্যা করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন (গোরক্ষ-বিজয় ১৮২ পৃঃ)।

নাথ-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে দুইটী বিভাগ ছিল—গৃহী ও সন্ন্যাসী। গৃহীগণ সাধারণ গৃহস্থের মতই পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন, পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন এবং তাহাদের জীবিকার উপায় ছিল "তাঁত বোনা"। চরকা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়াই তাঁহারা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতেন, পরিবার ও পুত্র পরিজনের সখ মিটাইতেন, "মদের ঘটি আগে পাইবার" বন্দোবস্ত করিতেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সমভাবে একাজ করিতে একটুকুও লজ্জা বাসিতেন না। বর্ত্তমান সময়েও আমার নিজস্ব যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাতেও তাহাদিগকে তাঁত বুনিয়াই ভাত কাপড় সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের উপার্জ্জন কিছু বাড়িয়াই চলিয়াছিল কারণ জোলায় মোটা ধুতি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

'গোরক্ষ বিজয়ে' পাওয়া যায়—গোরক্ষ নাথ যখন মীননাথকে প্রবুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "কদলীর দেশে"গিয়াছিলেন তখন এক যোগী রমণী তাহাকে বিবাহ করিতে কৃত সংকল্প হইয়া তাহাকে সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল এবং গৃহস্থ-সম্মানের লোভ দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছিল।

"কাটিমু চিকণ সুতি তুম্মি হ বুনিবা ধুতি
রাটেনি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।
দিনে দিনে বেশ হইব সম্পদ বাড়িয়া জাব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি॥
তবে সে সমাজে যাইবা মদের ঘটি আগে পাইবা
কথা কহিবা দুই হাত লাড়ি।" (ইত্যাদি)
(পৃঃ—৬৬)

অপরদিকে সন্ন্যাসী নাথগণ চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন

করিয়া কায়া সাধনে তত্‌পর থাকিতেন। তাঁহারা বহু দেশ পর্য্যটন করিতেন, নাথ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং নাথ-সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের বেশ-পরিচ্ছদাদিও গৃহী যোগীগণের বেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তাঁহারা কৌপিন পরিতেন, পাঙ্কাই (পাদুকা) পায়ে ব্যবহার করিতেন। চক্র, নাদ, শেলী, বিংশতি, বিষ্টি, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কাঁধে সিদ্ধ ঝুলি ব্যবহার করিতেন ও হাতে ভাঙ্গা লাঠি ধরিতেন।

মীননাথ কদলীর দেশে উপস্থিত হইলে সেই দেশের রাণীদ্বয় তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কোন দেশে তোমার ঘর মাগি খাও নিরন্তর
কি কারণে না কর গৃহবাস।
এমত বাসর কালে না থাক রমণীর কোলে
অঙ্গে কেন পরিয়াছ ভস্ম॥
ভাঙ্গা কাঁথা ভাঙ্গা ঝুলি বেড়াও কাঁধেতে তুলি
এ সকল কিসের আন্তর।
হাতে কেন দণ্ড বাড়ি কর্ণে দিয়াছ কৌড়ি
নিরন্তর বঞ্চ একেশ্বর॥
(গোঃ বিঃ—২৬)

গোরক্ষনাথ তাহার গুরুর পতন ও দুরবস্থার খবর পাইয়া—"সিদ্ধ ঝুলি, মেখলি দিল গাএ। হাতে দণ্ড করিয়া পাঙ্কাই দিল পাএ॥" তারপর যম-মন্দির অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আবার গোরক্ষনাথ মীন রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুরবস্থা দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারের আশায় বলিলেন—

"মেখলি এড়িয়া পাইলা এরূপ নেহালি।
(কুটীর) আধাগি এড়িয়া পাইলা উয়ারি মেহারি॥
হোওকি এড়িয়া পাইলা কর্পূর তাম্বুল।
(মৃগাসন) ধোকরি এড়িয়া পাইলা কামিনীর কোল॥
চাপড়ী এড়িয়া পাইল' এ খাট বিছানা।
চক্র এড়িয়া পাইলা (গুরু) এড়ির কামান (?)॥
সোণার পাইলা বর্গ ভাঙ্গা লাঠি এড়ি।
রত্তন কাঞ্চন পাইলা এড়ি শঙ্খ কৌড়ি॥
ভাঙ্গা পাত্র এড়ি পাইলা সোবর্ণের থালা।
রুদ্রাক্ষ এড়িয়া পাইলা সোবর্ণের মালা॥
হস্তি ঘোড়া পাইলা গুরু পাইলা রাজ্য পাট।
গুরুর বচন সব করিলা উছাট॥" ইত্যাদি।

—এই স্থানে গৃহী ও সন্ন্যাসী যোগীর পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি বহু বিষয়ের পার্থক্যই বেশ পাশাপাশি বর্ণিত হইয়াছে তাই ইহার উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

নাথ-সন্ন্যাসীরা কর্ণ বিদ্ধ করিয়া স্ফটিক, নেওয়ার, গণ্ডারের শিং বা হাতীর দাতের এক প্রকার কর্ণভূষণ পড়িয়া থাকে—তাহাকে মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রা সম্বন্ধে জপজী বলেন :—"মুদ্রা সন্তোষ"।—অর্থাত্‌ নাথ যোগীদের মুদ্রা—সন্তোষ স্বরূপ। তাঁহারা যে মেখলা ধারণ করেন তাহার গূঢ়ার্থ "গগন"। বিষ্টি শব্দের প্রকৃত অর্থ নরক দণ্ড হইতে রক্ষার উপায়। কিঞ্চিত্‌ মাত্র প্রলোভনেই যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় বা জাগ্রত হয় তাহাকে জব্দ রাখিবার মানসে উহাদের কৌপীন ধারণ। কোন কোন উলঙ্গ সাধু তাম্র বা পিত্তল চক্রদ্বারা ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া রাখেন। ইহার নাম বিষ্টি। তাঁহারা ঊর্ণ নির্ম্মিত সেই সূত্র ধারণ করেন, তাহা—"শেলী"। তাঁহারা অঙ্গুলি পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার পদার্থ ধারণ করিয়া থাকেন তাহা নাদ নামে পরিচিত।

তাহাদের অনেকে নারিকেলের বা কাঁসার ভিক্ষাপাত্র লইয়া বেড়ান ; হোলির সময় ইঁহাদের গুরুগণ মাটীর ঘড়ায় অগ্নি রাখিয়া তাহা নিয়া ঘুড়িয়া বেড়ান—ইহাকে খর্পর বলে। তাঁহারা সাধারণতঃ ধুনী জ্বালিয়া রাখেন।

এই সম্প্রদায়ে কয়েকটী গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, ভৈরব ও বীর গোত্রের বলিয়া পরিচিত হন।

বর্ত্তমান সময়েও বহু যোগী জাতি এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। পাঞ্জাব প্রদেশে রোহতক জেলার মধ্যে দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে "বোহর" নামে একটী স্থান আছে;—সেখানে একটী প্রকাণ্ড মঠ আছে—শ্রীমন্ত নাথের সমাধি মন্দির। এখানে প্রায় ৫০০০ নাথ আছেন। মোহন্তজী উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক রাজার কুলগুরু। প্রায় ১০০ বৎসর যাবত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা-পঞ্চমী হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত একটী মেলা হয়। ওড়িষ্যায়ও অনেক নাথ আছেন। বাংলা দেশের নাথ সম্প্রদায় হইতে ইহাদের আচার ব্যবহার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ইহারা চিকিৎসক, জ্যোতিষীই বেশীর ভাগ, কেহ কেহ চাকুরীও করে।

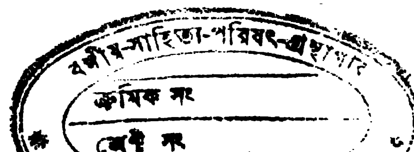
কাঠিয়াবাড়ের নাথেরা আপনাদিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয়, ধর্ম্মের নামে ভিক্ষা করে, দাঁতন, ঝাঁটা, নুন, ইন্ধন প্রভৃতি বিক্রয় করে, ভূত ঝাড়ে, সাপ ধরে ইত্যাদি। মৃত্যুতে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলে। ইহাদের বহু বিবাহের প্রথা আছে। পর্ত্তুগীজগণের সালসেট অধিকার কালে কানাড়ী (Kanchari) গুহায় প্রায় ৩,০০০ নাথের অবস্থিতি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে যে যোগীদের বাস তাহাদের আচরণ রত্নগিরির যোগীদের ন্যায়। কেহ কেহ বিবাহ করে, কেহ করে না। কানকাই যোগীগণ বীণা বাজাইয়া গোপীচাঁদের গান করে। ভোজনগার শিংরামণ্ডপে, ভোজের উত্তর-পশ্চিমে ধিনোধরে এবং বানদে মনকরা নামক স্থানে কানকাই যোগীদের তিনটী আস্তানা আছে। ধিনোধরের অবস্থা সবচেয়ে ভাল; তথাকার মঠাধিপতিকে "পার" বলে।

নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের দুইটী মন্দির আছে। ব্রহ্মনাথজী ও ভিকনাথজীর দুইটী আস্তানা আছে; জুনাগরে নাথদের খুব বড় মঠ আছে।

ব্রহ্ম দেশেও যোগী জাতির সংখ্যা নেহাত্ কম নয়। বোধহয় ৪৫০,০০০ রও অধিক। আবার ইহার দুই তৃতীয়াংশ পূর্ব্ববঙ্গে ও একভাগ মাত্র ব্রহ্মদেশে অন্যত্র বাস করে। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বহু যোগীর বাস। ইহারা হিন্দুদের অস্পৃশ্য ও অজল-চল। ইহারাও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের হাত ছাড়া আর কারো স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করে না। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছিল; এখন আবার ইহারা অনেকেই উপনীত হইয়া "দেবনাথ" উপাধি গ্রহণ করিতেছে এবং অশৌচাহ ব্রাহ্মণদের অনুরূপ করিতেছে।]

পূর্ব্বে তাঁত বোনাই ছিল ইহাদের বংশগত ব্যবসায় এখন অনেকে 'বাবুদের' দেখা দেখি শিক্ষিত হইয়া কেরাণীগিরির সুখ অনুভব করিতেছে। কম পক্ষে ৩০০ শতেরও অধিক গ্র্যাজুয়েট এই সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পেটের দায়ে কেহ কেহ অন্যান্য ব্যবসায়ের দিকেও অগ্রসর হইতেছে; কেহ পান বেঁচে, কেহ চুণ বেঁচে ইত্যাদি। কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান অতি নীচে এবং উপহাস করিয়া তাহাদিগকে "পানাতি যুগী", "চুণাতি যুগী", "হেলে যুগী" প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে অভিসিক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন সমাজে তাহারা অপাংক্তেয়। তাহারা যেরূপ শিক্ষা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রতীতি হইতেছে শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যে তখন তাহাদের এই সাম্প্রদায়িক বিশেষত্বের আর কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

তাহারা মৃত দেহের সৎকার করে সমাধিগর্ত্তে। গোলাকারে ৮ ফুট গভীর করিয়া সমাধি খনন করে এবং তলদেশে একটী কুলুঙ্গি কাটে। প্রথমে মৃতদেহকে সাত কলসী জলে স্নান করায়—তাহাদের ধারণা তাহাতে সপ্ত সমুদ্রে স্নানের পুণ্য সঞ্চিত হয়—পরে একখানা নূতন কাপড় পরাণ হয়। মুখে অগ্নিস্পর্শ করাইয়া শবের গলায় তুলসীমালা পরাইয়া ডান হাতে জপের মালা দেয়; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী মুড়িয়া ডান হাত বুকের উপর রাখে, বাঁ হাতটীও ঠিক সেইভাবে তৎসঙ্গে রক্ষিত হয়। মৃত দেহ পায়ের উপর পা দিয়া আসীন অবস্থায়—যোগাবস্থায়—উত্তর পশ্চিম মুখ করিয়া বসান হয়। স্কন্ধে ঝুলি দেওয়া হয় ও দেহ সমাহিত করা হয়। সমাধির



উপর বড় থালার চাউল, কলা, চিনি, ঘৃত, সুপারী, হুকা, তামাক, কাঠ কয়লা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা হয়। পরে তিনকড়া বা সাতকড়া কড়ি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দেয়—জমির মূল্য বাবদ।

এই সঙ্গে নাথ-সাহিত্য আলোচনা করার ইচ্ছাও দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ার সম্ভাবনায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। সময় ও সুযোগ পাইলে প্রবন্ধান্তরে উহা আলোচনা করিব।

শ্রীহরিপদ সেন গুপ্ত।

——(*)——

নিবেদন।

(সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)।

সমগ্র বীরভূমবাসীর পক্ষ হইতে সসম্ভ্রমে আমি আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। বীরভূমে সাহিত্য-সম্মিলন আহুত হওয়ার সংবাদ প্রথম যেদিন শুনিয়াছিলাম যুগপৎ আনন্দ এবং ভীতি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিন কিন্তু স্বপ্নেও একথা কল্পনা করিতে পারি নাই যে আপনাদের অভ্যর্থনায় প্রীতিপূর্ণ গুরুভার আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইবে। কিন্তু যে কল্পনাকে একদিন অন্তরের কোন নিভৃত কোণেও স্থান দিতে সাহসী হই নাই, কার্য্যক্ষেত্রে আজ সেই লোভনীয় গুরুভার অবনত শিরে বহন করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, নিজেকে অযোগ্য জানিয়াও যে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রথম কারণ—সমগ্র বীরভূমবাসীর আদেশ আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই, দ্বিতীয় কারণ—আপনাদের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইবার সুযোগ আমাকে প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করিয়াছে। ভরসা করি আমার অক্ষম অযোগ্যতা আপনাদের কৃপাপূর্ণ সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হইবে এবং অভ্যর্থনার সকল রকমের ত্রুটী বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া আপনারা আমাদিগকে ধন্য করিবেন।

দরিদ্র বীরভূমবাসী আজ দীনতার নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়াছে; গৃহে অন্ন নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, মনে বল নাই, এই রুগ্ন দেহ, ভগ্ন মন, নিরন্ন জনসাধারণের দীনতম আয়োজন যে আপনাদের অভ্যর্থনার উপযোগী হইবেনা ইহা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যে আমরা আপনাদের আমন্ত্রণে সাহসী হইয়াছিলাম সে শুধু প্রাণের প্রীতি ও অন্তরের অনুরাগে। সম্ভ্রমপূর্ণ চিত্তে, শ্রদ্ধানত হৃদয়ে আজ তাহাই লইয়া আপনাদের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। শক্তিহীনের যোড়শোপচার সংগ্রহের সামর্থ্য কোথায়? আমাদের যে তাহা কল্পনার বহির্ভূত—অনুকল্পে মানস পূজার যে যৎসামান্য উপকরণ নিবেদন করিতেছি, প্রসন্ন চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির সহায়ক হউন, বিনীতভাবে পুনঃ পুনঃ শুধু এই অনুরোধের জন্যই আমি আপনাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। নিতান্ত নিরুপায়ে বীরভূমবাসীর মনোনীত সেবকরূপে নিয়োজিত কর্ত্তব্যপালনে ইহাই আমার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হইয়াছে।

মনীষা ও মনস্বিতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ বীরভূমবাসীর ভাগ্যে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। যে মঙ্গলময়ের অলক্ষ্য ইঙ্গিতে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, আমাদের অদৃষ্টে আর কখনও এ শুভ সুযোগ আসিবে কিনা, একমাত্র, শুধু তিনিই তাহা বলিতে পারেন। প্রবীণগণের মুখে শুনিয়াছি, গৃহে অতিথি পূজোপকরণের প্রাচুর্য্য থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহাকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিবার সাধু প্রবৃত্তির অভাব যেন কখনও না ঘটে। আজিকার দিনে আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয়—প্রবৃত্তি থাকিলেও, যে রস ভাষার প্রাণ, আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সম্বর্দ্ধনা করিবার উপযোগী সেই সরস সুষ্ঠু ভাষাও আমি খুজিয়া পাইতেছি না। আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে বিস্ময়ে আনন্দে আমি কোন কথাই গুছাইয়া

বলিতে পারিতেছি না। আশা করি আমার এই অক্ষমতার ত্রুটীও আপনারা মার্জ্জনা করিবেন।

জননী জন্মভূমির গৌরব লইয়া—সন্তান—তা' সে যত হীনই হউক গর্ব্ব করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। বর্ত্তমানকে দেখিয়া অতীতের বিচার করা চলেনা। আজি না হয় বীরভূমি দুর্দ্দশাগ্রস্থ, আজি না হয় তাহার ঐশ্বর্য্যের মণি-দীপ্তি অন্তর্হিত হইয়াছে. কীর্ত্তি মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ধূলায় লুটাইয়াছে, বর্ণের প্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু চিরদিন তো এমন ছিল না? আমি সুদূর অতীতের কথা বলিতেছি না, সুরধুনীর তীরদেশ হইতে তমলুক পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ যখন একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিপুলায়তন বাণিজ্যপোত সমূহ বিদেশের বিপণী হইতে বিবিধ রত্নসম্ভার বহিয়া যেদিন তামলিপ্তির বন্দরে ফিরিয়া আসিত, সেই স্মরণাতীতকালের কাহিনী আজ স্বপ্নের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অনুত্তম গৌড় রাষ্ট্রের নিরূপমা রাঢ়া নগরীর গৌরব গাথা যেদিন কালাঞ্জরের রাজকবিকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইত, জয়দেব কেন্দুবিল্বের অনতি দক্ষিণে যে বিনাশপুরীর ধ্বংসাবশেষ ও রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির আজিও সেই অতীত গৌরব বক্ষে চাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে সহস্রাধিক বৎসরের সেই পুরাতন কাহিনী স্মরণে হা হুতাশের দিন বহুপূর্ব্বেই গত হইয়াছে। বীরভূমের বীরনগর, প্রাচী-কোট, মন্দার, লাভপুর, শ্যামারূপার গড়, প্রভৃতি পাল ও সেন রাজবংশের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ধ্বংসস্তুপের অশ্রু-বর্ষণের অধিকারও বোধ হয় আমরা হারাইয়াছি। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ রাজধানী লক্ষ্নূর—বীরভূমির রাজনগরের হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণের আদর্শস্থল—রাজা বাদিও-জমানের বার্ষিক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অনাথ আতুরকে বিলাইয়া দেওয়ার কাহিনীও হয়তো সঙ্কোচের সঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আর যাহা কিছু আছে—বীরভূমের সেই সাহিত্য-সম্পদের তুলনা কোথায়? জয়দেব চণ্ডীদাসের মত কবি আর কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? মালবের রসময়ী রাজধানী উজ্জয়িনী তাহার কালিদাসকে লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, কবি কালিদাস সমগ্র ভারতের বুঝিবা পৃথিবীরও গর্ব্বের সামগ্রী। কিন্তু তবুও তো তিনি রাজপিঞ্জরের শুক! আর আমাদের কবি চণ্ডীদাস অসীমের বক্ষে সন্তরণশীল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ—এই দরিদ্র দেশের, এই দীন জনসাধারণের, এই মরণাহত জাতির হৃদয়ের কবি চণ্ডীদাস মায়ের আদরের দুলাল—ব্রজদুলালীর মরমী কবি চণ্ডীদাস বীরভূমির কঙ্করাকীর্ণ উষর ভূমিতে নানুরের কুটীরে বিজনে বসিয়া তাঁহার মোহন বাঁশরীতে যে মধুগীতি ধ্বনিয়া তুলিয়াছিলেন, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, তেমন করিয়া পরাণ জুড়ানো গান আর কে কবে গাহিতে পারিয়াছে?

বীরভূমের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই যাহাকে বলে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস —সে ইতিহাস বীরভূমে কখনও গড়িয়া উঠিবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমার অগ্রজ প্রতিম হেতমপুরের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সহিত্যরত্নের আপ্রাণ যত্নে বীরভূমের যে দুইখানি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বীরভূমিকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পুর্ণ হইতে পারে না। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় যে উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ বীরভূমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তির আলোকচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে, যে সমস্ত ধ্বংসস্তুপের সন্ধান মিলিয়াছে, বীরভূমির সমৃদ্ধ অতীতের পরিচয় গৌরব হিসাবে তাহা বড় কম মূল্যবান নহে। বীরভূম বিবরণ হইতে বীরভূমে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু কৌতুহলো-দ্দীপক কাহিনী অবগত হইয়াছি। বীরভূমে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপ প্রবল ছিল, ধর্ম্মরাজের পূজা ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের পূজার বহুল প্রচার তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের অন্যতম সম্প্রদায় সরোয়াগী জাতি বীরভূমের নানাস্থানে অধুনা সরাক্ পরিচয়ে পরিচিত। শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের পীঠ তীর্থ নিচয় বক্রেশ্বর, নলহাটী, লাভপুর, কঙ্কালী, সাঁইথিয়া, রাখড়েশ্বর প্রভৃতি স্থান আজিও

তীর্থযাত্রিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অর্চ্চিত হয়। নাথপন্থীগণের অতুল কীর্ত্তি—তারা পীঠ—চীনাচার তন্ত্রোক্ত সিদ্ধাচার্য্য বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থল, বীরভূমের অতীত গৌরবের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদেরই বীরভূমের একচক্রা, বীরচন্দ্রপুর, "অভিন্ন গৌরাঙ্গতনু" অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি। বীরভূমির কেন্দুবিল্ব, ভাণ্ডীরবন, মঙ্গলডিহি, খয়াশোল প্রভৃতি স্থান বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভদ্রপুরের মহারাজা নন্দকুমারকে বা ঢেকা-বাড়ীর রাজা রামজীবনকে লইয়া গর্ব্ব করিবারও, বীরভূমের যথেষ্ট কারণ আছে।

বীরভূমের কুটীর শিল্প এক সময় দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আয়সবেদে ও নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের লৌহের কারখানায় কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইত। ইলামবাজারের গালা, কুখুটিয়ার চিনি, সুরুল গমুটিয়া প্রভৃতি স্থানের রেশম এই সেদিনও লোকে আদর করিয়া গ্রহণ করিত। কুটীর শিল্প প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়াছে। কেবল করিধ্যা, তাঁতি-পাড়া, প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী তসর এবং বসোয়া বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী আজিও রেশমের কারবার বেশ লোভ-জনকরূপেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরভূমের বর্ত্তমান অবস্থা যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। একেতো শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, তাহার উপর কৃষকগণের অবস্থাও নিরতিশয় শোচনীয়। বীরভূমে নিত্য আধিব্যাধি লাগিয়াই আছে। গত কয়েক বৎসরে বীরভূমের জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে এ সম্মিলনের আবাহন কেন? যত দিনভাবেই হউক শ্মশানে বাসরের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? আমার মনে হয়, আছে, এমনি শ্মশানেই এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বসাহিত্যের গতি কোন স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, ভারতের চিন্তাধারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য প্রচেষ্টার গতি কোন লক্ষ্যের অভিমুখী হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—প্রত্যেক বিভাগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য, যে জেলায় এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই জিলার আবহাওয়া বুঝিয়া, দেশের অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া তাহার অধিষ্ঠান ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন জাতি গঠন প্রায় অসম্ভব। বাঙ্গালার সাহিত্য যতদিন বাঙ্গালী জন সাধারণের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত না হইবে, ততদিন বাঙ্গলার জাতি-গঠনের আশা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। আমি অবশ্য বাঙ্গালাকে পিছাইয়া কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, বিপ্র পরশুরাম প্রভৃতির আমলে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহি না। রামপ্রসাদ, দাশুরায় ও নীলকণ্ঠের দিন আর ফিরিবেনা। কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রসার কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও আর চলিবে না। বাঙ্গলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, জনসাধারণকে তদুপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কার্য্য নিরতিশয় আয়াসসাধ্য—অতি বিরাট, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান—পরিষদকেই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাদের সম্মিলন হইতেই তাহার পরিচালনের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। এক এক বৎসর, এক এক জেলায় এইরূপ অনুষ্ঠানের সূচনা হইলে, ইহা ক্রমশঃ অনায়াস-সাধ্য হইয়া আসিতে পারে। জাতিকে আত্ম-নির্দ্ধারণ ও আত্ম-নিমন্ত্রণের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে, দেশব্যাপী সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কার ও ঈর্ষাদ্বেষ ভেদদ্বন্দ্বের ধ্বংসসাধন পূর্ব্বক ভাবোন্মাদনার উদ্বেলিত তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রাচীন-কালের প্রচার-পদ্ধতি গ্রহণ ভিন্ন ইহার দ্বিতীয় কোন সহজতর পন্থা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই প্রচার-পদ্ধতি বলিতে আমি কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতির বর্ত্তমান কালোপযোগী সুসংস্কৃত পর্য্যায়কে নির্দ্দেশ করিতেছি, সম্মিলনের অধিবেশন স্থানে প্রতি বৎসরেই গ্রাম্যগাথা ও

প্রবচন সংগ্রহ, প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতির ইতিহাস ও পূর্ব্বতন উপকরণ সংগ্রহ, উৎসব পর্ব্বাদির বিবরণ সংগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রস্তাব সম্মিলন হইতে অনুমোদিত হইয়া যায় শুনিতে পাই; কিন্তু তাহার পর সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেখানে কিকি কার্য্য হয়, আদৌ কোন কার্য্য হয় কি না, স্থানীয় বিবরণীর উপর নির্ভর না করিয়া প্রচারক পাঠাইয়া এই সমস্ত কার্য্য সংসাধন ও সম্পাদনে সাধ্যমত যত্ন লওয়া উচিত। তাহা হইলে সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয় না। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায় জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাহিত্যের উদারতর ক্ষেত্রই সে সাধনার একমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেপারে। পল্লীর সুপ্রসস্থ প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করিয়া দিতে পারে শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য এবং এইরূপ সম্মিলনই তাহার সম্ভাবনা সৃষ্টির প্রথম সোপান। এত কথা বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে—বাঙ্গলার সাহিত্য আজ যতই সমৃদ্ধ হউক, বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষার সুগম্ভীর বিপুল কলরব, আজিও তাহার স্রোতোবেগে তেমন উত্তাল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু একদিন তাহা সম্ভব হইয়াছিল এবং এই বীরভূমির পীযূষ-স্তন্যই তাহার উৎস জোগাইয়াছিল। সেই পুণ্য-কাহিনীর—বীরভূমের অতীত সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস আছে। প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে, অজয়ের তীরে, কেন্দুবিল্বের ললিত-কুঞ্জে যে মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, নান্নুরের মাঠে নিরঞ্জন পাতের কুটীরে সেই সুরে সুর মিলাইয়া কবি চণ্ডীদাস একদিন সমগ্র বাঙ্গালাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কবি জয়দেবকে লইয়া অনেকে অনেক রকমের আলোচনা করিয়াছেন—কেহ বলিয়াছেন অশ্লীল, কেহ বলিয়াছেন—আর কিছু—আমরা নীরবে শুনিয়াছি। প্রতি পৌষ সংক্রান্তির দিন আমরা বহু বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সঙ্গে মিলিয়া—হই না কেন আমরা অশিক্ষিত, হই না কেন আমরা তথাকথিত ইতর জনসাধারণ, তবুওতো আমরা বাঙ্গালার মানুষ, তবুওতো আমরা সংখ্যায় বিপুল! আমরাতো এই কবির উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি নিবেদন করিতে কেন্দুবিল্বে যাই। বাঙ্গালার এক সুবৃহৎ সম্প্রদায়—যে সম্প্রদায়ে দার্শনিক ভাবুক পণ্ডিত কবির অভাব নাই, যে গীতগোবিন্দকে তাঁহারা পূজা করিয়া থাকে, তাহার উপর অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিতে এই সমস্ত সমালোচকগণের মনে কি তিলার্দ্ধের জন্যও সঙ্কোচের উদয় হয় না? এই প্রায় বাঙ্গলা ছাড়া দেশে, সাঁওতাল পরগণার প্রান্তে, যে যক্ষের নিধি বক্ষে আঁকড়িয়া পড়িয়া আছি কেহ তাহার আদর করিলে যেন কৃতার্থতা লাভ করি। কচিৎ কোন পথভোলা পাথক এই পথে আসিয়া পড়িলে প্রাণে বড় আনন্দ হয়, মনে আপনা আপনি গুঞ্জন ধ্বনি উঠে—'তোমরা মোদের ভাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।' চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিতে পারা যায়। চণ্ডীদাসের নামে অনেকেই কাঁদিয়াছেন,সমালোচনা লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন; কিন্তু নান্নুরে পদার্পণের শুভাবসর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজিও করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

আমরা কথায় কথায় য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দিই,—য়ুরোপের অভিজ্ঞতা আমার নাই; তথাপি মনে হয়, য়ুরোপে হইলে বাঙ্গালার সাধারণ পল্লীর মত নান্নুর আজ দুর্দ্দশাগ্রস্থ পল্লীরূপে পরিচিত থাকিত না। নান্নুর আজ তীর্থ-গৌরবের অধিকারী হইত। অগণিত যাত্রীর শ্রদ্ধা চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, জাতির কবি-প্রতিভা অর্চনার নিদর্শনরূপে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীর বিজয় ঘোষণা করিত। কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—চণ্ডীদাসের গানে বাঙ্গলা মাতিয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের গান স্বাতীনক্ষত্রের বারিবিন্দুর মত জাতির অবনতশিরে পতিত হইয়া, যে দুইটী অমূল্য নিধি গড়িয়া তুলিয়াছিল, সুদীর্ঘ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরেও আজিও তাহার স্বর্গীয় দ্যুতি তেমনি সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মহিমাময় রহিয়াছে। যতকাল বাঙ্গালী বাঁচিবে, যতকাল বাঙ্গলা ভাষায় প্রবাহ বহিবে, নিতাই চৈতন্যের পুণ্যাবদান জাতীয় জয়যাত্রার পথে অটল আলোক-স্তম্ভের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

চণ্ডীদাসের পদানুসরণ করিয়া যে সমস্ত কবি ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাঁদরার কবি জ্ঞানদাস, ঝোঁক-লাইয়ের কবি জগদানন্দ, মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দ এবং পরিচয়হীনা মহিলা-কবি স্বর্ণলালীর নাম উল্লেখযোগ্য। বীরভূমি, মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জন্মভূমি। কাঁদরায় শিষ্য, ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ আজিও এই কীর্ত্তনের ধারা যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তনের প্রবল প্লাবন মন্দীভূত হইয়া আসিল, মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, জনসাধারণ নূতন কিছুর জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, তাহার কারণও ছিল। সমাজ-বক্ষে কোন নবভাবের তরঙ্গ উঠিলে, প্রাকৃতিক বিধানে পরিমিতকালের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধভাবের প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়; কিছুদিন দুইটী ভাব পাশাপাশি চলিতে চলিতে, পরে একটা সামঞ্জস্যে আসিয়া মিলিয়া যায়—ইহাই জগতের নিয়ম। মহাপ্রভুর ভাব বন্যায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অপর কারণ মনোহরসাহী কীর্ত্তনে নানা রাগরাগিনী জুড়িয়া যখন গরাণহাটীর সৃষ্টি হইল, পরে রেনেটী ও অপরাপর নানা শাখা প্রশাখার ঘূর্ণাবর্ত্তে রসের স্থানে কীর্ত্তন এবং ভাবের স্থানে ঢং আসিয়া আসন পাতিল—এদিকে নাম-কীর্ত্তন পুরাতন হইয়া আসিল, তখন জনসাধারণের রসপিপাসু চিত্ত কবির গানকে আসরে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাঢ় দেশে বৌদ্ধাচার্য্য নাড় পণ্ডিতের সমসময়ে যোগীপাল মহীপাল গীতের অনুরূপ যে ঝুমুর গান প্রচলিত ছিল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মৃদঙ্গ মন্দ্র যে সঙ্গীতকে কিছুদিনের জন্য লুপ্ত রাখিয়াছিল, পরিষদ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যে গীতি কথঞ্চিৎ ভদ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত রহিয়াছে, সেই ঝুমুর গানকে ভাঙ্গিয়া কবির গানের সৃষ্টি হইল। প্রথম প্রথম ইহা কতকটা ঝুমুরেই অবিকল নকলের মত ছিল—সেই দল বাঁধিয়া নৃত্য, সকলে মিলিয়া গান—তাই লোকে তাহাদের নাম দিয়াছেন 'দাঁড়া কবি'। বীরভূমে লালু নন্দলাল, রামজী দাস, রঘুনাথ দাসও ইহাদের সমসাময়িক কালু পাল ও ভরত প্রভৃতি কবিওয়ালার অনেকগুলি গান আবিষ্কৃত হইয়াছে। লালু নন্দলালের বহু গানে বীরভূমের এমন কয়েকটী অখ্যাত গ্রামের নাম আছে, যাহাতে তাহাকে বীরভূমের অধিবাসী বলিয়া অনুমান হয়। এই কয়জন কবিওয়ালার এতগুলি গান, আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বীরভূমের মল্লারপুর অঞ্চল ঝুমুর গানের জন্য প্রসিদ্ধ। লালু নন্দলালের শিষ্য বলহরি রায়, কৈলাসচন্দ্র ঘটক, শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি বীরভূমবাসী বহু কবিওয়ালার নাম পাওয়া গিয়াছে। লালু নন্দলালের পরবর্ত্তী সময়ে পরমানন্দ অধিকারী নামক একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন রামযাত্রার অনুকরণে কালীয় দমন যাত্রার সৃষ্টি করেন। অনেকের মতে পরমানন্দ অধিকারী বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারাই শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী। আমাদের নীলকণ্ঠ এই গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র। যাত্রাওয়ালাগণ ঝুমুরের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কালীয়দমন যাত্রার বাসুদেব কতকটা নাটকের সূত্রধারের কার্য্য করিলেও, ইহাকে ঝুমুরের অন্যতম সংস্করণ বলা যাইতে পারে। পরমানন্দ অধিকারীর দুইটী গান বীরভূমেই পাওয়া গিয়াছে।

বীরভূমে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়, অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। তাই দেখিতে পাই একদিকে নয়নানন্দ ঠাকুর যখন 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস কদম্ব' গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, অন্যদিকে কবি বিষ্ণুপাল সেই সময়ে 'মনসামঙ্গল' ও কবি গঙ্গানারায়ণ 'ভবানীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বেও কবি বিনোদরাম সেন ও ব্রজমোহন সেন, তাঁহাদের কবিবন্ধু পণ্ডিত বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া আপনাদের কবিপ্রাণের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে স্বর্গীয় বলরাম দাস গুপ্ত বি, এ, অকালে পরলোকগত দরিদ্র মুসলমান কবি—মহম্মদ আজিজ উস্‌-শোভান, বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 'ভুবনমোহিনী' প্রতিভার কবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

চণ্ডীদাস-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সঙ্কলনকর্ত্তা স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, ও স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম উচ্চারণে শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বীরভূমে সম্প্রতি প্রায় বিশজন নূতন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা এবং বহু বিবিধ সঙ্গীত রচয়িতার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বীরভূমে অধুনা চারিখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং একখানি মাসিক পত্র পরিচালিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিবাকর নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিবাকর এক সপ্তাহ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। দিবাকরের পরে প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, তখন প্রবাসী—এখন অধিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় বীরভূম-বার্ত্তা সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রচারিত হয়। মধ্যে বীরভূম-বাসী ও বীরভূম-হিতৈষীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বীরভূম-বার্ত্তা আজিও সমান উদ্যমে ভাল ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। আর তিন খানি সাপ্তাহিক পত্রের নাম বীরভূম-বাণী, রাঢ়-দীপিকা ও পল্লী-মঙ্গল। বাণীর সম্পাদক—যদুনাথ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় অকালে পরলোকগত না হইলে বাণী মফঃস্বলের একখানি আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিচিত হইতে পারিত। বর্ত্তমান সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে বাণী ক্রমে আশানুরূপ অবস্থায় উন্নত হইতেছে। রাঢ়-দীপিকা রামপুরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। দীপিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পরিচালন দক্ষতা প্রশংসনীয়। পল্লী-মঙ্গল দুবরাজপুর হইতে আজ কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বীরভূমি মাসিক পত্রের পরিচয় অনেকেই অবগত থাকা সম্ভব। কারণ ইহার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, মহাশয় সুপরিচিত ব্যক্তি। বীরভূমি একদিন কীর্ণাহারের সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান বীরভূমি তাহারই নব-পর্য্যায়।

বীরভূমে বর্ত্তমান সাহিত্য-চর্চ্চার উল্লেখ করিতে হইলে এমন অনেকের নাম করিতে হয়, যাঁহারা আমার অন্তরঙ্গের মধ্যে গণ্য। অন্তরঙ্গের প্রশংসা আমি আত্ম-প্রশংসার নামান্তর বলিয়া মনে করি। সুতরাং সে আলোচনায় বিরত রহিলাম। তথাপি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বহু পরিশ্রমে তিনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় চারি হাজার স্বর্গীয় সাহিত্যসেবীর জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি আজিও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমানে গৌরব করিবার কিছু নাই। অতীতের যে অবদান-পরম্পরার উল্লেখ করিলাম, তাহারও উত্তরাধিকারিত্বের দাবী আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হৃতসর্ব্বস্ব বীরভূমি সম্প্রতি এমন কিছু লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, যাহা সমগ্র বিশ্ব-বাসীর বিস্ময়-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত পুণ্যাশ্রম শান্তি-নিকেতনের উল্লেখে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বে এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধন-কুঞ্জরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা অধুনা বিশ্ব-পণ্ডিতগণের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের আরণ্যক-শাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক, জ্ঞানোপাসক ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ এই স্থানেই জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম তাঁহার পুণ্য অধিষ্ঠানে ধন্য হইয়াছিল, শেষদিনে তাঁহার চিতাভস্ম বক্ষে ধরিয়া তীর্থ-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বিশ্ব-বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রমেরই অধিবাসী। অতীতের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়া আমরা গৌরব করি কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে একদিন বাঙ্গলার সম্রাট লক্ষ্মণসেনের শুভাগমন হইয়াছিল। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন

দ্বারবঙ্গেশ্বর শিবসিংহ স্বীয় সভাকবি বিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া রায়ের কুটীরে আগমন করিয়া কবি-প্রতিভার মৃণ্ময়-ঘটে হৃদয়ের প্রীতি-চন্দন নিবেদনে ধন্য হইয়াছিলেন। আর আজ আমরা চক্ষে দেখিতেছি দেশের রাজবল্লভগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জ্ঞানী গুণী বঙ্গবাণীকে বন্দনা করিতে বীরভূমে শুভাগমন করিতেছেন। বোলপুর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা, নালন্দার স্মৃতিকে কালোপযোগী মূর্ত্তিদানের চেষ্টায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। "East is east, west is west twain shall never meet" Rudiard Kippling এর এই বাণী আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দের বিষয় শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীগণ পল্লীসংগঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীরে ধীরে এদেশের জনসাধারণের হৃদয় জয় করিতেছেন। শান্তিনিকেতনের বিপুলতর জ্ঞানভাণ্ডার শঙ্কিত-বীরভূমবাসী এতদিন বিস্মিত-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত মাত্র। আমাদের আয়ত্তের অসামর্থ্য ও নিকেতন-সংসদের তাহা সাধারণে বিলাইবার চেষ্টা-হীনতা এই দুইয়ে মিলিয়া স্থানটীকে বীরভূমের চক্ষে রূপকথার রাজপুরীর আকার দান করিয়াছিল। এতদিনে দেশকাল পাত্রানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কবি যে আমাদের জন্য নিকেতনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন তাহাতে বীরভূমবাসী কৃতার্থ হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কবির উদ্দেশ্য সফল হউক, শ্রীনিকেতনের চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। আমাদের জয়দেব চণ্ডীদাস নাই, কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ এই বীরভূমেই অবস্থিতি করেন॥

আমি বহুক্ষণ ধরিয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছি, চিরদুঃখী, চির অনাদৃত স্নেহ-বুভুক্ষুর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক যে এতটুকু প্রশ্রয় পাইলে জীবন-সঞ্চিত হৃদয়-বেদনা এক নিশ্বাসে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে চায়। কিন্তু সহিষ্ণুতার তো একটা সীমা আছে! আমাদের চিরদুঃখের কাহিনী শুনাইয়া আর আমি আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। আমাদের ব্যবস্থা সকলেই জানেন; জানিয়া শুনিয়া সকল কষ্টের অসুবিধার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আপনারা এখানে আসিয়াছেন। আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি—মৃণ্ময়ী শ্যামা সর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারভূতা চিন্ময়ীর চৈতন্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক। আমার দেশবাসী মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক। বিশ্বদেবের পদপ্রান্তে এই কামনা করিয়া আমাদের স্বর্গীয় কবি-বন্ধু অক্ষয় বড়ালের "শঙ্খে" প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমি মাকে আবাহন করিতেছি—

এস চণ্ডীদাস-গীতি শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি জয়দেব-ধ্বনি।
প্রতাপ কেদার বাঞ্ছা গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম জননী॥

ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় উত্থানে কাব্যের প্রভাব।

ফিন্‌ল্যাণ্ড এতদিন বিদেশীর নিকট একটা কল্প লোকেরই মত ছিল। স্যুমি (Suomi) দেশ—তার অসংখ্য গোলকধাঁধার মত ভ্রান্তি-উৎপাদক হ্রদ রজত শুভ্র বার্চবন-রাজী (Silver birch)—স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি কৃষক পল্লীর বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ—তাহার গ্রাম্যগাথা ও গীতি—বাহিরের লোকের কাছে কেমন একটা রহস্য মণ্ডিত বোধ হইত। তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বড় একটা খোঁজ খবর বাহিরের লোক রাখিত না॥ তাহার ভিতরের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা তেমন পরিচিত ছিলাম না। গত ইয়োরোপীয় মহাসমরের অবসানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ তাহাদের হারান স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে ফিনল্যাণ্ড তাহার মধ্যে অন্যতম। এই উপলক্ষে আজ ফিনল্যাণ্ড সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং কি করিয়া এই ক্ষুদ্র দেশ প্রবল রুসিয়ার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল তাহা লইয়া একটু আলোচনা দেখা যাইতেছে॥

ফিনল্যাণ্ডের ভৌগলিক অবস্থানই তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের প্রধান কারণ। ইহার এক দিকে রুসিয়া, অন্য দিকে সুইডেন। রুসিয়ার সহিত সুইডেনের যুদ্ধ বিগ্রহ সে যে কত শতাব্দি ধরিয়া চলিয়াছে,—আর এই দুই প্রবল শত্রুর মধ্যে পড়িয়া ফিনল্যাণ্ডকেও এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে কত না বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছে—যে যখন সুবিধা পাইয়াছে তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। তাই ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস হয় রুসিয়া, নয় সুইডেন, ইহাদের ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িত ছিল। রুসিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পিটার দি গ্রেট এর লোলুপ দৃষ্টি বরাবর ফিনল্যাণ্ডের উপর থাকিলেও ইহা অনেকদিন সুইডেনের অন্তর্ভুক্তই থাকে। যদিও ইহারা রাষ্ট্রীয় হিসাবে সুইডেনের অধীন ছিল তাহা হইলেও ফিনগণ কার্য্যতায় স্বাধীন ছিল। নিজেদের শাসন সংরক্ষণ নিজেরাই করিত। সুইডিস গবর্ণমেন্ট ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করিত না। অবশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার সহিত সুইডেনের শেষ যে সন্ধি স্থাপন হয় তাহাতে ফিনল্যাণ্ড রুষিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। Tsar Alexander I স্বাধীনতাপ্রিয় ফিনজাতিকে বিজিত ভাবে গ্রহণ করিলেন না বা তাহাদের দেশকে রুষিয়া সাম্রাজ্যের স্বৈর শাসনাধীন করিলেন না, তিনি তাহাদিগকে এই অভয় বাণীর সহিত গ্রহণ করিলেন যে রুষিয়ার সহিত তাহাদিগের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তাহাতে ফিনল্যাণ্ড তাহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষণ করিয়া চলিবে—দুই জাতির মিলন পরস্পরের ভাবি মঙ্গলের কারণ হইবে। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তিনি ফিনল্যাণ্ডকে একটি স্বতন্ত্র গ্রাণ্ডডাচি (Grand duchy) করিয়া স্বয়ং তাহার Grand Duke হইলেন, শাসনপ্রণালী আইন-কানুন পরিচালনের জন্য ফিনল্যাণ্ডীয় একটি শাসন পরিষদ (Senate) গঠন করিলেন; কেবল তাহাদের রাজধানী হেলসিংফোর্স'এ তাঁহার মনোনীত একজন গভর্ণর জেনা-রেলকে রাখিলেন। তাহারা নামতঃ রুষিয়ার অধীন হইলেও কার্য্যতঃ অনেকটা স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশের মতন স্বায়ত্ব শাসন পরিচালনা করিতে লাগিল। Tsar Alexander I এর উদ্দেশ্য ছিল মহান্, যেন ফিনগণ মনে না করিতে পারে যে তাহারা পরাজিত জাতি। কিন্তু অন্যের অনুগ্রহের উপর যে স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহার স্থায়িত্ব কত দিন? তাঁহার পরবর্ত্তী Tsar Alexander II তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদারনীতি অনুসরণ করিয়াই চলিলেন, বরং তাঁহার মনের ভাব এই থাকিল যে এখানে যে সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের পরীক্ষা হইতেছে তাহার দৃষ্টান্তেই রুসিয়া সাম্রাজ্যের অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবেন। তৃতীয় জার আলেকজেণ্ডারও সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঘোষণা করিলেন যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গণের প্রদত্ত Constitution-শাসন প্রণালী মান্য করিয়া চলিবেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে প্রজার স্বাধীনতার পরিপন্থী বুরোক্রাসীর যে প্রবল আন্দোলন ইতিহাসে Slavophil movement * নামে আখ্যা পাইয়াছে—এই প্রতিক্রিয়ার আন্দোলনে ফিনগণকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। রাজার যিনি শিক্ষক ছিলেন—Pobiedonostsev—তিনি এই আন্দোলনের একজনের প্রধান নেতা হইলেন। রাজার উপর তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। ইঁহাদের motto হইল one law, one church, one tongue, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, এমনকি বর্ত্তমান রাজার নিজের ঘোষণা সব অগ্রাহ্য করিয়া ব্যুরোক্রসি দল ফিনল্যাণ্ডদেশকে তাহাদের যথেচ্ছশাসনে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

---

* Slavophilism কথাটা বুঝাইয়া বলা একটু কঠিন। এ এমন একটা জাতীয়তার দাবী যাহা কোন না কোন ভাবে অনেক গর্ব্বিত ও উদ্ধত জাতির মধ্যেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—যেমন ইংলণ্ডের Jingoism, ফ্রান্সের Chauvinism, ইটালীর Irredentism, জার্ম্মাণির Kulture, মুসলমানের Pan-Islamism, তেমনি রুসিয়ার Pan-Slavism বা Slavophilism.

* *
*

এই আন্দোলনের এই একটি শুফল ফলিল যে ইহার পূর্ব্বে ফিনল্যাণ্ডের রাজনৈতিকদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। সুইডস্ পার্টি এবং ফিনিস্ ন্যাসন্যালিষ্ট পার্টি; এই দুই দলে যে অন্তঃর্কলহ চলিতে ছিল—সুইডিস্ ভাষা কি ফিনিস্ ভাষা কোন্ ভাষা ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা হইবে, স্বাধীনতার এই আসন্ন বিপদে তাহার সমাধান হইয়া গেল। তাহারা এই সকল দ্বন্দ্ব কলহ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের জাতীয় ফিনিস্ ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্য সাধনে যত্নবান্ হইল। এই ভাবে কিছুদিন চলিয়া গেল; এমন সময় ফিনল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য গগণে Nicholas II রুসিয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র-ভাব ধারণ করিল। তিনি ফিন্‌দিগের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিবার জন্ত এক হুকুম জারী করিলেন। ইতিহাসে ইহাকে Russification of Finland বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সাধতঃ রুসিয়ার অধীন দেশগুলিকে রুসিয়ার ভাব ভাষা আচার ব্যবহার রীতিনীতি অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে রুসিয়ার ভাবে ও তাহাদের সভ্যতায় অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে হইলেও কার্য্যতঃ ইহার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের স্বাধীনতা এবং নিজ-স্ব যে সভ্যতা (Culture) ও স্ব-ভাব তাহা একেবারে বিলুপ্ত করা। জার নিকোলাসের যে ঘোষনা পত্র February manifesto (1899) নামে ইতিহাসে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছে এই ঘোষণা পত্রে তিনি তাহাদের স্বায়ত্ব শাসন লোপ করিলেন; Finish constitution এবং তাহাদের Diet তুলিয়া দিয়া কলমের এক খোঁচায় ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রুসিয়া সাম্রাজ্যের একটি বিভাগে পরিণত করিলেন। রুসিয়ার স্বৈরশাসন প্রণালী ও রুষিয়ান্ রাজপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়ার ভাষা জোর করিয়া ফিনদের ভিতর প্রচলন করিবার চেষ্টা করিলেন। দেশে ঘোর অশান্তি আরম্ভ হইল। সংবাদ পত্র দিন দিন বন্ধ হইতে লাগিল। স্বাধীনভাবে চিন্তা বা বক্তৃতা করার অধিকার লোপ পাইল। সভা সমিতি বন্ধ হইল। এমন কি সামাজিক আন্দোলন পর্য্যন্ত কঠোর নিয়মের অধীন করা হইল। গুপ্তচর দেশ ছাইয়া ফেলিল। কোন বিষয়েই রাজপুরুষদিগের কঠোর দৃষ্টি এড়াইবার উপায় নাই। কত-লোক অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার হইতে লাগিল; কতলোক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ; কতলোক নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল; এবং কতলোকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। তাহাদের জাতীয় জীবনের একটা দিক কেবল রাজপুরুষদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে থাকিয়া গেল সে তাহাদের কাব্য ও গ্রাম্য কবিতা। এই কাব্য ও কবিতা ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন গঠন ও স্বাধীনতা লাভে যে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল সে বড়ই সুন্দর কাহিনী। সম্প্রতি ষ্টকহলমের Nordisk Tidskrift নামক একখানি পত্রিকায় Mr. Soderhjelm এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

* *
*

ফিনদের জাতীয় জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে তাহা-দের জন্মভূমী তাহাদের নিকট চিরদিনই বড়ই গৌরব-মুকুটোজ্জ্বলা—তাহাদের অতীত তাহাদের নিকট বড়ই গরিমাময়। তাই প্রবল রুসিয়ার সংঘর্ষে আসিয়াও তাহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তাহাদের জাতীয় Culture, শিল্প বাণিজ্য, সামাজিক রীতিনীতি কোন বিষয়েই তাহাদের আভিজাত্যের দর্প একদিনের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা কখনও রুসিয়ার দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাকায় নাই বা রুসিয়াকে জানিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তাহাদের রাজধানী হেলসিংফোর্স পেট্রোগ্রাড হইতে রেলে বার ঘণ্টার পথ, অথচ তাহারা রুষিয়ার কিছুই জানেনা, জানিতে চাহেও না। তাহারাযেমন নিজেদের Finish 'culture' বলিয়া গর্ব্ব করিত তেমনি Russian 'barbarism' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিত। এই স্থানে স্যালিয়ার ন্যাশন্যালিষ্ট সুহৃৎ

(Kossuth) এবং সার্ভিয়ার প্রতিনিধির কথোপকথন মনে পড়ে। কস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—নেশন কি? সার্ভিয়ান উত্তর করিল, নেশন বলিতে বুঝি একটা স্বতন্ত্র জাতি—যে জাতির ভাষা আছে, বিশিষ্ট সভ্যতা আছে, যাহার আচার ব্যবহার ভাব চিন্তা সব তার ভিতরেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্ত সর্ব্বদা জাগ্রত প্রচেষ্টা আছে।

* * *

পরাধীনতায় কখন জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তি হয় না। সুইডেন যতই কেন স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার প্রদান না করুক ইহা ফিনদের জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের অন্তরায় ছিল। আমাদের দেশে যেমন সেদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করিতেন ফিনল্যাণ্ডের কবিরাও পূর্ব্বে তেমনি সুইডিস ভাষায় কবিতা লিখিতেন তাহা না হইলে তাহার বহুলপ্রচার ও সম্মান হইত না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অর্থাৎ ফিনিস ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং তাহার শেষ পাদে একদিকে যেমন সুইডিস ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা কমিতে থাকে অন্ত দিকে তেমনি জন সাধারণের ভিতর জাতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের প্রচলন সেই পরিমাণে বাড়িতে থাক। ফিনগণ ভাবপ্রবণ—তাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাদের এই ভাবপ্রবনতার আনুকূল্য করিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে প্রকৃতিক উপাসক ছিল—তাহারা বায়ুর দেবতা (Ukko), বনদেবতা (Tapio) জলদেবতা (Ahti) র পূজা করিত। কবিতা এবং ভাব সাহিত্যই তাহাদের প্রাণ। আর ইহাদের সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব এই যে ইহার অনেক লেখকই সাধারণ শ্রেণীর লোক। অনেক কবিই Peasant poets গ্রাম্য কবি। Lounrot তাঁহার Kalewalaয় যে সকল জাতীয় কাব্য ও গাথা সংকলন করিয়াছেন তাহার প্রধান দুইজন কবিই গ্রাম্য কবি—কৃষক শ্রেণীর, এবং তাঁহার এই চয়নিকায় আঠার জন পল্লী কবি জনার রচিত কবিতা সন্নিবেশিত আছে। ভাব সাহিত্যের লেখকদের মধ্যেও অনেকেই পল্লীর অতি সাধারণ শ্রেণীর— Alexis Stenwall (১৮৩৪—৭২) একজন পাড়া গেঁয়ে দরজীর ছেলে, অথচ তাঁর সময়ের তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি। প্রথম মামজাদা ঔপন্যাসিক Pietari Paivarinta সামান্ত একজন মজুরের ছেলে। বর্ত্তমান সময়ের নাম জাদা লেখকগণ কেহ গাড়োয়ান, কেহ কৃষক, কেহ কামার, কেহ বনের পাহারাদার (Game keeper)। সাহিত্য সাধনা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। তাদের কবি ও গাথা লেখকগণ অধিকাংশই পল্লী বাসী—পল্লীর সরল মাধুর্য্যে তাহারা ভরপুর, পল্লীর স্নেহ সুধায় দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে তাহারা লালিত পালিত, তাই তাহাদের কবিতাও এমন সহজ সুন্দর তাহাতে কোনরূপ কৃত্রিম সভ্যতার আবিলতা নাই। তাহারা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আসনলাভের জন্ত উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে নাই। তাহাদের এই সহজ সরল কবিতা ও কাব্যের গতি ভূগর্ভস্থ স্বতঃ উৎসারিত ঝরণার ধারায় মত লোক চক্ষুর অন্তরালে সমাজের সাধারণ স্তরের ভিতর অনাবিল গতিতে প্রবাহিত হইয়া তাহার পূতঃ-সঞ্জীবনী ধারায় দেশের যেখানে প্রকৃত প্রাণ সেখানে তাহাকে সতেজও সজীব করিয়া তুলিল।

* * *

আমি উপরে ফিনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব ইতিহাস যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রচলিত ইংরেজী ইতিহাসের কথা। কিন্তু Soderhjelm যাহা লিখিয়াছেন সে অন্ত ধরণের কথা। ইহা পড়িলে মনে হয় সাধারণতঃ আমরা ফিনল্যাণ্ডের যে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাহা রুসিয়ার সরকারী রেকর্ডের কথা, তাহা ভুক্ত ভোগী দেশবাসীর কথা নয়, এ যেন আমাদেরই দুর্ভাগা দেশের রাজপুরুষদের লিখিত ইতিহাসের মত। তাঁহার কথায় মনে হয় Tsar Alexander I ফিনল্যাণ্ড-বাসীগণের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া যে অভয় বাণী ঘোষণা করিয়া ছিলেন হয়তঃ তাঁহার আমলা তন্ত্রের চক্রান্তে তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

তিনি ফিনল্যাণ্ডের জন্ত একটা শাসন পরিষদ Senate গঠিত করিয়া তাহার গবর্ণর জেনারেল নিজে মনোনীত করিলেন। ইহা ফিন-গণের মনঃপূত হইল না। ইহার জন্ত তাহাদিগকে যথেষ্ট লড়িতে হইয়াছিল। যখন আন্দোলনের মাত্রা এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ইহার স্রোত আর রোধ করা যায় না এবং রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারিলেন যে এ জাতি নিরস্ত হইবার নহে তখন ১৮৬৩ সনে অর্থাৎ ৫৬ বছর পর জার দ্বিতীয় আলেকজ্যাণ্ডারের সময় তাহাদের পূর্ব্ব শাসন পরিষদ Diet আহূত হইল। কিন্তু ব্যুরোক্রাসি দলের তলে তলে চেষ্টা থাকিল তাহাদের বাঁধন শক্ত করা।

দীর্ঘকালের আশা ও নিরাশায় ফিনগণ ক্রমে হতাশ হইতে লাগিল। এই সময় কবিতাই তাহাদের জাতীয় জাগরণে প্রকৃত সাহায্য করিল। রুসিয়া সম্রাজ্য বিশাল বিস্তীর্ণ কিন্তু তাহার জন-সাধারণের ভিতর শিক্ষার আলোক তেমন প্রবেশ করিতে পারে নাই—তাহারা কবিতার সৌন্দর্য্য ও তার মাহাত্ম্য বোঝে না—রাজপুরুষেরা যাঁহারা ফিনল্যাণ্ডকে রুসিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টিত হইলেন এ ভাব রাজ্যের সন্ধান তাঁহারা জানেন না—কবিতা যে একটা দেশের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে এমন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না—কাজেই এ দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল না।

যখন রাজাদেশে সভাসমিতি সংবাদ পত্র ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ প্রায় কবিগণ তাহাদের কবিতা দ্বারা স্বদেশ হিতৈষিতা ও স্বাধীনতার দীপশিখা পল্লীর ঘরে ঘরে সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে জ্বালাইয়া রাখিল।

Runeberg, Cygnæres, Topelius, এবং অন্যান্য কবিদের লেখনীতে প্রত্যেক ফিনের হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল—এবং তাহারা নূতন আশা ও উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। Runeberg এর রচিত Vart Land (আমার দেশ) তাহাদের জাতীয় "বন্দে মাতরম" হইল। একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে ফিনল্যাণ্ডের বিপ্লব যেমন রুসিয়া হইতে আসিয়াছে—তাহার মঙ্গলও তেমনি রুসিয়া হইতেই হইয়াছে।

* * *

রুষ জাপান যুদ্ধের পরাজয় ফলে দেশব্যাপী যে অরাজকতার সূত্রপাত হয়—সেই সুযোগে ১৯০৫ সনে ফিনগণ তাহাদের পূর্ব্বের শাসন প্রণালী পুনরায় ফিরিয়া পাইল—অনেকদিন পর তাহাদের শাসন পরিষদ Diet আবার আহূত হইল, মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা সমিতির অধ্যাহত অধিকার তাহারা আবার ফিরিয়া পাইল। পল্লীর কৃষক এবং কর্ম্মজীবী কবিগণের প্রভাবে তাদের ছাঁচে নূতন যে Diet গঠিত হইল তাহাতে আভিজাত্যের দাবী নাই—উচ্চ নীচ ভিন্ন ভিন্ন চারি শ্রেণী বিভাগ নাই—এবং জনসাধারণের যে পরিষদ গঠিত হইল তাহাতে স্ত্রী পুরুষ ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইল। আর এই স্বাধীনতার যুদ্ধের পূর্ণ সফলতা হইল—ইয়োরোপীয় মহা সমরের অবসানে। আজ ফিনল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

রোহিণী চরিত্র।

বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণকান্তের উইলে একটা সামাজিক চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ও স্বাভাবিক রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যে 'রোহিণী চরিত্রটা' তিনি বোধ হয় খুব সুন্দর করিয়া গড়িতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ লেখকের রোহিণীর উপর একটা জাত ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভাব। বঙ্কিম বাবু একটা biassed notion এর বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে রোহিণীর চরিত্র এমন ভাবে গড়িয়াছেন যাহা মোটেই সঙ্গত বা স্বাভাবিক নয়।

রোহিণীর চরিত্র অবশ্য পরিবেশে খুবই খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই সে খারাপ ছিল না। এবং সামাজিক শাসনে রোহিণী শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইলেও বিশ্ব মানবতার (Humanitarian point of view) দিক দিয়া উহাকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। যে সমাজের এমন একটা শক্তি নাই যাহাতে একটা লোকের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, যে সমাজ একজনের পতন অবশ্যম্ভাবি জানিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প নয়—শুধু শাসন দণ্ডেই নিস্পেষিত করিতে পারে, সে সমাজের শাসন গণ্ডিতে আবদ্ধ হওয়াও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। তাই আজ আমরা রোহিণীকে বিচার করিব সামাজিক হিসাবে নয়—বিশ্বমানবতার দিক্ দিয়া।

সামাজিক হিসাবে দেখিতে গেলে রোহিণী সর্ব্বতোভাবে দোষী—তা'র চাল চলন, তা'র হাব ভাব, তার কথাবার্ত্তা সমস্তই দোষপূর্ণ। সমাজ কোন দিনও অগ্রসর হইয়া যায় নাই রোহিণীকে উদ্ধার করিতে যখন তা'র তিলে তিলে পতন হইতেছিল। সমাজ কখনও রোহিণীকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় নাই তার উচ্ছৃঙ্খলতা। সে চিরদিনই সাহায্য করিয়াছে আধ-মরা রোহিণীকে মারিয়া ফেলিতে। পালন করাতো দূরের কথা সমাজ সর্ব্বদাই আসে শুধু শাসন করিতে—যে শাসনে বাঁচন মরণ সমস্যা!

রোহিণী বাল-বিধবা। পিতামাতা বা অন্য কোনও আত্মীয় স্বজন না থাকায় সে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের বাড়ী থাকিত। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর দূর সম্পর্কীয় এক কাকা। তাহার চরিত্রও আবার বিশেষ ভাল ছিল না। কারণ যখন হরলাল ব্রহ্মানন্দকে জাল উইল লিখিবার জন্য অনুরোধ করে এবং বহু অর্থ উৎকোচ স্বরূপ দান করিতে চায় তখন ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিল—"ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হরলাল—"পুঁজি করিও, দশটাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।" ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে ব্রহ্মানন্দের চরিত্রেও একটু গোল আছে।

এদিকে সংসারে এমন কেহ ছিলনা যে রোহিণীকে দুটো ভাল কথা কহিতে পারে, সংযম শিক্ষা দেয় বা অন্যায় করিলে শাসন করিতে যত্নপর হয়। ছোটকাল হইতে রোহিণী লোকের তাচ্ছিল্যে ও অবজ্ঞায় বাড়িয়াছে—কেউ ছিলনা যে তাহাকে চিত্ত সংযমী হইতে সাহায্য করে। রোহিণী অতি রূপসী যৌবন তার পরিপূর্ণ, শিশুকালে স্বামী মরিয়াছে, সুতরাং যৌবন সুলভ বৃত্তিগুলি তাহার মধ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। মাধবী লতিকা যৌবনেই আশ্রয় বিহীন—সহকার তরু খোঁজাতো তার স্বাভাবিক। যৌবনের উদ্দাম বাসনা রোহিণীর মনকে অত্যন্ত অসংযত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কোথায়ও সে বাসনা চরিতার্থ না করিতে পারিয়া তাহার লালসা বৃত্তি ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে পুষ্ট হইতেছিল। ওদিকে পৃথিবীতে তার যে একমাত্র আত্মীয় ব্রহ্মানন্দ সে-ও রোহিণী সম্বন্ধে কোনও খেয়াল করিতনা। জীবনের কোন অধ্যায়েই রোহিণী কিছুমাত্র শিক্ষা পায় নাই—তাই সকল দিকে অনাদৃত হইয়া মূর্খ রোহিণীর পক্ষে চিত্ত সংযত করা কি সোজা কথা! তা'রপর বিধবা রোহিণীর আচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাও ছিল অনেকটা কম। সে বিধবা হইলেও কাল-পেড়ে ধুতি পড়িত, হাতে চুড়ি পড়িত এবং পান ও দুখি খাইত'।

সুতরাং কঠোর সংযম, রোহিণী কি আচার ব্যবহারে অথবা মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে কোন দিনই শিক্ষা করিবার অবকাশ পায় নাই। তাই একজন অবলা অশিক্ষিতা অভিভাবক বিহীনা যুবতীর পক্ষে হাজার প্রলোভনের মধ্যে ঠিক থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়। জীবনে যাহার কোনই উচ্চ আদর্শ নাই, যাহাকে কোনদিন কেউ ব্রহ্মচর্য্যের বাণী শোনায় নাই তাহার পক্ষে পতন কি অস্বাভাবিক? রোহিণীতো ভগবানের অবতার হয়ে জন্মায় নাই—সুতরাং তা'র কাছে অমানুষিক একটু চাইতে গেলে চলিবে কেন।

রোহিণীর ভিতরে ভিতরে যৌবন লালসা বাড়িতে ছিল। এই লালসাগিতে প্রথম ইন্ধন জুটাইল হরলাল। হরলাল রোহিণীকে একবার বিপদ হইতে উদ্ধার করে এবং তার

প্রতিদান স্বরূপ সে চাহিল রোহিণীর পতন। হরলাল যখন আসল উইল পরিবর্তন করিয়া রোহিণীকে জাল উইল রাখিতে অনুরোধ করে, তখন রোহিণী যে উত্তর দিয়াছিল তাহাতে উহার চরিত্র বিশদরূপে ফুটিয়া উঠে। রোহিণীকে উইল চুরি করিতে বলিলে সে বলিল—"চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না। আর যা বলুন সব পারিব। মরিতে বলুন মরিব কিন্তু এ বিশ্বাস ঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল—"হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নেও * *

রোহিণী—"টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম!"

রোহিণীর এই উক্তিতেই বোঝা যায় যে তার মনুষ্যত্ব কতদূর। অর্থ তার লোভের কারণ হইতে পারিল না। সে সব করিতে পারে, মরিতে বলিলে মরিতেও পারে, কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকের বা চোরের কাজ করিতে পারে না। কারণ নারীর সর্ব্বস্ব যে লজ্জা ও ইজ্জৎ।

কিন্তু যখন হরলাল বিধবা বিবাহের কথা বলিল এবং রোহিণীকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন রোহিণী দেবীর চির পোষিত বাসনার স্রোত প্রবল বেগে বাড়িয়া গেল-চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল যৌবনের উদয়ে লালসার গতি কূল ছাপাইয়া উপ্‌চাইয়া পড়িল; রোহিণীর এতকালের চিত্ত সংযম কোথায় উড়িয়া গেল! সেই মানিনী রোহিণী অবশেষে স্বীকার করিল উইল চুরি করিবে। কিন্তু সে স্বীকৃত হইল কেন? নারীর সত্ত্ব ত্যাগ করিতে প্রয়াস পেল কেন! টাকার লোভে নয়, শুধু তার প্রেম পিপাসা মিটাইবার জন্য, হরলালকে পাইবার জন্য। প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য চুরি করিতে যাওয়াটা অবৈধ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রেমের কষ্টি পাথরে রোহিণীর ভালবাসার দাগ উজ্জ্বল হইয়াই পড়িবে।

সামাজিক হিসাবেও রোহিণী আজ দোষী হইতনা যদি ভগবান তাকে পুরুষ করিয়া গড়িতেন। রোহিণীকে পতিতা বলিতে সকলেই সাহস করিবে, কিন্তু 'রোহিণী কান্তকে' কেউ ভ্রূকুটি করিতে আসিবেনা। তাই বলি রোহিণী বিশ্বমানবতার দিক্ দিয়া নির্দোষ, রোহিণীর অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে সে যাহা করিয়াছে সমস্তই স্বাভাবিক। তার কার্য্যকলাপে দুঃখ বা সহানুভূতি হইতে পারে, কিন্তু রোষবিস্ফারিত লোচনে শরীরের সবখানি শক্তি লইয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিবার কারো অধিকার নাই।

তারপর যখন রোহিণী উইল বদল করিয়া হরলালকে উহা প্রদান করিল এবং অনেকখানি আশা বুকে বাঁধিয়া তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলিল তখন নিতান্ত আত্ম-মর্য্যাদা স্থাপনে হরলাল একেবারে অমত করিয়া বসিল। যে হরলাল রোহিণীকে বুঝাইয়াছে যে বিধবা বিবাহ আইন-সঙ্গত, উহাতে কোনও দোষ নাই—যে হরলাল একজন নিরাশ্রয়া বাল-বিধবার সযত্নে রক্ষিত বাসনার বেগ অনায়াসে বাঁধন-হারা করিয়া দিল, সে হরলাল কিনা দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি যা-ই হই কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিবনা।" এমনতর পিতৃগৌরবের স্পর্দ্ধা লইয়া হরলালের নিশ্চয়ই সমাজের ভিতরে স্থান হইবে—কিন্তু অভাগিনী রোহিণীর নিকট সমাজের সিংহদ্বার চিরকালের তরে রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। সারাটা জীবন ভরিয়া এখন শুধু তার ভোগ করিতে হইবে দুনিয়ার লোকের নিষ্ঠুর কষাঘাত। হরলালের এই ব্যবহারে রোহিণী জ্বলিয়া গেল। রাগে, ক্ষোভে ও হিংসায়, অপমানে ও লজ্জায় সে মরিয়া গেল। তার চিরকাল পোষিত উচ্ছৃঙ্খল যৌবন বৃত্তির বাঁধ খুলিয়া গেল। হরলালের নিকট প্রথমেই এরূপ মর্ম্মান্তিক বাধা পাইয়া উহার গতি আরও দ্বিগুন বেগে বাড়িয়া গেল। সুপ্ত যে প্রবৃত্তিগুলি তা' আজ এই বিরাট বাধা পাইয়া পূর্ণবেগে জাগিয়া উঠিল। রোহিণীর হিতাহিত জ্ঞান উড়িয়া গেল—বল্‌গা বিহীন অশ্বের মতিই বুঝি তা'র আজ কাম্য। বাসনা চরিতার্থ করে এমন রোহিণীর অঙ্গ কোনও শিকার নিতান্তই প্রয়োজন হইল।

ধীরে ধীরে রোহিণীর বিরহ যাতনা স্ফূর্তি পাইতে চলিল; বসন্তের কোকিল, গ্রামের ভাগ্যবতী যুবতীদের অফুরন্ত ভাগ্য,

ও নিজের অসীম রূপ লাবণ্য এবং কামের উদ্দাম তাড়না তার বিরহসন্তপ্ত চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। ঘটনা পরম্পরায় রোহিণীর চিত্ত-বিকৃতি স্বাভাবিক, সমাজ রোহিণীকে দোষী করিলেও এ ক্ষেত্রে হরলাল সর্ব্বাপেক্ষা দোষী।

রোহিণীর বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বশে আনিতে হইলে চাই এখন একটা সুদৃঢ় আশ্রয়—এবং সেই আশ্রয়ের খোঁজে তার মন আজ উধাও। বারুনীতীরে গোবিন্দলালের সুঠাম অবয়ব দেখিয়া রোহিণীর চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথনে উহার হৃদয়ে প্রেমের রেখা ফুটিয়া উঠিল। রোহিণী গোবিন্দলালকে সত্যই ভালবাসিয়া ফেলিল। ছোটকাল অবধি গোবিন্দলালকে দেখিয়াও কোনদিন রোহিণীর কোন চিত্তবৈকল্য হয় নাই কিন্তু আজ উহার কেন এইরূপ হইল। মুগ্ধা রোহিণী চির পরিচিত গোবিন্দলালকে দেখিয়া আজ নূতন করিয়া মুগ্ধ হইল কেন ?

এ ক্ষেত্রে রোহিণীকে কি দোষ দেওয়া যায় ? নিতান্ত স্বাভাবিক যা' রোহিণীর পক্ষে তাতে আর এমন দোষনীয় কি আছে ? আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর ভালবাসাটা যথার্থ কিনা। যদি সেটা নিছক প্রেম হয় তবে রোহিণীকে দোষ দেওয়া অন্যায় হইবে।

কিন্তু রোহিণী প্রকৃত পক্ষেই গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল। উহাকে ভালবাসিয়াই রোহিণী প্রথম বিপদে পড়িল জাল উইলখানা লইয়া। জাল উইল উদ্ধার না করিলে তাহার প্রেমাস্পদের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। সে অনিষ্ট রোহিণী কিছুতেই হইতে দিতে পারে না। তাই রমনীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া, মান ইজ্জৎ অবহেলা করিয়া রোহিণী আবার চুরি করিতে গেল। রোহিণী নিজের কাজ হাসিল করিয়াও অনায়াসে পালাইতে পারিত কিন্তু সে ধরা দিল। এবার ধরা পড়ায় তার লজ্জা ছিল না—কারণ প্রাণের ভিতরে তার যথেষ্ট শক্তি রহিয়াছে যেহেতু সে একটা সৎকাজ করিতেছে। যে তার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর তার হিতের জন্য সে নিজকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে—এটা যে আজ রোহিণীর কাছে কতটা তৃপ্তিদায়ক তা' কে বুঝিবে।

রোহিণী ধরা পড়িল, কৃষ্ণকান্ত তাকে বহু অপমান করিলেন এবং সমস্ত খুলিয়া বলিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "আর্য্যবংশ সম্ভূতা" রোহিণী কিছুতেই আসল কথা প্রকাশ করিল না। কি সে করিয়াছে তাহা বলিল কিন্তু কেন এরূপ করিল তাহা কেহই উহার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। চঞ্চলা মুখরা রোহিণী আজ এত সহিষ্ণুতা ও এমন অগাধ ভালবাসা কাহার নিকট শিখিল ? রোহিণী আজ নারীত্বের মহিমায় মহিমান্বিতা।

তারপর গোবিন্দলালের চেষ্টায় রোহিনী মুক্তি পাইল। এ মুক্তিতে সে এক অপার আনন্দ অনুভব করিল, প্রেমের তুফানে রোহিণী আলোড়িত হইল, বঞ্চিতা রোহিণী আজ প্রেমোন্মাদিনী!

কিন্তু মন্দ লোক নানা কথা রটাইল। বিধবার পক্ষে কলঙ্ক ডালা মাথায় লইয়া গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইল। প্রেমকাতরা অপমানদগ্ধা, লাঞ্ছিতা রোহিণীকে ভ্রমরও যখন মরিতে বলিল, তখন অভিমানে উহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাই নারীত্বের মহিমায় গৌরবান্বিতা রোহিণী তা'র শেষ সম্বলটুকু লইয়া অনায়াসে বারুনী পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল—শুধু মরিবার জন্য। কিন্তু বিধিলিপি ছিল অন্যরূপ। রোহিণীর তো মরিবার অধিকার ছিল না—সারা রাজ্যের অপমানের ঝাটা খাইবার পালা তখনও তো আরম্ভ হয় নাই। হতভাগা গোবিন্দলালই আবার রোহিণীকে বাঁচাইল;—রোহিণী এবার ডুবিল, গোবিন্দলালও অব্যাহতি পাইল না।

গভীর রাত্রে সেদিন রোহিণী বাড়ী আসিল—দুর্ভাগ্য বশতঃ কে এক রামী না বামী উহাকে দেখিল গোবিন্দলালের বাগান হইতে অত রাত্রে বাহির হইতে। আর যায় কোথা তার পরদিনই সালঙ্কারে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল রোহিণী-গোবিন্দলালের অবাধ মিলনের কথা।

গ্রামবাসীর মুখে এখন আর অন্য কথা নাই—কেবল এই কেচ্ছারই সকলে আমোদ পাইতে লাগিল। রোহিণী একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এদিকে গোবিন্দলালেরও শুভ্র অন্তরে কীট প্রবেশ করিল। রোহিণীর অসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তার সংযমের দুয়ারে আঘাত পড়িল, তাই সে সৌন্দর্য্যের মাদকতা ভুলিবার জন্য গোবিন্দলাল ঠিক করিল অলস মনটাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বহুমুখী করিতে। সুতরাং সে বিদেশ যাত্রা করিল। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে গ্রামময় 'রোহিণী-কলঙ্ক' ভীষণ ভাবে রাষ্ট্র হইতে লাগিল তিলকে তাল করিয়া লোকে বলিতে লাগিল যে গোবিন্দলাল সাত হাজার টাকার গয়না নাকি রোহিণীকে দিয়াছে, কারণ সে আজকাল তাহার অনুগৃহীতা।

ক্রমে রোহিণীর কানেও এ কথাটা উঠিল। সে ভাবিল যে এ কাজ ভ্রমরের। ভ্রমরই ঈর্ষাবিষ্ট হইয়া রোহিণীর নামে এই কলঙ্ক রটাইয়াছে। এমন একটা ধারণা হইতেই রোহিণী ভ্রমরের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল, জিঘাংসার আগুনে তাহার চোখ দুটা জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। রোহিণী ভাবিল "ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। আজ আমার নামে সে এই অপবাদ দিতেছে। এ দেশে আর আমি থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইব।" এইরূপ ভাবিয়া সে সত্য সত্য ভ্রমরের নিকট যাইয়া কষ্টেও নে সংগৃহীত গিল্টি করা গয়না ও কাপড় দেখাইয়া উহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে যে কথাটা রটিয়াছে তাহা একেবারে মিথ্যা নয়। তবে সাত হাজারের কথাটা একটু অতিরঞ্জিত, তিন হাজার টাকার গয়না নাকি গোবিন্দলাল তাকে দিয়াছে। ভ্রমরের মনের মাঝে কালির রেখা টানিয়া দিয়া চতুরা রোহিণী গৃহে ফিরিল।

তারপর ঘটনা পরম্পরায় ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মনের মাঝে মস্ত একটা ব্যবধান ও দূরত্বের ভাব ঘটিল। ক্রমে ক্রমে সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ ক্ষেত্রে রোহিণীর দোষ যথেষ্ট। হিংসা ও নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় আমরা এবার তাহার মধ্যে যথেষ্ট পাইলাম। কিন্তু রোহিণীতো দেবতা নয়—তাহাকে সামান্য মানুষের মাপ কাঠিতেই ওজন করিতে হইবে। সাধারণ লোকের নিকট দেবত্ব চাইতে গিয়া বিফল মনোরথ হইলে মোটেই আক্ষেপের কিছু নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে রোহিণী যাহা করিয়াছে তাহা অন্যায় ও নীচ-স্বার্থ-পরতা প্রসূত হইতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয়। অপমানিতা, লাঞ্ছিতা ও দুঃখক্লিষ্টা রোহিণী যখন দেখিল যে তা'র শেষ সম্বল সতীত্বটুকু লইয়া পর্য্যন্ত আজি গ্রামবাসী খেলা করিতেছে, আর সে অপমানের মূলে যখন সে ভ্রমরকেই স্থির করিল, তখন তাহার পক্ষে এরূপ কাজ করা মোটেই অস্বাভাবিক হয় নাই। নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব লইয়া টানাটানি লাগিলে—হিতাহিত জ্ঞান রহিত হওয়ায় কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই।

এদিকে কৃষ্ণকান্ত রায়ের মৃত্যুতে সংসারে খুবই গোল বাধিয়া গেল। এবং ভ্রমর ও গোবিন্দলাল সংক্রান্ত নানা ঘটনায় উভয়ের পূর্ণমিলন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল তপ্ত চিত্তকে শান্তি দিবার জন্য সর্ব্বদা রোহিণী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিল। এবং কিছুদিন পরে মাকে কাশী রাখিবার ছলে সে দেশ ত্যাগ করিল—ভ্রমরের সঙ্গ ইহজন্মের মত ছিন্ন হইয়া গেল। গোবিন্দলালের চিত্ত ভরিয়া উঠিল রোহিণী মন্ত্রে—কায়মনোবাক্যে সে রোহিণীকে ভাবিতে লাগিল। রোহিণীর অবস্থাও ঠিক গোবিন্দলালের অনুরূপ। সে চায় গোবিন্দলালকে, আবার গোবিন্দলালও চায় তাহাকে—সুতরাং উভয়ের মিলন স্বাভাবিক। তারপর লোকলজ্জা বা সমাজভীতিও এমন নাই। রোহিণীর এমন কোন বন্ধনই নাই যাহাতে উভয়ের অবাধ মিলন আটকায়। পূর্ব্বে হইলে রোহিণী হয়ত ভ্রমরের জন্য ভাবিত, কিন্তু এখন উহার উপর রোহিণীর ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ; তাই এ মিলনযাত্রায় কিছুমাত্র বাধা নাই। কিছুদিনের মধ্যে রোহিণী প্রসাদপুরে আসিল এবং গোবিন্দলালের সহিত স্ত্রীর মত বসবাস করিতে লাগিল। বাল-বিধবা আজ তাহার যৌবন সুলভ বৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইল।

এ পর্য্যন্ত রোহিণী যাহা করিয়াছে খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক হিসাবে সে দোষী কিন্তু বিশ্বমানবতার দিক দিয়া সে নির্দ্দোষ। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে রোহিণীর কামাগ্নিতে শুধু ঘৃতাহুতিই পড়িতেছে, বারি সিঞ্চন করিবার লোক কেহ নাই। আর রোহিণীর অজ্ঞাতসারে এ আগুন এমন ভাবে জ্বলিয়া উঠিল যে শেষে উহাতেই রোহিণী মরিল।

পরিশেষে নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর ব্যবহার মোটেই প্রশংসনীয় নহে। এ ব্যবহারে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রোহিণী নিজেকে আর দমন করিতে পারিতেছে না। নিশাকরের সঙ্গে রোহিণী যে দেখা করিতে চাহিয়াছিল সেটা যে শুধু দেশের লোক বলিয়াই তাহা নয়। ইহার মধ্যে আরও কিছু ছিল যাহা রোহিণী নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল না। বঙ্কিমবাবু এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রোহিণী নিশাকরের প্রতি একটু একটু আকৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য প্রথম সন্দর্শনেই নিশাকরের প্রতি রোহিণীর এই কুরুচিপূর্ণ আকর্ষণ মোটেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

যাক্ নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর দেখা করাটা দোষের ছিলনা কারণ সে তখন "হাফ্-পর্দ্দা নিশীন" কিন্তু তার দোষ ঐখানটায় যে সে গোবিন্দলালকে না জানাইয়া যাইতেছিল। আর এ কাজ করিতে যাইয়া রোহিণীর যদি বাধ বাধ না ঠেকিত তবে বোঝা যাইত যে সে নিষ্কলঙ্ক। রোহিণীর চিত্ত তখন দোদুল্যমান, সে বুঝিতে পারিতেছিলনা যে নিশাকরকে সে কি চোখে দেখিয়াছে।

রোহিণী নিশাকরের নিকট গেল এবং অন্ধকারে নদী-তীরে উভয়ে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে গোবিন্দলাল টের পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং পরিশেষে রোহিণীকে গৃহে আসিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার চরম শাস্তি প্রদান করিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে রোহিণীর চরিত্র লেখক যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা মোটেই সমীচীন হয় নাই। এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখক রোহিণীর প্রতি একটা বিদ্বেষের সংস্কার লইয়া লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সমাজ চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া লোকের সম্মুখে ধরা এবং সমাজের কলঙ্করাশি রোহিণীর চরিত্রে ঢালিয়া দেওয়া। প্রথম হইতেই লেখকের মহা চেষ্টা রোহিণীর একটা অ[illegible] চরিত্র অঙ্কন করা। এবং এ-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই বঙ্কিম বাবু শেষটা সামঞ্জস্য রাখিতে পারিলেন না।

রোহিণীর পতন আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই বহু যায়গায় লেখক উহাকে 'কালমুখী', 'পোড়ামুখী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদাই চেষ্টায় রহিয়াছেন উহাকে কলঙ্কিত করিতে। সুতরাং শেষটায় তিনি উহার মাথায় হঠাৎ এমনি কলঙ্ক-বোঝা চাপাইলেন যাহা মোটেই সুচারু দর্শন হয় নাই।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন—'রোহিণী, দাঁড়াও।' রোহিণী দাঁড়াইল।

গো—"তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে, আবার মরিতে সাহস আছে কি?"

রো—"এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা' ছিল, তা' হলো।"

পিস্তল সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিল, "কেমন মরিতে পারিবে?"

রোহিণী নির্ব্বাক। ভাবিল "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। ইহাকে কখনও ভুলিবনা, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেওত এক সুখ, সেওত এক আশা। মরিব কেন?"

এ ঘটনা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে রোহিণী গোবিন্দলালকে এখনও ভালবাসে। লেখক এখানে প্রতিপন্ন করিলেন যে রোহিণীর প্রেম এখনও অকপট, এবং সে যে গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া বাঁচিতে চায় আর কাহাকেও গ্রহণ করিবার জন্য নয়, শুধু গোবিন্দলালের স্মৃতি লইয়া বাঁচিতে পারিবে বলিয়াই।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই অসঙ্গত। গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইলে রোহিণী কাঁদিয়া বলিল—"মারিওনা! মারিওনা! আমার নবীন বয়স * * * *" ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক করিয়া ফেলিয়াছেন। রোহিণীর পক্ষে একথাটা বলা অসম্ভব, কারণ শেষ পর্য্যন্ত লেখক দেখাইয়াছেন যে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসে, গোবিন্দলালের স্মৃতি সম্পদই তার সুখ। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুভয়ে রোহিণীর এমন কামোদ্দীপনা ও জঘন্য লালসাবৃত্তির প্রকাশ মোটেই সম্ভবপর নয়। মরনের ভয় তার থাকিতে পারে কিন্তু মরণ দুয়ারে কামের তাড়না কি সম্ভব? লেখক এ স্থলে রোহিণীর প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছেন—নারীত্বের এমন প্রকট লাঞ্ছনা মোটেই রুচি সম্মত নয়। রোহিণীর চরিত্রকে খারাপ ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাই লেখক শেষটায় হঠাৎ উহার উপর কলঙ্কের কালিমা ঢালিয়া দিলেন, ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে আর কিছু নয় শুধু রোহিণীর প্রতি লেখকের চির-বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধার ভাব।

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

—:•:—

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাচীন দেবালয়

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ খুব পুরাতন স্থান নহে। উহার অধিকাংশ স্থলই একসময় বিশালকায় ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে নিহিত ছিল। তদ্ব্যতীত অনেক স্থান সাগর সদৃশ হাওরের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, যে সামান্য ভূখণ্ড মধ্যে মধ্যে 'তমালতালী বনরাজী নীলা' প্রতিভাত হইত—তাহারও বেশীর ভাগ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অথবা অসভ্য জাতীয় নরগণের অধ্যুষিত ছিল। সভ্য জনগণ কোন সময় ঐ প্রদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন,—ঐতিহাসিকগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। এই দেশটাকে পাণ্ডব বর্জ্জিত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তদানীন্তন ব্রহ্মপুত্রের অপর পাড়ে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল—তাহা খুব নিকটবর্ত্তী না হওয়ায় হয়ত যজ্ঞীয় অশ্ব ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারে নাই।

যাহা হউক—আমাদের বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করাই আবশ্যক।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে দেবতার মধ্যে ভোগ বেতালের ৺গোপীনাথ ও বলরামই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই দুই দারু মূর্ত্তির সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে মদীয় অগ্রজ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র "প্রতিভায়"ও কতিপয় সাময়িক পত্রে আলোচনা করিয়াছেন।

সম্রাট্ আকবর যখন দিল্লীশ্বর—সেই সময় বঙ্গদেশে দ্বাদশ ভৌমিক বা [কতিপয় স্বাধীন] রাজার অভ্যুদয় হয়। ঈশা খাঁ তাহাদের অন্যতম। ঈশা খাঁ সম্রাট্ সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে উপনীত হন। তথায় নিজ পরিবার ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিয়া এগার সিন্ধু দুর্গে মোগল সেনাপতি মহাবীর মানসিংহের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে বর্ত্তমান কঠিয়াদী থানার অনধিক দেড়মাইল দূরে চারিপাড়া গ্রামে রাজা নবরঙ্গ রায় নামে এক মাহিষ্য জাতীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। নবরঙ্গের লাঠিয়াল তাহার ছিপ নৌকা ও সৈন্যগণ কালা রায়ের অধীনে দূর বরান্তর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গোপীনাথ ও বলরাম এই নবরঙ্গ রায়ের গৃহ দেবতা।

ঈশা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে পশ্চাতে এই মহাবল শত্রুকে রাখিয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে নবরঙ্গের পত্নীর "সই পাতানের" ছলে চারিপাড়া আক্রমণ করতঃ নবরঙ্গের ধ্বংস সাধন করেন।

বিজয়ী ঈশা খাঁ নবরঙ্গের ধনরত্নাদি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া জঙ্গলবাড়ী যাত্রা করিলেন। দারুব্রহ্ম গোপীনাথ বলরামও একখানি গাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। এই সময় জগন্নাথদেব নামক এক পরম সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণ ঈশা খাঁর সম্মুখে সাশ্রু নয়নে দাঁড়াইয়া এই মূর্ত্তি যুগল প্রার্থনা করিলেন। মহামনাঃ ঈশা খাঁ ঐ মূর্ত্তি, অলঙ্কার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জামসহ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গেলেন।

দীর্ঘকাল গোপীনাথ জীউ ও বলরাম জগন্নাথদেবের কুটীরে পূজিত হইতেছিলেন। তৎপর এক 'বাউল' আসিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ঠাকুরের দালান, মন্দির, দোলমঞ্চ, রথ, রথের সড়ক, শ্বশুর বাড়ী পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্তই বাউলের কীর্ত্তি। আজিও গোপীনাথ ও বলরাম বিগ্রহ জগন্নাথ দেবের উত্তর পুরুষগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। কিন্তু কাল সহকারে—প্রলয় ভূকম্পনে দোলমঞ্চ ও দালানগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ তাহার সংস্কার করিল না। জানি না—কেহ করিবেন কি না?

(২) কুলেশ্বরী।

কালীরূপে পূজিত বট বৃক্ষ মাত্র। এই বট বৃক্ষ হোসেনপুরে—ব্রহ্মপুত্রের তট প্রদেশে স্থাপিত। কেহ বলেন লালা ধনদাস এই প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ধনকুড়া ও দিবেশ্বর গ্রাম স্থাপন করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গনের হাত হইতে কুল রক্ষার মানসে কুলেশ্বরী বট বৃক্ষরূপিনী কালিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্ত্র পূত বৃক্ষ সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ এইখানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কতবার ব্রহ্মপুত্র এ দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস কুলেশ্বরীর ইঙ্গিতেই ব্রহ্মপুত্র সরিয়া যান। কুলেশ্বরী বর্ত্তমানে নাটোরের মহারাজার অধিকারভুক্ত স্থানে অবস্থিত। আমাদের দেশে প্রচলিত কথা যে নাটোরের এলাকা যে যে খানে আছে, সেই সেই স্থানে কালী স্থাপিত।

(৩) বিষহরি।

গফর গাঁ থানার এলাকায় উস্থি এক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে অবস্থিত হইলেও এই গ্রামও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে। এই গ্রামের মজুমদার বংশ অতি প্রাচীন। ইহারা পূর্ব্বে আচার্য্য উপাধিকারী ছিলেন। এখনে ইঁহাদের দুই শাখা দেখা যায়, এক শাখা আচার্য্য ও অপর শাখা মজুমদার। নবাবের আমলে চাকুরী গ্রহণ করিয়া এক শাখার মজুমদার উপাধি হয়।

মজুমদার বংশে দুর্গারাম মজুমদার খুব খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সদাশিব মজুমদার উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার আদিপুরাণ, উমাপরিণয়, মনসার মঙ্গল আরতি প্রভৃতি পুস্তকের বিচ্ছিন্ন অংশ এখনো পাওয়া যায়। দুর্গারাম স্বপ্নযোগে অবগত হন তাঁহাদের বাড়ীর পেছনে ভূগর্ভে বিষহরি দেবী বড় কষ্টে আছেন; তাঁহার উদ্ধার করিতে হইবে। দুর্গারাম সেই জঙ্গল কাটিয়া নানা স্থান খুঁড়িয়া অনেক দিন পরে দেবী মূর্ত্তি পাইলেন। সেই জমি অদ্যাপি "বিষহরি ক্ষেত" নামে পরিচিত।

বিষহরি অতি সুগঠিত দেবী প্রতিমা। কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদাই করা। মাথার উপর ফনাযুক্ত অষ্ট নাগ। দুর্গারাম সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর তাঁহার অন্যতম পুত্র সদাশিব মধুর ত্রিপদী ছন্দে মনসার মঙ্গল আরতি রচনা করিলেন। আজিও মজুমদার বাড়ীতে মনসার পূজা চলিতেছে। তাঁহাদের ধারণা যে মনসা দেবীই মজুমদার বাড়ীর উন্নতির কারণ ছিল। দেবীর পূজাদির সেই ব্যবস্থা আর নাই, সেই মজুমদার বাড়ীও আর নাই। বংশানুক্রমিক হিসাবে মনসা দুইশত বৎসরের প্রাচীন মনে হয়।

(৪) দশভুজা।

জঙ্গলবাড়ীর রাজবাটীতে দশভুজা দেবী প্রতিষ্ঠিতা। এই মূর্ত্তি কত কালের তাহা ঠিক জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আলাপ করিয়াছিলেন যে এই দেবী তাঁহারা কেদার রায়ের বাড়ী হইতে পাইয়াছেন। এই কেদার রায় কে তাহা নির্নীত হয় নাই।

(৫) লস্করপুরের শিব।

এই শিবলিঙ্গ লস্করপুরের 'উকীল' উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পূজিত। বহুকাল যাবৎ পুরুষাণুক্রমে ইহারা এই শিব পূজা করিয়া আসিতেছেন। ময়মনসিংহ জিলায় এই শিবের প্রসার অল্প নহে। বহুলোক বিবিধ "মানসিক" আদায় জন্য এখানে পূজাদি দিয়া থাকেন।

(৬) মঠখলার কালী।

কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী বনগ্রামের চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ত্তি নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ব্রহ্মপুত্র তীরে

চড়দেওকান্দী নামক স্থানে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাতে কালী, শিব ও রাধাকৃষ্ণ স্থাপন করেন। এক মঠেই স্থানটী মঠখলা নামে পরিচিত। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে এই স্থানে ১৫।২০ হাজার যাত্রী সমাগত হন। এই কালী বাড়ীতেও পূজাদির সুব্যবস্থা আছে।

(৭) মণ্ডপাড়ার কালী।

মণ্ডপাড়ার ব্রাহ্মণ জমিদারগণ বহুকাল হইতে এই স্থানে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশী। ইহারা কৌণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইহারা বলেন প্রায় পঞ্চাশ পুরুষ যাবৎ ইঁহারা এইখানে আছেন। কালী ও শিবলিঙ্গ ও নাকি অতি প্রাচীন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ ইঁহাদের গৃহ দেবতার সেই পূজার ব্যবস্থা হ্রাস হইয়াছে।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভিনন্দন।

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলে *

হে ভাবুক কবি!

তুমি বাঙ্গালার নিভৃত কাব্যকুঞ্জে বসিয়া, এক শুভ মুহূর্ত্তে আপন মনে গীত গাহিতে আরম্ভ করিলে। সেই সুমধুর গীতধ্বনি সমগ্র বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ মার্গে উত্থিত হইল। তাহার তরঙ্গায়িত মূর্চ্ছনা, তাহার উদ্বেলিত ভাবধারা ক্রমে সুদূর প্রতীচ্য প্রর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিল। প্রতীচ্যের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মকোলাহল এবং জীবন সংগ্রামের তুমুল আরাবও তোমার অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুমধুর নিক্কণ একেবারে ডুবাইতে সমর্থ হইল না। কর্ম্মোন্মত্ত প্রতীচ্য তাহার দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ রোধ করতঃ সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া তোমার সুরলহরী কাণ পাতিয়া শুনিল। দেখিল যে, এই সঙ্গীত অভিনব, অথচ যেন অতি পুরাতন; দূরাগত, অথচ যেন অতি ঘনিষ্ট; অশ্রুতপূর্ব্ব, অথচ যেন চিরপরিচিত। উহার প্রত্যেক লহরে লহরে প্রতীচ্যের হৃদয় তন্ত্রী স্পন্দিত হইল। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের রুদ্ধদ্বার সহসা খুলিয়া গেল।

তখন যে প্রশ্ন, যে জিজ্ঞাসা পাশ্চাত্যজনগণের মগ্নচৈতন্যের অন্তরালে সুপ্ত ছিল তাহা জাগিয়া উঠিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, এই যে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পূরণের চেষ্টা, ইহাই কি সভ্যতার শেষ? এই যে খণ্ডের আরাধনা, অংশের পূজা, ইহাই কি মানব সাধনার চরম? এই প্রাচ্য গায়ক যে আমাদের মনে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহার গানের সুর বুঝি না, তাল জানিনা, কিন্তু ইহাতে যেন সমন্বয়ের কথা আছে, পূর্ণতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই শিল্পী যেন কল্পলোকের কোন মঙ্গল বারতা লইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহার গীত যেন আমাদের কর্ম্মক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ হৃদয়ে পরম শান্তির অমৃত ধারা সিঞ্চিত করিয়া দিয়াছে। এস আমরা এই নবীন কবিকে বরণ করিয়া লই। তখন তাহারা তোমাকে সসম্মানে আহ্বান করিয়া তোমার শিরোদেশে যশের বিজয় মাল্য পরাইয়া দিল। বলদৃপ্ত, গর্ব্বিত প্রতীচ্য প্রাচ্যের নিকট মস্তক অবনত করিল। তোমার পূজনীয় পিতৃদেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমার উন্মেষোন্মুখ প্রতিভার মহিমময় পরিণতি সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল; এবং তোমার প্রতিভার যে পুরস্কার তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত ছিল, উহা তাহা লাভ করিল।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিং তোমাকে এসিয়ার রাজকবি বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তোমাকে জগতের রাজকবি বলিয়া অভিবাদন করিতেছি। কেননা তোমার গানে, তোমার কবিতায় কেবল এসিয়ার সুর ফোটে নাই, উহাতে সমগ্র বিশ্বের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে—অনেক সময়ে তোমার অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া

* কবিবরের পুত্র শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কবির শারীরিক অসুস্থতা বিজ্ঞাপিত হওয়ায় কবিকে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে পারা যায় নাই। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে ইহা প্রতিভায় মুদ্রিত হইল।

উঠিয়াছে। তুমি বাঙ্গালার এক প্রান্তে বসিয়াই গান ধরিয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমার সেই গান বাঙ্গালায় নিবদ্ধ থাকে নাই। উহা বাঙ্গালার চিত্ত ভরপুর করিয়া, বসন্তের আনন্দের মত, বিশ্বচিত্তে ছাইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রকৃতি-দেবী তোমার হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া নিজে লিখিয়া দিয়াছেন; তোমার কথার ভিতর দিয়া নিজে কথা কহিয়াছেন।

শারদীয় জ্যোৎস্না যেমন ধরিত্রীকে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় আলোকে আলোকিত করে, এক বিশ্বজনীন উদারতাও তেমনই তোমার কাব্যকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বের তারং স্পর্শই তোমার হৃদয়কে কম্পিত এবং নব নব গীতধারায় ঝঙ্কৃত করিয়াছে। আর, এই বিভিন্ন স্পর্শ ও বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে তুমি এক অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছ। এখানেই তোমার বিশ্বজনীনতা ও উদারতা। তুমি মহতের অনুসন্ধান করিতে গিয়া ক্ষুদ্রকেও অবহেলা কর নাই। তুমি জীবনের ছোট কথাগুলিকেও বড় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ। আর ক্ষুদ্রকে অবলম্বন করিয়াই, অংশের ভিতর দিয়াই তুমি ভূমানন্দের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছ। সীমার মধ্যেই তুমি অসীমের প্রকাশানন্দ অনুভব করিয়াছ। রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াই তুমি অরূপের অনুসন্ধান করিয়াছ। এই জন্যই তোমাকে কিছুই প্রত্যাখ্যান করিতে হয় নাই। সীমাকে তুমি মানিয়া লইয়াছ; জড়কেও তুমি জড় বলিয়া অনুভব কর নাই। তুমি সান্ত ও অনন্ত, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে এক ছন্দোবদ্ধ সুসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছ। জগতের কিছুই প্রত্যাখ্যান কর নাই বলিয়াই তোমার কাব্য এক গভীর আস্তিক্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত; উহাতে নিত্যাস্বস্তি চির বিরাজিত।

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম প্রভাতে, ভারতের পুণ্য তপোবনে উপনিষদের ঋষিগণের শ্রীমুখ হইতে যে তত্ত্বজ্ঞানের মন্দাকিনী ধারা সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই অবিচ্ছিন্ন ভাবে আজ পর্য্যন্তও ভারতীয় কর্ম্ম ও চিন্তা, ভারতীয় সাহিত্য ও সাধনা, এমন কি ভারতীয় গ্রাম্যগীতি ও রচনার মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গু গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। আজ তোমার প্রতিভা সেই ধারাকে প্রতীচ্যের উষর ভূমির স্নিগ্ধতা সম্পাদনে নিয়োজিত করিয়াছে। তোমার বোলপুরের শান্তিনিকেতন এই ভাবপ্রচারের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবাসীরা যে ভিখারী নয়, জগৎকে যে তাহাদের কিছু দান করিবার আছে, শান্তি নিকেতনই তাহার প্রমাণস্থল। কারণ ভারতের গৌরবময় অতীত যুগের ন্যায় এখনও বিদেশীয় তীর্থযাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা, ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার পূত গঙ্গাজলে অবগাহন করিতেছে। হে ভাবগঙ্গার ভগীরথ! আমরা ভক্তিনম্র-চিত্তে তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি বিশ্বের কবি সন্দেহ নাই; কিন্তু লীলাবশে তুমি বন্ধন স্বীকার করিয়াছ,—ঢাকা সাহিত্য পরিষদের নিকট ধরা দিয়াছ। দশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে তুমি পরিষদের আজীবন সভ্যের পদ গ্রহণ করিয়া উহাকে এক অতুল গৌরবের অধিকারী করিয়াছ। মাতা যেমন স্খলিতপদ শিশু সন্তানকে অবনত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকে গৌরবের উচ্চভূমিতে তুলিয়া লইয়াছ। আমাদের কৃতজ্ঞতা রাখিবার স্থান কোথায়?

তুমি সাহিত্য পরিষদে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ। কিন্তু কি দিয়া যে আমরা তোমার সম্বর্দ্ধনা করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। তোমার স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ভক্তেরা যে মহামূল্য উপচারে তোমার পূজা করিয়াছে আমরা তাহা কোথায় পাইব? হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তিই আমাদের একমাত্র সম্বল। হে সহৃদয়! তুমি আমাদের শ্রদ্ধাচন্দনচর্চ্চিত বনফুল গ্রহণ কর।

হে ভাষা জননীর বর পুত্র! তুমি যাহাকে মহার্ঘ ভূষণে ভূষিত করিয়া স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ আমরা সেই মহাদেবীরই মন্দির প্রাঙ্গনের দীন সেবক। মাতৃভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াই ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকা সাহিত্য

পরিষৎ তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। তোমার অশেষ কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকে তুমি হৃদয়কোণে একটু স্থান দিও।

তুমি দীর্ঘজীবি হও, ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। তিনি তোমাকে সুখ, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করুন। কুসুমের সৌরভের মত, শারদীয় প্রভাতের সুষমার মত, মাতৃহৃদয়ের কোমলতার মত, তোমার অনাবিল গীত লহরী বিশ্ববাসীকে চিরকাল আনন্দ প্রদান করুক।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ।

—*—

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রামায়ণ (বাল্মীক ও কৃত্তিবাস) শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ বি এল্ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার আর্ষ রামায়ণ ও কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণের তুলনা মূলক আলোচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস যে সর্ব্বাংশে বাল্মীককে অনুসরণ করেন নাই, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু ঠিক কোন ২ স্থলে কৃত্তিবাস ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা তত সুবিদিত নহে। গ্রন্থকার উভয় কাব্যের স্থূল এবং প্রধান পার্থক্যগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মূল কাব্য কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানিনা। বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায় তাহা সম্যক কৃত্তিবাসের রচিত নহে। ছাপা রামায়ণের ও একখানার সহিত আরেক খানির মিল নাই। গ্রন্থকার স্বয়ংই ভূমিকায় বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথির সহিত পশ্চিম-বঙ্গের পুঁথির মিল নাই। বাজারে যে রামায়ণ পাওয়া যায় তাহা জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা সংশোধিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। জয়গোপাল ব্যতীত অন্যেরাও যে কৃত্তিবাসের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, এমন কথাও বলা যায় না। ফলে, আসল কৃত্তিবাস একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ বহু চেষ্টা করিয়াও মূল উদ্ধার করিতে পারেন নাই। যে দুই এক সর্গ পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাও আসল কৃত্তিবাস বলিয়া পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয় নাই। কৃত্তিবাসের মূল পুঁথি পাওয়া গেলে অনেক কাজ হইত। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন আকৃতি কিরূপ ছিল তাহা টের পাওয়া যাইত; বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের সুবিধা হইত। যাহা হউক, মোটামুটী একথা বলা যায় যে কৃত্তিবাস খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; সুতরাং তিনি আর্ষ রামায়ণ বাঙ্গালীর ছাঁচে ঢালিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, যে পুঁথি বাজারে পাওয়া যায় তাহা বৈষ্ণবীয় ভক্তি ধারায় রঞ্জিত ও অভিষিক্ত। এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে। একে সুপবিত্র রাম কথা ইহার আখ্যানবস্তু, তার উপর নদিয়ার প্রেমের বন্যা,—ইহাতে বাঙ্গালীর নিকটে এই পুস্তকের আদর হইবে না কেন? কিন্তু মূল আর্ষ রামায়ণে রাম চরিত কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। কিন্তু সেখানেও গলদ। মূল বাল্মীকি রামায়ণও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাঙ্গালার রামায়ণের সহিত বোম্বাইএর রামায়ণের মিল নাই। সাধারণতঃ বোম্বাই সংস্করণকেই বিশুদ্ধ ধরা হয়। কিন্তু সে বিষয়েও মতদ্বৈধ রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে মূল রামায়ণ কি ছিল তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থকার এই সমস্ত বিচারের মধ্যে যান নাই। যাওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণের সহিত প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থূল পার্থক্য প্রদর্শনই তাহার উদ্দেশ্য। তাহা তিনি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালী পাঠক অল্প আয়াসেই দুই গ্রন্থের আখ্যানগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আজকাল বালকপাঠ্য রামায়ণ মহাভারত খুব চলিয়াছে। কতকগুলি বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থও পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রন্থের রচনা ভাল। ছাপা কাগজ মন্দ নয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

———

